বিজ্ঞান-আলোচনা

(ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য)

বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ

শ্রীগিরিশ চন্দ্র বসু এম-এ

প্রণীত

মূল্য দুই টাকা মাত্র

ভূমিকা

পাশ্চাত্য ভাষায় আমরা এতকাল বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া আসিয়াছি ; কারণ বৈজ্ঞানিক তথ্যকে উপযুক্ত ভাবে প্রকাশ করিবার মত ভাষা সম্পদ আমাদের ছিল না। কিছুকাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় উদ্যোক্তা আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য ব্রতী হইয়াছেন। এই কার্য অতীব কষ্টসাধ্য ; বস্তুত, বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপযুক্ত পরিভাষা সৃষ্টি করা একটি গুরুতর সমস্যা। শব্দের প্রকৃত মূল অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উহাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। আনন্দের বিষয়, তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা ফলবতী হইতে চলিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বহু আয়াস স্বীকার করিয়া যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ও তদনুযায়ী নূতন বানান প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহা দ্বারা আমাদের আপাতত কার্য চলিতে পারে। আশা করা যায়, আমাদের ভাষার ক্রম বিকাশের সঙ্গে উহাও উন্নত হইবে।

এই পুস্তকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদর্শিত ম্যাট্রিকুলেশন ছাত্রের উপযোগী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশের ছাত্রের পক্ষে যাহাতে ইহা সহজে বোধগম্য হয়, তজ্জন্য বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি মোটামুটিভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই পুস্তক প্রণয়নে অধ্যাপক ডাঃ সহায়রাম বসু, অধ্যাপক অনুতোষ দাসগুপ্ত, অধ্যাপক তারাচাঁদ নন্দী, অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, অধ্যাপক লাডলিমোহন মিত্র, অধ্যাপক ব্রজগোপাল মিত্র, অধ্যাপক ফণিভূষণ মুখার্জি, ডাক্তার সুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী, সুধাংশু কুমার বসু—মাইনিং অধ্যাপক ধানবাদ মাইনিং স্কুল, ডাঃ সুহৃদকুমার

রায়—ভূ-বিদ্যা অধ্যাপক ধানবাদ মাইনিং স্কুল বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ।

এই পুস্তকের বিজ্ঞানসঙ্গত চিত্র অঙ্কনে শিল্পী শ্রীযুত যতীন সাহা, ব্লক নির্মাণে 'বেঙ্গল অটোটাইপের' শ্রীযুত অমূল্যচরণ সেনগুপ্ত এবং মুদ্রণ কার্যে 'শ্রীপতি প্রেসের' শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ মিত্র বিশেষ যত্ন লইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমার ধন্যবাদের পাত্র।

বঙ্গবাসী কলেজ
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৪৪

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

উদ্ভিদ-বিদ্যা

জীব-বিদ্যা

শারীর-বিদ্যা

দ্বিতীয় ভাগ

পদার্থ-বিদ্যা

রসায়ন-বিদ্যা

জ্যোতির্বিদ্যা

ভু-বিদ্যা

প্রথম ভাগ

উদ্ভিদ-বিদ্যা।

জীব-বিদ্যা।

শারীর-বিদ্যা।

বিজ্ঞান-আলোচনা

উদ্ভিদ-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ বর্ণনা

পৃথিবীতে বহু প্রকারের উদ্ভিদ দেখা যায়। কতকগুলি উদ্ভিদের বীজ হয়। যেমন—মটর, আম ইত্যাদি। আবার কতকগুলি উদ্ভিদের বীজ হয় না। যেমন,—শৈবাল বা শেওলা (Algae), মস (Moss) ইত্যাদি। যে সকল উদ্ভিদের বীজ হয় তাহাদিগকে **সবীজ** ও যে সকল উদ্ভিদের বীজ হয় না তাহাদিগকে **অবীজ** বলা হয়। এখানে উদ্ভিদের পর্ব (classification) দিতেছি:—
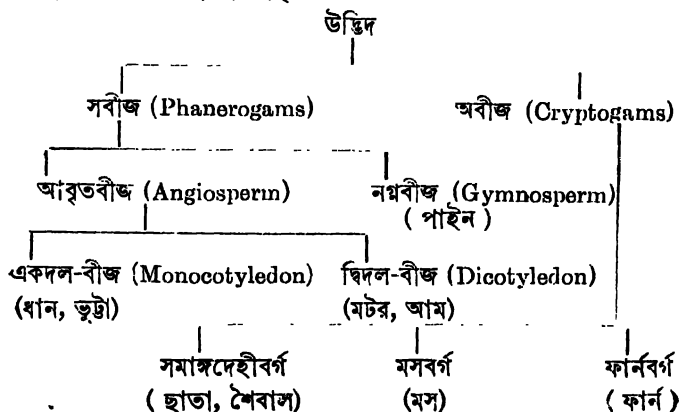
এক শ্রেণীর সবীজ গাছের পাতা, কাণ্ড এবং শিকড় থাকে। গাছ ক্রমে ছোট হইতে বড় হইলে ফুল হয় এবং ফুল উপযুক্ত অবস্থায় ফলে পরিণত হয়। এই ফলের মধ্যে বীজ হয়। আর এক শ্রেণীর সবীজ গাছে প্রথম শ্রেণীর ন্যায় মূল ইত্যাদি হয়, কিন্তু বীজ খোসায় আবৃত নহে। আমরা সচরাচর সবীজ গাছই দেখি। আবার কতকগুলি এমন খুব ছোট অবীজ গাছ আছে, যাহাদের দেহ অবিভক্ত অর্থাৎ যাহাদের দেহে মূল, পাতা, কাণ্ড প্রভৃতি ভাগ নাই; তাহাদিগকে **সমাঙ্গী** বলা হয়। জলের শৈবাল ও বর্ষাকালে পচা কাঠের উপর যে
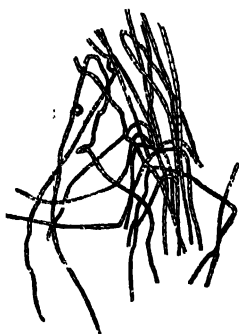
ব্যাঙের ছাতা

শৈবাল
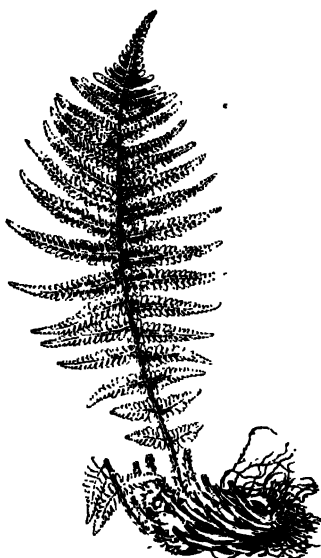
ফার্ন

মস

ব্যাঙের ছাতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা এই সমাঙ্গী শ্রেণীর উদ্ভিদ

আবার কতকগুলি অবীজ গাছের শিকড় হয় না, কিন্তু খুব ছোট ছোট পাতা ও কাণ্ড হয়। ইহাদিগকে আর এক শ্রেণীভুক্ত করা হয়। উহার নাম **মসবর্গ**। আর এক শ্রেণীর অবীজ উদ্ভিদের শিকড়, পাতা ও কাণ্ড দেখা যায়, কিন্তু ফল ও বীজ হয় না। তাহারা **ফার্ন** বর্গভুক্ত।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত উদ্ভিদের জীবনে যে সকল পরিবর্তন দেখ, তাহার আলোচনার নাম **উদ্ভিদের জীবন-চরিত**। দেখ, মাটিতে বীজ পুঁতিলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া চারাগাছ হয়। এই চারাগাছ মাটি, জল ও বায়ু হইতে আহার ও জীবনধারণের অন্যান্য দ্রব্য লইয়া বাড়িতে থাকে। গাছ বড় হইলে তাহাতে ফুল ধরে। ফুল প্রথমে কুঁড়ি অবস্থায় থাকে, ক্রমে প্রস্ফুটিত হয় অর্থাৎ ফোটে। ফোটা-ফুলের রঙে ও গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া এবং মধু ও রেণুর লোভে, মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ আসিয়া উহার উপর বসে। কীট-পতঙ্গ সকল এইরূপে এক ফুল হইতে অপর এক ফুলে যায় ও আপন আপন আহার সংগ্রহ করে। কিন্তু তাহারা আপন আপন কার্য-সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাতসারে পুষ্পের উপকার করিয়া যায়। যখন ফুলে ফুলে তাহারা উড়িয়া বেড়ায় ও বসে, তখন তাহাদের সাহায্যে ফুলের পুংকেশর হইতে পরাগ গর্ভ-কেশরে লাগিয়া যায়। ইহার ফলে বীজকোষের মধ্যে বীজ জন্মে ও বীজকোষ ক্রমে বড় হইয়া ফলাকার ধারণ করে। ফল ও বীজ ক্রমে পাকিয়া উঠে। তখন সেই বীজ অথবা বীজযুক্ত ফল লইয়া রোপণ করিলে নূতন গাছ জন্মে। ইহাই উদ্ভিদের জীবন-চরিত।

উপরে বলিলাম, পুংকেশর হইতে পরাগ গর্ভ-কেশরে স্থাপন করিবার পক্ষে কীট-পতঙ্গ সাহায্য করে। অধিকাংশ ফুলই এইরূপ। অপরাপর ফুলে কীট-পতঙ্গ যায় না, কারণ ঐ সকল ফুলে গন্ধ ও রঙ নাই এবং উহাদের মধ্যে মধুও নাই। এইরূপ স্থলে বায়ু অথবা জল এক ফুল হইতে অন্য ফুলে পরাগ বহন করিয়া থাকে।

প্রশ্নমালা

(১) উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের কথা যাহা জান বল

(২) সবীজ ও অবীজ উদ্ভিদ কাহাকে বলে ?

(৩) উদ্ভিদের জীবন-চরিত বুঝাইয়া বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

তোমরা তোমাদের বাগানে ও বাড়ীর আশে পাশে যে সকল গাছ-পালা দেখিতেছ, তাহাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি বলিতে পার ? দেখ তোমাদের আপন আপন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ,—হাত, পা, ধড়, মাথা ইত্যাদি। সেইরূপ গাছের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ,—মূল, কাণ্ড, পত্র ইত্যাদি। একটি **শিমচারা** মাটি হইতে উপাড়িয়া পরীক্ষা কর। দেখ মাটির নীচে যে অংশ তাহাকে **মূল** বলে ; মাটির উপরে যে অংশ তাহার নাম **কাণ্ড** ; কাণ্ডে দেখ কেমন **পাতা** সাজান রহিয়াছে।

শিমচারা

আর গাছ যখন বড় হয়, তখন ইহাতে **ফুল** ধরে, ফুল পাকিলে তাহার সকল অংশ ঝরিয়া পড়ে, কেবল এক অংশ ঝরিয়া পড়ে না, তাহা পাকিয়া বড় হয়, তাহার নাম **ফল**। ফলের মধ্যে **বীজ** হয়। বীজ পাকিলে ফল ফাটে ও বীজ মাটিতে পড়ে।

এখন শিখিলে প্রথমে গাছের তিন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে, যথা মূল, কাণ্ড ও পাতা। পরে তাহাতে ফুল ধরে, ঐ ফুল পাকিলে ফল হয় ও ফলের ভিতর বীজ থাকে।

প্রশ্নমালা

(১) গাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি বল?

(২) গাছের মূল ও কাণ্ড সাধারণত কোথায় থাকে?

তৃতীয় অধ্যায়

বীজের কথা

রাত্রে এক মুঠা ছোলা জলে ভিজাইয়া রাখ। পরদিন একটা ভিজা ছোলা লইয়া পরীক্ষা কর। কাঁচা ছোলা পাইলে আরও ভাল হয়। বীজের গায়ে দুইটি দাগ দেখিতে পাইবে। একটি দাগ ফল হইতে বীজ খসিয়া পড়িবার দাগ। এই দাগের নাম **প্রবীজ-নাভি** (hilum)। এই প্রবীজ-নাভির উপরে আর একটি দাগ দেখ। এই দাগ দিয়া বীজের মধ্যস্থ ভ্রূণের (embryo) মূল বাহির হয়। ইহাকে **ডিম্বক-রন্ধ্র** (micropyle) বলে। নখ দিয়া ছোলার খোসা ছাড়াইয়া ফেল। এই খোসাকে **টেষ্টা** (testa) বলে। একটা গোলাকার জিনিষ খোসার ভিতর হইতে বাহির হইল। ইহা খোসায় ঢাকা ছিল। এই গোল

ছোলার বীজ ; বীজের মধ্যস্থ ভ্রূণ ; বীজের দ্বিধা বিভক্ত খোসা

জিনিষটি দেখ, মাঝখানে ফাটা বা চেরা। অল্প চাপ দিলে ঐ গোল জিনিষটা দুই খণ্ড হইয়া পড়ে। ঐ দুই খণ্ড এক জায়গায় সামান্য জোড়া। ঐ জোড়ের মুখে দেখ, একটি ক্ষুদ্র বক্র পদার্থ রহিয়াছে, এই বক্র পদার্থের এক দিকের অগ্রভাগ ঐ দুই খণ্ডের ভিতর রহিয়াছে এবং অপর দিকের অগ্রভাগ ঐ দুই খণ্ডের বাহিরে রহিয়াছে।

খোসা-ঢাকা যে গোল পদার্থটি পাইলে, উহা কি জান? উহা বাড়িয়া চারা হয়। উহাকে **শিশু-উদ্ভিদ** (embryo) বলে। তোমরা এই যে শিশু-উদ্ভিদ দেখিতেছ, ইহার নাম **ভ্রূণ**। ভ্রূণের তিন প্রত্যঙ্গ, যথা—বাহিরের দিকের অগ্রভাগ **ভাবী-মূল** বা **ভ্রূণ-মূল** (radicle), ভিতরের দিকের অগ্রভাগ **ভাবী-কাণ্ড** বা **ভ্রূণ-কাণ্ড** (plumule), আর বড় মোটা দুই খণ্ড **বীজপত্র** বা **বীজদল** (cotyledon)। এই শিশু-উদ্ভিদ বাড়িলে মূল কাণ্ড ও পাতাযুক্ত চারাগাছ জন্মে। শিম, ছোলা, মুগ, অড়হর, কলাই, মসুর, খেঁসারি প্রভৃতি বীজও ঠিক ছোলা বীজের মত, উহাদের খোসা ও খোসা-ঢাকা শিশু-উদ্ভিদ থাকে। উহারাও বাড়িলে চারা গাছ জন্মে। আমরা যে মুগ, কলাই, মটর প্রভৃতি ডাইল খাই, তাহা সেই সেই বীজের যে শিশু-উদ্ভিদ, তাহারই বীজ-পত্র। শিমের বীজের চিত্রে বাহিরের ভাবী-মূল ও ভিতরের ভাবী-কাণ্ড স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে। এই সকল বীজে দুইটি বীজদল থাকে, সেইজন্য এই সকল বীজকে **দ্বিদল-বীজ** বলা হয়।

শিমের শিশুউদ্ভিদের দুই বীজদল; ভাবীমূল ও ভাবীকাণ্ড

কোন কোন বীজে খোসার মধ্যে ভ্রূণ ছাড়া আর এক পদার্থ থাকে, তাহাকে **সার** বলে। এক ভেরেণ্ডা বা রেড়ীর বীজ লম্বালম্বি দুইভাগে

চিরিয়া পরীক্ষা কর। দেখ ইহার খোসা কাল (ঘ), আর খোসার ভিতর এক সাদা শাঁস (খ)। এই সাদা শাসের মাঝখানে এক চেরা পদার্থ (গ)। সাবধানে ছুরির ডগ দিয়া এই চেরা পদার্থকে পৃথক কর। দেখ, এই চেরা পদার্থের এক আগা জোড়া এবং ঐ জোড়মুখে ক্ষুদ্রাকার ভাবীমূল (চ) ও ভাবীকাণ্ড (গ)। আর ঐ ভাবীমূল ও ভাবীকাণ্ডের জোড়ে অপেক্ষাকৃত বড় লম্বা ও পাতলা দুই বীজ-পত্র (ক)। অর্থাৎ এই চেরা পদার্থটিই বীজের শিশু-উদ্ভিদ বা ভ্রূণ। এই ভ্রূণ ছাড়া বাকি সমস্ত সাদা অংশটি সার। রেড়ী প্রভৃতি বীজে বীজপত্রের বাহিরে সার থাকে। কিন্তু মটর প্রভৃতি বীজে সার বীজপত্রের মধ্যে থাকে, অতএব বীজ দুই প্রকার—(১) **বহিঃসার** (albuminous) অর্থাৎ যে বীজে শিশু-উদ্ভিদের বাহিরে সার থাকে, (২) **অন্তঃসার** (exalbuminous) অর্থাৎ যে বীজে শিশু-উদ্ভিদের বীজপত্রে সার থাকে। তোমরা তালশাঁস দেখিয়াছ ত? তালশাঁস খাইতে কত ভালবাস। এই তালশাঁস তালগাছের বীজ। তালশাঁস খাইবার সময় তোমরা যে খোসা ছাড়াইয়া ফেলিয়া দাও, তাহাই তালবীজের খোসা, আর যে শাঁস খাও তাহাই সার; শিশু-উদ্ভিদ অতি ক্ষুদ্র, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন।

ভেরেণ্ডা বীজ
গোটা

ভেরেণ্ডা বীজ
লম্বালম্বি চেরা

একটা ধান লম্বালম্বি চিরিয়া পরীক্ষা কর। দেখ, ইহা এক প্রকার সাদা পদার্থে পূর্ণ। ঐ সাদা পদার্থের নীচের দিকের একটা কোণ চকচকে, বাকিটা চকচকে নহে। এই চকচকে অংশটি ধানের শিশু-উদ্ভিদ বা ভ্রূণ, বাকি সাদা অংশ সার। এই ক্ষুদ্র চকচকে ভ্রূণ যে স্থানে বাকি সাদা পদার্থের সহিত মিলিত, তথায় একটি মাত্র বীজ-পত্র দেখ, এই বীজ-পত্রকে **স্কুটেলাম** বা **ঢাল** (scutellum) বলে। এই

ঢাল বীজকে অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা করে। ধানের শিশু-উদ্ভিদে দুই বীজ-পত্র থাকে না। যব, ভুট্টা, আখ, খেজুর, তাল, নারিকেল, সুপারী,

ধান লম্বালম্বি চেরা

কিয়া, আদা, হলুদ, কলা প্রভৃতি গাছের বীজেও ধান-বীজের ন্যায় একমাত্র বীজ-পত্র থাকে। এইজন্য ধান, যব, ভুট্টা প্রভৃতি গাছের বীজকে **একদল-বীজ** বলা হয়। উপরে যে সকল বীজের কথা বলিলাম, তাহারা এজন্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—এক শ্রেণীর বীজে দুই বীজ-পত্র, অপর শ্রেণীর বীজে একমাত্র বীজ-পত্র। সমস্ত গাছ-পালা যাহাদের বীজ হয়, তাহারা এইজন্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা, **একদল-বীজ** (Monocotyledon) ও **দ্বিদল-বীজ** (Dicotyledon)। অঙ্কুরোদ্গমের সময়ে অধিকাংশ বীজের বীজদল মাটির নীচেই থাকে। তবে কোন কোন বীজের বীজদল মাটির উপরে উঠিয়া কাণ্ডে জোড়া দেখা যায়। প্রথম অবস্থাকে ইংরেজিতে **হাইপোগিয়েল** (hypogeal) অঙ্কুরোদ্গম এবং দ্বিতীয় অবস্থাকে ইংরেজিতে **এপিগিয়েল** (epigeal) অঙ্কুরোদ্গম বলা হয়। তেঁতুল বীজের অঙ্কুরোদ্গম শেষোক্ত প্রকারের সুন্দর উদাহরণ। চতুর্থ পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ শিম বীজের অঙ্কুরোদ্গম এপিগিয়েল।

বীজের অঙ্কুরণ—উপরে বলিয়াছি বীজ বাড়িয়া চারাগাছ হয়। কিরূপে চারাগাছ হয়, এখন বুঝিতে হইবে। একটা সরায় ধূলার মত মাটি রাখিয়া তাহার উপর গোটা কতক শিমবীজ অল্প জল দিয়া ভিজাইয়া রাখ। একদিন দুইদিন পরে দেখিবে, ঐ বীজ হইতে সাদা সাদা কল বাহির হইয়াছে। একটা কলান বীজ লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে, ভ্রূণের ভাবী-মূল বাড়িয়া বীজের বাহিরে আসিয়াছে। আরও দুই একদিন পরে দেখিবে, ঐ ভাবী-মূল মাটির দিকে মুখ করিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিতেছে, আর ভাবী-কাণ্ড বাড়িয়া আকাশের দিকে উঠিতেছে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে ভাবী-মূল হইতে মূল হইয়া ও ভাবী-কাণ্ড হইতে কাণ্ড হইয়া চারাগাছ জন্মে। তখন পুরু বীজ-পত্র দুইটি পাতলা হইয়া খসিয়া পড়ে এবং কাণ্ডে সবুজ পাতা দেখা দেয়।

ভ্রূণের আহার—এখন বুঝিতে হইবে ভ্রূণ বাড়িয়া চারাগাছ হইবার জন্য কি দরকার? তোমরা একসময়ে শিশু ছিলে, এখন বড় হইয়াছ। বড় হইবার উপায় কি? উপায় আহার। আহার না পাইলে ছোট ছেলে বড় হয় না, আহার না পাইলে শিশু-উদ্ভিদ বা ভ্রূণও বড় হয় না, আহার না পাইলে শিশু-উদ্ভিদ বা ভ্রূণও মরিয়া যায়। শিশু-উদ্ভিদের আহার কি ও সেই আহার কোথা হইতে কিরূপে পায়? বহিঃসার বীজে সারে ও অন্তঃসার বীজে বীজপত্রে আহার সঞ্চিত থাকে। এই সঞ্চিত আহার এমন কঠিন অবস্থায় থাকে যে, শিশু-উদ্ভিদ তাহা খাইতে পারে না। দেখ মৎস্য চাউল ডাইল আমাদের খাদ্য, কিন্তু না রাঁধিলে তাহা খাওয়া যায় না। সেইরূপ বীজের ভিতরে সঞ্চিত কঠিন খাদ্য গলিয়া তরল অর্থাৎ জলের মত না হইলে, চারা গাছ তাহা খাইতে পারে না। এখন কঠিন খাদ্য তরল হয় কিরূপে? কঠিন রূপ ছাড়িয়া তরল রূপ ধরিবার জন্য বায়ু, উত্তাপ ও জল আবশ্যক। ইহাদের সাহায্যে কঠিন পদার্থ তরল হয় ও তরল পদার্থ খাইয়া গাছ বাড়ে। আমরা তরল ও কঠিন দুই প্রকার পদার্থই খাইতে পারি, কিন্তু গাছপালা তরল পদার্থ ভিন্ন কঠিন পদার্থ খাইতে পারে না।

বায়ু, উত্তাপ ও জল—দেখ চাষীরা কেমন মাটি চষিয়া খুঁড়িয়া ধূলার মত করিয়া তাহাতে বীজ রোপণ করে। এইরূপ মাটিতে বায়ু, জল ও উত্তাপ সুলভ, এরূপ মাটিতে বীজস্থ কঠিন খাদ্য, বায়ু জল ও উত্তাপ সাহায্যে তরল হয় ও তরল খাদ্য খাইয়া বীজ সহজে কলায়। উত্তাপ ও জল অতিরিক্ত হইলে, বীজের শিশু-উদ্ভিদ নষ্ট হয় ও বীজের কল বাহির হয় না। ছোলা ভাজিয়া রোপণ করিলে, তাহা হইতে

কি ছোলা গাছ জন্মে ? না, অধিক উত্তাপে শিশু-উদ্ভিদ নষ্ট হইয়া যায়। অধিক দিন ছোলা ভিজাইয়া রাখিলেও শিশু-উদ্ভিদ পচিয়া যায়। বসা মাটি অর্থাৎ যে মাটির ভিতর বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, এরূপ মাটিতে ছোলা মটর পোঁত, বায়ু অভাবে গাছ হইবে না। আরও দেখ, বীজ রোপণ করিয়া মাটি চাপা দিতে হয়। বীজ কলাইবার জন্য বায়ু উত্তাপ ও জল আবশ্যক, কিন্তু আলোর দরকার হয় না, বরং আলোতে বীজ কলাইবার বিঘ্ন ঘটে, সেইজন্য বীজ বুনিয়া মাটি ঢাকা দিতে হয়।

প্রশ্নমালা

(১) গোটা ছোলার প্রত্যেক অংশ ও তাহাদের নাম লিখ।

(২) শিশু-উদ্ভিদ কাহাকে বলে ? ছোলার শিশু-উদ্ভিদের বর্ণনা কর।

(৩) অন্তঃসার ও বহিঃসার বীজ কাহাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

(৪) একদল-বীজ ও দ্বিদল-বীজ গাছের কতকগুলি উদাহরণ দাও।

(৫) মাটিতে বীজ পুঁতিলে অঙ্কুরোদ্গম হয়। এই অঙ্কুরোদ্গমের বিষয় যাহা জান বল ?

(৬) চাষীরা বীজ ছড়াইয়া মাটি ঢাকা দেয় কেন ?

চতুর্থ অধ্যায়

মূল ও তাহার কার্য

কতকগুলি ছোট ছোট গাছ সংগ্রহ কর। উহাদের প্রায় সকলেরই মূল কাণ্ড ও পাতা আছে। মূলকে চলিত কথায় শিকড় বলে। কাণ্ডের চলিত নাম গুঁড়ি ও ডাঁটা। বড় কাণ্ডকে গুঁড়ি বলে, ছোট কাণ্ডকে ডাঁটা বলে। যথা, আম গাছের গুঁড়ি ও পুঁই গাছের ডাঁটা।

মূলের আকার নানা প্রকার। লেবু, শিম, ছোলা, কুমড়া, সরিষার চারা ও পেঁয়াজ বা ধানের চারা উপাড়িয়া পরীক্ষা কর। দেখিবে লেবু প্রভৃতির মূল সোজাভাবে মাটির মধ্যে নামে, উহা

লেবুচারার প্রধান মূল

পেঁয়াজ গাছের গুচ্ছ মূল

যেন কাণ্ডেরই নীচের অংশ। উহার গা হইতে ক্রমে সরু সরু শাখা অর্থাৎ ডাল বাহির হইয়া চারিধারে ছড়াইয়া পড়ে। পেঁয়াজের গোড়া হইতে এক গোছা ভাসা ভাসা সরু মূল বাহির হইয়া মাটির মধ্যে ছড়াইয়া

পড়িয়াছে, কোন একটি মূল সোজাভাবে নীচের দিকে নামে নাই, ইহাদের একটিকে প্রধান মূল ও অপরগুলিকে শাখা মূল বলিতে পার না। লেবু ও লেবুর মত গাছের মূলকে **প্রধান মূল** (tap-root) এবং

মূলা (ফিউসিফরম) গাজর (কনিক্যাল) শালগম (নেপিফরম)
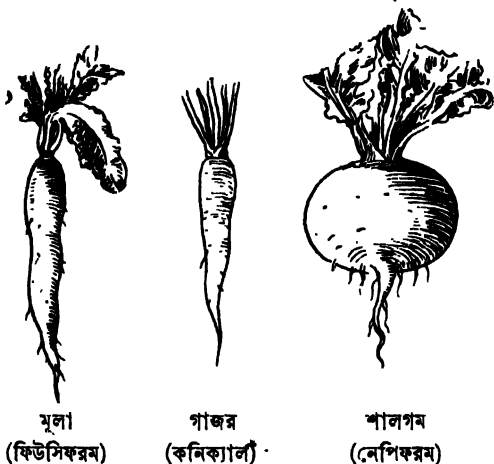
পেঁয়াজ ও পেঁয়াজের মত গাছের মূলকে **গুচ্ছ মূল** (fibrous root) বলে। মূলা, গাজর, শালগম, পালঙের গোড়া, নটের গোড়া প্রভৃতির মূল প্রধান মূলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহারা পুষ্টিকর পদার্থে পূর্ণ, লোকে সেইজন্য এই সকল মূল ভক্ষণ করে।

মূলা, শালগম ও গাজরের ন্যায় মোটা মূলকে ইংরেজিতে যথাক্রমে **ফিউসিফরম** (fusiform), **নেপিফরম** (napiform) ও **কনিক্যাল** (conical) বলে।

ধান, আখ, বাঁশ, ভুট্টা, মূথা, পেঁয়াজ, শতমূলী প্রভৃতি মূল গুচ্ছ মূলের সুন্দর দৃষ্টান্ত। আম, জাম, কাঁটাল, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের প্রধান মূল ক্রমে এত শাখা প্রশাখা যুক্ত হয় ও ঐ শাখাগুলি ক্রমে এত মোটা হয় যে, শেষে প্রধান ও শাখামূলের প্রভেদ বুঝা যায় না।

সচরাচর ভ্রূণের ভাবী-মূল হইতেই মূল বাহির হয়, কিন্তু ইহা ছাড়া কোন কোন গাছের অন্য স্থান হইতে, এমন কি কাণ্ড ও পাতা হইতেও মূল বাহির হয়। দূর্ব্বা, তাল, কিয়া, ভুট্টা, আখ, মাটিতে লতান কুমড়া,

কেয়াগাছের অস্থানিক ঠেশমূল

গাছে-জড়ান গজপিপুল প্রভৃতি গাছের কাণ্ড হইতে এইরূপ মূল বাহির হয়। বটগাছের ডাল হইতে যে ঝুরি নামে, তাহাও এইরূপ মূলের উদাহরণ। বিগোনিয়া ও পাথরকুচি গাছের (১৪শ পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ) পাতা হইতেও এইরূপ মূল হয়। ভ্রূণের ভাবী-মূল হইতে যে মূল হয় তাহাকে **আসল মূল** (true root) বলে, এবং উদ্ভিদের অন্য কোন স্থান হইতে যে মূল হয় তাহাকে **অস্থানিক মূল** (adventitious root)

বলে। উৎপত্তি অনুসারে মূল আসলই হউক আর নকলই হউক, উহাদের কাজে কোন প্রভেদ নাই, কাজে দুই প্রকার মূলই সমান।

পাথরকুচি পাতার কিনারায় অস্থানিক মূল সহ চারা বাহির হইয়াছে

বট কিংবা আমগাছের অথবা মটর গাছের একটি প্রধান মূল সাবধানে ধুইয়া দেখ। ঐ প্রধান মূলের আগায় টুপীর মত একটি অংশ

ক্ষুদিপানার মূল ও মূল হইতে খসান থাপ বা মূলত্রাণ
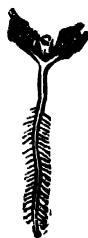
মূলরোম

আছে, ইহাকে **মূলত্রাণ** (root cap) বলে। ইহা মূলের কোমল অংশকে মাটি ভেদ করিবার সময় আঘাত হইতে রক্ষা করে। ক্ষুদি

পানার মূলে এই মূলত্রাণ সহজে দেখা যায়। এই মূলত্রাণের কিছু উপরে কতকগুলি সরু সরু কেশ দেখা যায়। ইহাদিগকে **মূলরোম** (root-hair) বলা হয়। উদ্ভিদ, খাদ্যের উপাদান এই মূলরোমের সাহায্যে মাটি হইতে শোষণ করে (১৪শ পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ)।

অর্কিড (Orchid) জাতীয় উদ্ভিদের মূল কতক বায়ুতে ঝুলে ও কতক আশ্রয়-বৃক্ষে জড়াইয়া থাকে ও তদুপরি বাড়িতে থাকে;

বৃক্ষারূহা অর্কিড

মাটির সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই। তাহাদের মূল এরূপ আবরণে ঢাকা যে, সেই আবরণের সাহায্যে উদ্ভিদ বায়ু হইতে আপন আপন আহার সংগ্রহ করিতে পারে। এরূপ উদ্ভিদকে ইংরেজিতে

এপিফাইট (epiphyte) বলে। আমরা ইহাকে **বৃক্ষারুহা** বা **গাছেচড়া** মূল বলিব। আমগাছে এক প্রকার অর্কিড সচরাচর জন্মে, যাহার বাংলা নাম রাসনা। রাসনা প্রভৃতি অর্কিড জাতীয় উদ্ভিদের যে সকল মূল বায়ুতে ঝুলিয়া থাকে, সেই মূলগুলিকে **বায়বীয় মূল** (aerial roots) বলা হয়।

বনে জঙ্গলে গজপিপুল নামক এক প্রকার মোটা লতা অন্য গাছের গুঁড়ি বাহিয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। ইহা কচু জাতীয় গাছ। এই সকল বৃক্ষারুহা গাছের কাণ্ড হইতে নকল মূলের গোছা বাহির হইয়া আশ্রয়বৃক্ষকে জড়াইয়া ধরে, ঝড় বৃষ্টিতে উহাদিগকে পড়িতে দেয় না। এইরূপ মূলকে **আরোহী মূল** (climbing root) বলে।

তোমরা আলোকলতা দেখিয়া থাকিবে। এই লতা নানা প্রকার বৃক্ষে জড়াইয়া থাকে। আশ্রয়বৃক্ষ হইতে ছাড়াইতে চেষ্টা করিলে দেখিবে, ঐ লতা স্থানে স্থানে আশ্রয়বৃক্ষে নকল মূল দ্বারা পোঁতা। ঐ পোঁতা মূল আশ্রয়-বৃক্ষের রস চুষিয়া ঐ লতার দেহ পুষ্ট করে। ঐ লতা আহারের জন্য মাটি ও বায়ুর উপর নির্ভর করে না। এইরূপ গাছকে **পর-ভোজী** বা **বৃক্ষাদনী** (parasite) বলে। ইহারা পরের ভোজনদ্রব্য অপহরণ করিয়া খায়। সাধারণ উদ্ভিদের ন্যায় ইহাদিগকে পাতার সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করিতে হয় না, সেজন্য ইহার পাতা নাই বলিলেও হয়; ইহাদের রঙও সবুজ নহে, কারণ সবুজ রঙের দরকার হয় না। আম বট প্রভৃতি গাছে **ছোট মান্দা** ও **বড় মান্দা** নামক দুই পরভোজী উদ্ভিদ জন্মিতে

বৃক্ষাদনী আলোকলতা

ক—বেগুন গাছের মূলে
পরভোজী বেনে বউ

প্রায় দেখা যায়। আশ্রয়-বৃক্ষের ডাল চিরিলে ইহাদের মূল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাদের পাতা আছে ও সেই পাতা সবুজ, কারণ ইহারা যখন যেমন সুবিধা, সেই অনুসারে অন্য গাছের আহার অপহরণ করিয়া খায়, অথবা নিজে বায়ু হইতে কতক অংশ আহার সংগ্রহ করে। অতএব ইহারা **আংশিক পরভোজী** বা **বৃক্ষাদনী** শ্রেণীভুক্ত।

বড় মান্দা ও আমডালে তাহার পোঁতা মূল
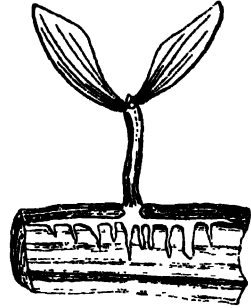
আরও দেখ, পরভোজী উদ্ভিদের অধিক বাড় হইলে, আশ্রয়-উদ্ভিদ আহারের অভাবে ক্রমে শুকাইয়া মরিয়া যায়। যে সকল জমিতে তামাক ও বেগুনের চাষ হয়, সেই সকল জমিতে সন্ধান করিলে দেখিবে, অনেক গাছের গোড়ার কাছে, পাতা ও ডালের আড়ালে, ঈষৎ নীল রঙের ফুলের শীষ ফুটিয়া রহিয়াছে। মাটি খুঁড়িয়া দেখ, যে গাছ ফুলের শীষ প্রসব করিয়াছে, তাহার মূল ঐ তামাক অথবা বেগুন গাছের মূলে পোঁতা। ইহাও এক প্রকার পরভোজী উদ্ভিদ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **অরোবেঙ্কি** (Orobanche)। ইহা জীবন্ত তামাক প্রভৃতি গাছের মূলে জন্মে ও ঐ সকল গাছের রস খাইয়া পুষ্ট হয়। কাজেই ইহার উপদ্রব বেশি হইলে, তামাক ও বেগুন গাছ শুকাইয়া মরিয়া যায়। এই পরভোজী উদ্ভিদকে বর্দ্ধমান জেলায় লোকে **বেনেবউ** বলে। রঙ্গিন প্লেট দেখ।

তোমরা ব্যাঙের ছাতা দেখিয়াছ (প্রথম পৃষ্ঠার চিত্র)। ইহারা পচা পোয়াল, পচা-কাঠ, গোবর প্রভৃতি বস্তুর উপর জন্মে। ইহাদিগকে অনেকে পাতাল-ফোড় বলে। ইহাদের মূলের ন্যায় অংশ, পচা-পোয়াল,

পচা-কাঠ, গোবর ইত্যাদি পদার্থের ভিতর থাকে ও সেই সকল জিনিষ হইতে আহার সংগ্রহ করে। এইরূপ উদ্ভিদকে ইংরেজিতে **স্যাপরোফাইট** (saprophyte) বলে, বাংলায় ইহাদিগকে **পুরীষভোজী** বলিতে পার, অর্থাৎ ইহারা ময়লা খায়। পচা দধি, ভিজা জুতা, গোবর প্রভৃতি বস্তুর উপর যে ছোট ছোট ছাতা ধরে, তাহাও পুরীষভোজী উদ্ভিদ।

বাহন অনুসারে মূল স্থলবাসী, জলবাসী, ব্যোমবাসী, বৃক্ষারুহা, পরভোজী ও পুরীষভোজী। অধিকাংশ মূল স্থলবাসী। বড়পানা, ক্ষুদিপানা, কলমী শাক, শুশুনি শাক প্রভৃতি জলবাসী। বটের ঝুরি ব্যোমবাসী। অর্কিড ও গজপিপুল বৃক্ষারুহা। আলোকলতা, মান্দা, বেনেবউ পরভোজী। ব্যাঙের ছাতা ও ছোট ছাতা পুরীষভোজী।

মূলের কাজ—একটা চারা তেঁতুল গাছ, অথবা চারা খেজুর গাছ উপাড়িয়া তুলিতে চেষ্টা কর। দেখিবে, বেশি জোর না দিলে উহাদিগকে উপাড়িয়া তোলা কঠিন। ইহাতে কি প্রকাশ পায়? এই প্রকাশ পায় যে, মূলের কার্য গাছকে মাটিতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া রাখা। বাতাস ঝড় বৃষ্টি জলস্রোত ও জন্তু যাহাতে সহজে গাছকে টানিয়া নানাস্থানে ফেলিতে না পারে, তজ্জন্য গাছ মূল দ্বারা মাটিতে পোঁতা থাকে। কিন্তু মূলের প্রধান কাজ মাটি হইতে জল-শোষণ করা। পূর্বেই বলা হইয়াছে মূলের কচি বাড়ন্ত অগ্রভাগে **মূলত্রাণ** (root-cap) থাকে এবং মূলত্রাণের কিছু উপরে **মূলরোম** থাকে। এই মূলরোমের সাহায্যে মূল মাটি হইতে জলীয় অর্থাৎ তরল খাদ্য গ্রহণ করে।

মাটিতে নানাপ্রকার পদার্থ আছে, তাহার মধ্যে কোন কোন পদার্থ জলে গলে, কোন কোন পদার্থ জলে গলে না। যে পদার্থ গলে, তাহা জলের সহিত মূলে প্রবেশ করে। আর যাহা জলে গলে না, তাহা প্রবেশ করিতে পারে না। তবে মূল হইতে এক প্রকার তরল

অম্লরস বাহির হইয়া মাটিতে মিশে। মাটির কোন কোন পদার্থ যাহা জলে গলে না, তাহা এই অম্লরসের সাহায্যে জলে গলিত হয় ও তখন মূলে প্রবেশ করে। দেখ মার্বেল পাথর জলে গলে না, সেই মার্বেল পাথরের উপর মাটি চারাইয়া গাছ দিলে দেখা যায় যে, গাছের মূলের চিত্র সেই পাথরে অঙ্কিত হয়। গাছ ও মাটি ফেলিয়া মার্বেল পাথর পরীক্ষা করিলে, এই মূলের চিত্র তাহাতে খোদা দেখা যায়। ইহাতে উপরের কথা স্পষ্ট বুঝা যায়, অর্থাৎ মার্বেল পাথর যদিও জলে গলে না, কিন্তু মূল হইতে যে রস বাহির হয় তাহাতে গলে এবং সেইজন্য মূলের চিত্র তাহাতে অঙ্কিত হয়। এই সকল গলিত পদার্থ উদ্ভিদের আহার্য।

জল এই সকল পদার্থ লইয়া মূলরোমের ভিতর দিয়া মূলে প্রবেশ করে। মূলের ভিতর পথ বিশেষ বা নালি আছে, সেই পথ বাহিয়া ঐ জল ক্রমে কাণ্ডে প্রবেশ করে; কাণ্ডের ভিতরের পথ বিশেষ বাহিয়া সেই জল পাতায় উপস্থিত হয়। অতএব মূলের কার্য মাটি হইতে জল শোষণ করিয়া তাহাকে বহিয়া কাণ্ডে পৌছাইয়া দেওয়া।

পরীক্ষা দ্বারা স্থির করা হইয়াছে যে, উদ্ভিদগণ যে সকল জিনিষ মাটি হইতে খাদ্যরূপে সংগ্রহ করে, তন্মধ্যে সাতটি অর্থাৎ পোটাসিয়ম, ম্যাগনিসিয়ম, ক্যালসিয়ম, লৌহ, ফসফোরস, গন্ধক ও নাইট্রোজেন না হইলে উদ্ভিদের মোটেই চলে না, সেই সাতটি জিনিষ না পাইলে উদ্ভিদ বাড়িতে না পারিয়া মরিয়া যায়। এই সাতটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে একটির অভাবেও উদ্ভিদ মরিয়া যায়।

আগে বলা হইয়াছে জল মৃত্তিকা হইতে মূলরোম দিয়া উদ্ভিদে প্রবেশ করে। মূলরোমের অতি পাতলা আবরণ ভেদ করিয়া রোমের মধ্যে জলের প্রবেশ ও রোমের মধ্য হইতে জলের বহিরাগমন করাকে **অসমোসিস** (osmosis) বলে।

প্রশ্নমালা

(১) প্রধান মূল ও গুচ্ছ মূল কাহাকে বলে? উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

(২) আসল মূল ও অস্থানিক মূলের প্রভেদ বর্ণনা কর ও উদাহরণ দাও।

(৩) মূলত্রাণ ও মূলরোম কাহাকে বলে? উহাদের কি কাজ?

(৪) বৃক্ষারুহা, বৃক্ষাদনী ও পুরীষভোজী বৃক্ষ কাহাকে বলে?

(৫) আরোহী মূল ও বায়বীয় মূল বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

কাণ্ড ও তাহার কার্য

ভ্রূণের ভাবী কাণ্ড বড় হইয়া কাণ্ডে পরিণত হয়। এই কাণ্ড শাখা-প্রশাখা ও পত্র বহন করে। কাণ্ডের যে নির্দিষ্ট স্থান হইতে পাতা বাহির হয়, তাহাকে **পর্বসন্ধি** বা **গাঁইট** (node) বলে। দুইটি গাঁইটের মধ্যের স্থানকে **পর্ব** বা **পাব** (internode) বলে। পাতা পর্বসন্ধি হইতে পর পর বাহির হয়।
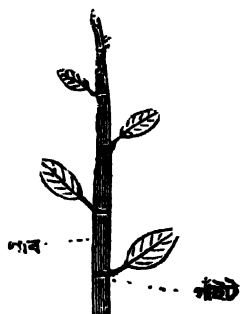
গাঁইট ও পাব

কাণ্ড নানা প্রকার। আম, বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছের কাণ্ড শক্ত ও দাঁড়াইয়া থাকে। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছের কাণ্ড দুর্বল; সেইজন্য এই সকল গাছ মাটিতে লতাইয়া অথবা মাচায় লতাইয়া থাকে। শিম প্রভৃতি লতান গাছ আকর্ষ (tendril) দ্বারা অন্য গাছ বা জিনিষকে জড়াইয়া উপরে উঠে।

বেশির ভাগ গাছের কাণ্ড গোল। কিন্তু ফণিমনসা গাছের কাণ্ড পাতার ন্যায় চ্যাপ্টা ও সবুজ, তুলশী গাছের কচি কাণ্ড চতুষ্কোণ, মুথা ও মাদুর কাটি গাছের কাণ্ড ত্রিকোণ। ফণিমনসার কাণ্ড **পাতা-**

ফিতা গাছ

পাতারূপী কাণ্ড

রূপী, ইহাকে ইংরেজিতে **ক্লাডোড** (cladode) বলে । দেখ, ইহার গাঁইট পাব ও পাতা আছে এবং এই পাতা শীঘ্র ঝরিয়া পড়ে। তোমরা যাহাকে ঝাউ পাতা বল তাহা পাতা নহে, তাহা কচি সবুজ **পাতারূপী** কাণ্ড এবং কাণ্ডের ন্যায় তাহাতে গাঁইট ও পাব আছে এবং গাঁইটে গাঁইটে কটা পাতার আবর্ত। ফিতা-গাছ (Muehlenbeckia platyclada Tape plant) নামের এক প্রকার বিদেশী উদ্ভিদ কোন কোন বাগানে দেখা যায়, যাহা পাতারূপী কাণ্ডের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইহাতে কাণ্ডের সব লক্ষণ দেখা যায়। রঙ্গিন প্লেট দেখ।

ফণিমনসা

মাটিতে পোঁতা কাণ্ড—আদা, হলুদ, কচু, কলা, পেঁয়াজ, রসুন,

আলু

আদা

আলু, ওল প্রভৃতি গাছের কাণ্ড অন্যান্য গাছের কাণ্ডের ন্যায় মাটির

উপরে থাকে না, মাটিতে পোঁতা থাকে, এজন্য ঐ সকল ও ঐরূপ অন্যান্য কাণ্ডকে প্রথমে মূল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উহারা প্রকৃত মূল নহে। দেখ কাণ্ডের ন্যায় আদা, হলুদ প্রভৃতি উপরিকথিত উদ্ভিদে গাঁইট ও পাব আছে, গাঁইটে গাঁইটে ছোট কটা রঙের আঁইশের মত পাতাও আছে, আর সেই পাতার জোড়মুখে মুকুল। মুকুল কি, তাহা পরে বলিতেছি।

মূল ও কাণ্ডের প্রভেদ—মূলের অগ্রভাগ অর্থাৎ আগা নীচমুখ হইয়া মাটির ভিতরে ঢুকে, কাণ্ডের আগা উপরমুখ করিয়া আকাশের
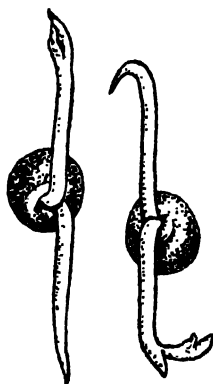
অঙ্কুরিত বীজের সহজ অবস্থা অঙ্কুরিত বীজের উল্টা অবস্থা

দিকে উঠে। মূল ও কাণ্ডের আগা উল্টা করিয়া রাখিলেও, উহারা বাঁকিয়া আপন আপন পথ খুঁজিয়া লয় অর্থাৎ মূলের আগা বাঁকিয়া নীচুমুখ ও কাণ্ডের আগা বাঁকিয়া উপরমুখ হয়।

এদিকে মূল যেমন মাটির মধ্যে বাড়িতে ও শাখা বিস্তার করিতে থাকে, অপরদিকে সেইরূপ কাণ্ড মাটির উপরে থাকিয়া বাড়িতে ও

শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে থাকে এবং সেই কাণ্ড ও শাখার গায়ে নীচে হইতে উপরের দিকে ক্রমে নূতন পাতা গজাইতে থাকে। কাণ্ডের কোমল আগা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কচি পাতার গোছায় ঢাকা থাকে, এই পাতার গোছা-ঢাকা কাণ্ডের আগাকে **মাথার মুকুল** বলিতে পার। পাতা যে যে স্থানে কাণ্ডে জোড়া, সেই সেই জোড়-মুখে যে দুই কোণ প্রস্তুত হয়, তাহার উপর-কোণকে **এক্সিল** (axil) বা **কক্ষ** বলে। ঐ এক্সিলে মুকুল দেখিবে, ঐ মুকুল **এক্সিলারী মুকুল** বা **কক্ষমুকুল** বা **গায়ের**

গায়ের মুকুল খেজুর গাছ

মুকুল। মাথার মুকুলের বৃদ্ধিতে কাণ্ড দীর্ঘ হয়, আর গায়ের মুকুলের বৃদ্ধিতে কাণ্ড শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয়। যে সকল গাছের গায়ের মুকুল বাড়ে না, সেই সকল গাছের কাণ্ড কেবল মাথায় বাড়ে, শাখা হয় না, যেমন তাল, নারিকেল, খেজুর ইত্যাদি। মূলের আগা খাপে ঢাকা থাকে কেন তাহার কারণ জানিয়াছ। কাণ্ডের আগা কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতার গোছায় ঢাকা থাকে, কারণ ইহাকে মূলের ন্যায় কঠিন মাটি ভেদ করিতে হয় না। মূলের আগার উপরের অংশ মূলরোমে আবৃত, কাণ্ডের আগায় সেরূপ রোম নাই ; কাণ্ডে পাতা হয়, মূলে পাতা হয় না। কাণ্ডে গাঁইট ও পাব থাকে, মূলে গাঁইট ও পাব থাকে না।

প্রশ্নমালা

(১) কাণ্ডের পাব ও গাইট কাহাকে বলে ?

(২) চ্যাপ্টা, ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ কাণ্ডের উদাহরণ দাও।

(৩) আদা ও আলু মাটিতে পোতা থাকে। ইহাদিগকে মূল না বলিয়া কাণ্ড বলা হয় কেন ?

(৪) মূল ও কাণ্ডের প্রভেদ বুঝাইয়া দাও।

(৫) মুকুল কাহাকে বলে ? মাথার ও গায়ের মুকুলে প্রভেদ কি ?

(৬) তাল, খেজুর প্রভৃতি গাছের শাখা হয় না কেন ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাতা ও তাহার কার্য

পাতার অংশ—পাতা কাণ্ডের পর্বসন্ধিতে জোড়া থাকে। প্রথমে কলাপাতা লইয়া পরীক্ষা কর (পাশের চিত্র দেখ)। ইহার চওড়া পাতলা অংশকে **ফলক** (blade-ক) কহে। এই ফলক কাটিয়া আমরা ভাত খাই। ইহার ডাঁটাকে **বৃন্ত** বা **বোঁটা** (petiole-খ) ও পেটোকে **বেষ্টনী** (sheath-গ) বলে। যে সকল পাতার বোঁটা আছে, তাহাদিগকে **সবৃন্তক** ও যাহাদের বোঁটা নাই, তাহাদিগকে **অবৃন্তক** পাতা বলা হয়। ছোট কচু, মানকচু, তাল প্রভৃতি গাছের পাতায় এইরূপ তিন অংশ অর্থাৎ ফলক, বৃন্ত ও বেষ্টনী আছে। আক, ভুট্টা, ঘাস প্রভৃতি গাছের পাতায় ফলক ও বেষ্টনী আছে, কিন্তু বৃন্ত নাই। জবা, অশ্বত্থ, পদ্ম প্রভৃতি গাছের পাতায় ফলক ও বৃন্ত আছে, কিন্তু বেষ্টনী নাই। অধিকাংশ

কলাপাতা

পাতাই শেষোক্ত প্রকারের, রঙ্গন, জিনিয়া (Zinia), গন্ধরাজ প্রভৃতি পাতায় কেবলমাত্র ফলক আছে, বৃন্ত ও বেষ্টনী নাই।

উপপত্র—অনেক সময় পাতার বোঁটায় উপাঙ্গজোড়া থাকে, তাহাকে **উপপত্র** (stipules) বলে। উপপত্র প্রায় সবুজ পাতার আকার বিশিষ্ট, অথবা সূত্রাকার, অথবা কটা রঙের ক্ষুদ্র পাতার মত। এই উপপত্র নানাপ্রকার, যথা (১) দুই উপপত্র বোঁটার দুই পার্শ্বে অবস্থিত ও বোঁটায় জোড়া নহে—যেমন জবা, তেঁতুল, কৃষ্ণচূড়া; (২) বোঁটার দুই পার্শ্বে অবস্থিত কিন্তু বোঁটায় জোড়া—যেমন গোলাপ গাছের উপপত্র; (৩) মুখোমুখি পত্র-চক্র অথবা বৃত্তাকার পত্র-চক্রের পাতার বোঁটার ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত—যেমন রঙ্গন ও কদম্ব গাছের উপপত্র; (৪) পাতার কক্ষে (axil) অবস্থিত—যেমন গন্ধরাজ; (৫) কোন কোন পত্র-মুকুল ও পুষ্পমুকুল কটা রঙের পাতার দ্বারা আবৃত এবং উহারা ঐ মুকুল সকলকে অনিষ্টের হস্ত হইতে রক্ষা করে—যেমন কাটাল, অশ্বত্থ ও বটের উপপত্র; (৬) ফলক ও বেষ্টনীর জোড়মুখে এবং বেষ্টনী ও ফলকের ভিতর পিঠে, পাতলা কাগজের মত অথবা কেশের মত অবয়ত —যেমন ঘাস, আক, ভুট্টাগাছ ইত্যাদির উপপত্র; (৭) পত্রের কক্ষে নলের মত অবয়ব যাহা কক্ষের উপরিভাগের কাণ্ডকে কতকদূর পর্যন্ত বেষ্টন করিয়া থাকে—যেমন চুকাপালঙ বা টকপালঙ, পানিমরিচ।

জঙ্গলী মটর

আকর্ষ—সূতার আকারে পরিবর্তিত পাতা বা পাতার অংশের নাম **আকর্ষ** (tendril)। কোন কোন গাছের পাতার সমগ্র ফলকটি আকর্ষে পরিবর্তিত হয়,—যেমন **জঙ্গলী মটর** (উপরের চিত্র দেখ)। আবার কোন কোন গাছের পত্রের অনুফলকগুলির মধ্যে উপরেরগুলি আকর্ষে পরিবর্তিত হয়—যেমন মটর,

মসুর, মাসকলাই, ছাগল বাটি। কোন কোন গাছের পত্রকক্ষস্থ মুকুল আকর্ষে পরিবর্তিত হয়—যেমন ঝুমকালতা। কোন কোন গাছের উপপত্র পরিবর্তিত হইয়া আকর্ষ আকার ধারণ করে—যেমন কুমারিকা (২৮শ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। কোন কোন গাছের পাতার অগ্রভাগ আকর্ষের আকার ধারণ করে—যেমন উলট চণ্ডাল। আকর্ষ দ্বারা উদ্ভিদ অন্য গাছ অথবা আশ্রয়কে আঁকড়াইয়া ঐ গাছ অথবা আশ্রয়ের উপর উঠে। চলতি ভাষায় আকর্ষকে শুঁগা বলে।

মৌলিক ও যৌগিক পত্র—একটা পানের পাতার সহিত একটা আমরুল, বেল বা তেঁতুল পাতার তুলনা কর। দেখ, পানের বোঁটার আগায় একটিমাত্র ফলক, কিন্তু আমরুল ও বেলপাতার বোঁটার আগায়
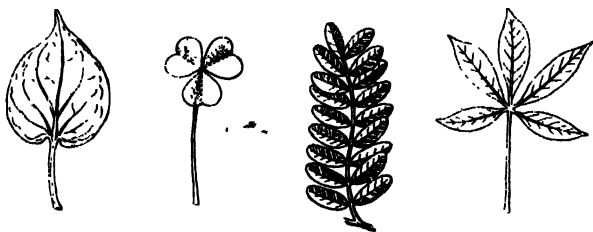
পান আমরুল—করপত্র তেঁতুল—পক্ষপত্র শিমুল—করপত্র

তিনটি ফলক; তেঁতুলপাতায় অনেকগুলি অনুফলক। এজন্য পানের পত্রকে **মৌলিক পত্র** (simple leaf) বা একফলক পত্র এবং আমরুল, বেল ও তেঁতুল পত্রকে **যৌগিক পত্র** (compound leaf) বা বহুফলক পত্র বলে। আম, জাম, জবা, কাঁটাল, আক, ভুট্টা প্রভৃতি পত্র এই অর্থে মৌলিক পত্র এবং শুশুনি, আমরুল, শিমুল, শিম প্রভৃতি পত্র যৌগিক পত্র।

যৌগিক পত্র দুই প্রকার। শিমুল, শুশুনি, আমরুল, বেল, শিম প্রভৃতি গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া এক দিকে রাখ এবং বক, তেঁতুল,

নিম, মটর, খেজুর প্রভৃতি গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া আর এক দিকে রাখ। এবার দুই ভাগের পাতাগুলি তুলনা করিয়া দেখ। প্রথম ভাগের পাতার ফলকগুলি বোঁটার উপরে, কর বা হাতের আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি সাজান। এজন্য ইহাদের নাম **করপত্র**। দ্বিতীয় ভাগের পাতার ফলকগুলি পেন কলমের পক্ষ বা পালকের মত সাজান। এজন্য ইহাদিগকে বলা হয় **পক্ষপত্র** (২৬শ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)।

ফিলোড (phyllode) বা **পত্রাকার বৃন্ত**—অষ্ট্রেলিয়া দেশে এক প্রকার বাবলা গাছ আছে, যাহার পাতার বৃন্ত চ্যাপ্টা ও সবুজ হইয়া পাতার আকার ধারণ করে, আর প্রকৃত পত্র শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। এই বাবলা এদেশেও স্থানে স্থানে দেখা যায়। (চিত্র দেখ)।

অষ্ট্রেলিয়ার বাবলা

পাতার শিরা রচনা—পান পাতার সহিত বক পাতার বা তেঁতুল পাতার তুলনা কর। দেখ পান পাতায় বোঁটা সোজা ফলকের মধ্যস্থল দিয়া গমন করিয়া উহাকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পানের পত্র ও ইহার ন্যায় সকল সরল পত্রের ফলকের এই মাঝের শিরার নাম **মধ্যশিরা** (mid-rib)। তেঁতুল পাতারও মধ্যশিরা আছে, কিন্তু মধ্যশিরার দুই পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট ফলক বা অনুফলক সাজান। পেন কলমে যেমন পক্ষ অর্থাৎ পালক সাজান থাকে, তেঁতুল পাতার ছোট ছোট ফলকগুলি সেইরূপ মধ্যশিরার দুই ধারে পালকের ন্যায় সাজান। ছোট ছোট ফলকগুলিকে **অনুফলক** (leaflet) বলে।

তেঁতুল পত্রের ন্যায় যুক্তপত্রের মধ্যশিরাকে ইংরেজিতে **র‍্যাকীস** (rachis) কহে।

যে সকল পাতা যোগাড় করিয়াছ, তাহাদের শিরা (veins) পরীক্ষা কর। দেখ আম, জাম, কাঁটাল, দেবদারু, অশ্বত্থ, বট, শিয়ালকাঁটা প্রভৃতি পাতার ফলকের মাঝখানে একটা প্রধান বা মধ্যশিরা, আর উহার দুই পাশে পালকের ন্যায় সাজান অনেক সরু সরু শিরা। তাল, পদ্ম, রেড়ী, পেঁপে, তুলা, ঢেঁড়স প্রভৃতি পাতার ফলকে একটা প্রধান বা মধ্যশিরা

দেবদারু

রেড়ী

নাই, বোঁটার আগা হইতে অনেকগুলি স্থূল শিরা উঠিয়া আঙ্গুলের ন্যায় ফলকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কুল, তেজপাতা, কুমারিকা প্রভৃতি গাছের পাতার ফলকে এক স্থূল মধ্যশিরা ফলককে দুই ভাগে বিভক্ত করে না, তাহার পরিবর্তে কতকগুলি স্থূল শিরা ধনুকের মত বক্রভাবে সাজান।

কুমারিকা

বাঁশ

আখ, ভুট্টা, বাঁশ ঘাস প্রভৃতি পাতার ফলকে কতকগুলি স্থূল শিরা সমান্তরাল ভাবে সাজান। অতএব ফলকের স্থূল শিরা সকলের বিস্তার

অনুসারে পত্রকে **পক্ষ-শির** (pinni-veined), **কর-শির** (palmi-veined), **বক্র-শির** (curvi-veined) ও **সমান্তরাল-শির** (parallel-veined) বলে।

উপরে স্থূল শিরা সকলের কথা বলিলাম। ইহা ছাড়া পাতার ফলকে বহু সূক্ষ্ম শিরা দেখিতে পাইবে। সূর্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া তোমার চক্ষু ও সূর্যের মাঝখানে একটা আম, অশ্বত্থ, বট, অথবা জাম প্রভৃতি দ্বি-বীজপত্রী উদ্ভিদের পাতা ধর, দেখিবে ফলকে সূক্ষ্ম শিরাগুলি মাছধরা জালের আকারে (reticulate) ছড়ান রহিয়াছে; আর ভুট্টা, বাঁশ, ঘাস প্রভৃতি এক-বীজপত্রী উদ্ভিদের পাতার ফলকে সূক্ষ্ম শিরাগুলি এরূপ জালাকার (non-reticulate) নহে।

পত্রের আকার, কিনারা ও অগ্রভাগ—ফলকের আকার (shape), কিনারা অর্থাৎ ধার (margin), অগ্রভাগ অর্থাৎ আগা (apex), কিরূপ তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। দেখ পদ্ম পাতা গোলাকার। এইজন্য ইহাকে **চক্রাকৃতি** (rotund) বলা হয়। পানের পাতা হরতনের টেক্কার

পদ্ম কলমী থুলকুড়ি
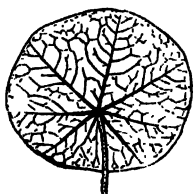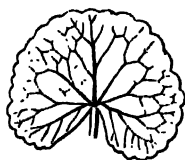
বা মানুষের হৃদয়ের মত। এইজন্য ইহাকে **হৃদয়াকৃতি** (cordate) বলা হয়। কলমীর পাতা **বর্শাকৃতি** (hastate or dart shaped), বাঁশের পাতা **বল্লমাকৃতি** (lanceolate), থুলকুড়ির পাতা **বৃক্কাকৃতি** (reniform or kidney shaped), অর্থাৎ পাতার আকার নানাপ্রকার। পদ্ম, আম ও কাঁটালের পাতার কিনারা কাটা নহে, শালুক বা রক্ত কম্বলের

পাতার কিনারা করাতের দাঁতের ন্যায় কাটা কাটা, জবা পাতার কিনারা অন্যরূপে কাটা, দেবদারু পাতার কিনারা ঢেউ খেলান, এইরূপ নানাপ্রকারের কিনারাযুক্ত ফলক দেখা যায়।

উপরি কথিত পাতা সকলের কিনারা সামান্যরূপে কাটা। কিন্তু পেঁপে, তরমুজ, শিয়ালকাঁটা, তালপাতা, স্থলপদ্ম, রেড়ী (২৮শ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ) প্রভৃতি পাতার কিনারা গভীর ভাবে কাটা। কোন পাতার আগা সূচল যেমন পান, আম, জাম; কোন পাতার আগা অতি সূচল, যেমন অশ্বত্থ পাতা; কোন পাতার আগা ভোঁতা, যেমন আকন্দ পাতা; কোন পাতার আগা নীচের দিকে কাটা, যেমন কাঞ্চন গাছের পাতা।

পাতার কাজ, পরিপাক—তোমরা সচরাচর যে সকল গাছ দেখিতে পাও, উহাদের প্রায় সকলেরই পাতা আছে। অধিকাংশ পাতার রঙই সবুজ। তবে কোন কোন গাছের পাতা কটা রঙের, অথবা পাতা গজাইয়া অল্প দিনের মধ্যেই ঝরিয়া পড়ে। শেষোক্ত প্রকার গাছে কাণ্ড অর্থাৎ ডাঁটা সবুজ হইয়া থাকে। কিরূপে পাতায় ও গাছে এই সবুজ রঙ ধরে, তাহার বিবরণ জানা উচিত। পাতা ও অন্যান্য সবুজ অংশের ভিতর এক প্রকার শত সহস্র অতি ক্ষুদ্র সবুজ কণা থাকে, তাহাদের নাম **ক্লরোফিল-কণা** (chlorophyll grains)। এই সবুজ কণার জন্যই পাতা ইত্যাদির রঙ সবুজ হয়। এই সবুজ কণাই বায়ুর অন্তর্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ধরিবার কল। বায়ুতে অতি অল্প পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড আছে। পাতার ত্বকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে; এই ছিদ্রকে সূক্ষ্ম রন্ধ্র বা **ষ্টোমা** (stoma) বলে। এই ছিদ্রপথ দিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড
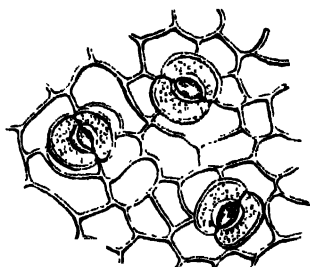
পাতার ষ্টোমা

পত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। মৃত্তিকা হইতে জল ও জলে যে সকল পদার্থ গলিয়া থাকে, সেই সকল পদার্থ মূল ও কাণ্ড বাহিয়া পাতায় উপস্থিত হয়। তথায় কার্বন ডাই-অক্সাইড, জল ও জলের অন্তর্গত গলিত পদার্থ একত্রে মিশে ও তাহাদের বিচিত্র পরিবর্তন হয়। এই বিচিত্র পরিবর্তনকে **পরিপাক কার্য** (assimilation) বলে। এই পরিপাক-কার্যের ফলে, নানা প্রকার নূতন পদার্থের উৎপত্তি হয়, আর সেই সকল পদার্থে উদ্ভিদের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়। উপরিকথিত পাতার অন্তর্গত সবুজ কণা সকল সূর্যের আলো ধরিয়া পরিপাক-কার্য সম্পন্ন করে, অর্থাৎ পাতার অন্তর্গত জল, জলে গলিত পদার্থ, ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের মিলনে উদ্ভিদের পুষ্টিকর পদার্থ প্রস্তুত হয়। আলো ভিন্ন এ কাজ সম্পন্ন হয় না, অতএব আলো উদ্ভিদের সবিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাতার কাজ, শ্বাস-প্রশ্বাস—উদ্ভিদ, ত্বকের ছিদ্র দিয়া বায়ু সংগ্রহ করে অর্থাৎ নিশ্বাস-গ্রহণ করে। এই নিশ্বাস-গ্রহণের ফলে, বায়ুর অন্তর্গত অক্সিজেন উদ্ভিদের অন্তর্গত পুষ্টিকর পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া, কার্বন ডাই-অক্সাইডের জন্ম দেয়। দিনের বেলায় সূর্যের আলোর সাহায্যে ঐ শেষোক্ত গ্যাস উদ্ভিদের মধ্যে বিশ্লেষিত হয় অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া যায় ও তজ্জন্য অক্সিজেন পৃথক হইয়া পড়ে। সেই অক্সিজেন ত্বকের ছিদ্র দিয়া বাহির হয় ও বায়ুতে আসিয়া মিশে। কিন্তু রাত্রিকালে আলোর অভাবে পরিপাক কার্য বন্ধ থাকে, কাজেই উক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড পাতা হইতে বাহির হইয়া উন্মুক্ত বায়ুতে আসিয়া মিশে। মোট কথা, দিনের বেলা উদ্ভিদ হইতে অক্সিজেন বহির্গত হয় ও রাত্রিকালে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হয়। উদ্ভিদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও পরিপাক উভয়ের প্রভেদ এই যে, নিশ্বাস-প্রশ্বাস দিন ও রাত্রে সমভাবে চলে, কিন্তু পরিপাক কার্য কেবল দিনের বেলাই চলে। কারণ নিশ্বাস-প্রশ্বাস আলোর উপর নির্ভর

করে না, অপর পক্ষে পরিপাক আলোক সাপেক্ষ ও আলোক ভিন্ন চলে না।

সবুজ ঘাসের উপর পোয়াল বা মাদুর চাপা দিয়া রাখ, দেখিবে ৪।৫ দিনের মধ্যে সবুজ ও সতেজ ঘাস নিস্তেজ ও সাদা হইয়া পড়িয়াছে।

আরও কিছুদিন এইরূপ চাপা থাকিলে শেষে ঘাস মরিয়া যায়। দেখ চাপা থাকিবার সময়ে জল, জলের অন্তর্গত গলিত পদার্থ, বায়ু ও উত্তাপের অভাব থাকে না, কিন্তু আলো না পাওয়ায় ঘাস সবুজ রঙ হারাইয়া সাদা হয় ও অবশেষে শুকাইয়া যায়। একটা গাছের পাতা খানিকটা টিনের পাত দিয়া ঢাকিয়া দাও। ৪।৫ দিনের পরে ঢাকা খুলিলে দেখিবে, পাতার ঢাকা অংশটা সাদা হইয়া গিয়াছে। ঢাকা খুলিয়া দিলে ৩।৪ দিনের মধ্যে ঐ সাদা অংশ পুনরায় সবুজ হয়। অর্থাৎ সূর্যের আলো ভিন্ন গাছের পাতার রঙ সবুজ হয় না, এবং এই সবুজ রঙ স্থায়ীও হয় না। অতএব সূর্যের আলো গাছের প্রাণস্বরূপ।

ইহা ব্যতীত পাতার আর এক কাজ আছে। ইহার রন্ধ্র দিয়া গাছের ভিতরের অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায়। ইহাকে **প্রস্বেদন** (transpiration) বলে।

কীটভোজী উদ্ভিদ—সবুজ উদ্ভিদ সকল কি প্রকারে আহার্য সংগ্রহ করে, তাহা তোমরা শিখিয়াছ। বৃক্ষাদনী ও পুরীষভোজী উদ্ভিদ সকল কি প্রকারে আহার্য সংগ্রহ করে, তাহাও তোমাদিগকে বলিয়াছি। এখন কতকগুলি উদ্ভিদের কথা বলিব, যাহারা পত্র দ্বারা কীটপতঙ্গ ধরিয়া খায়, খাদ্যের জন্য প্রায় মাটির উপর নির্ভর করে না। কীটপতঙ্গ ধরিয়া খায় বলিয়া ইহাদের নাম কীটভোজী।

ড্রসেরা (Drosera) নামক একজাতীয় কীটভোজী উদ্ভিদ অতি কৌশলে কীট ধরে। পাতার বোঁটা ও ফলক এক প্রকার দীর্ঘ কেশে পূর্ণ। প্রত্যেক কেশের মাথায় একটি করিয়া **গ্রন্থি** (gland)। এই গ্রন্থি হইতে এক প্রকার আটাল রস বাহির হয়, সূর্যের কিরণ পড়িলে ঐ রস শিশিরবিন্দুর ন্যায় চকচক করে। মাছি, মশা প্রভৃতি ছোট ছোট কীট, গ্রন্থির চকচকে শিশিরবিন্দুর ন্যায় রসে আকৃষ্ট হইয়া যেই জলপান করিবার লোভে গ্রন্থির উপরে বসে, অমনি উহাদের পা ও পাখা রসে জড়াইয়া যায়, এবং যত পলাইতে চেষ্টা করে তত আরও জড়াইয়া পড়ে। যে কেশের গ্রন্থিতে উহা জড়াইয়া পড়ে, সেই কেশ বাঁকিয়া কীটকে ক্রমে পাতার মাঝখানে আনিয়া ফেলে; আর অন্য অন্য নিকটবর্তী কেশগুলিও জানিতে পারিয়া বাঁকিয়া সেই কীটের উপর আসিয়া পড়ে ও তাহাদের গ্রন্থি হইতে রস নির্গত হইতে থাকে। পাতার ফলকও অনেক সময়ে গুটাইয়া বাটির আকার ধারণ করে। আমাদের পাকস্থলী ও অন্ত্রে যেরূপ রস নির্গত হয় ও সেই রসে আমাদের আহার্য পদার্থের পরিপাক অর্থাৎ হজম হয়, সেইরূপ উক্ত গ্রন্থি সকল হইতে যে রস বাহির হয়, সেই রসে কীট পরিপাক পাইয়া গলিয়া যায় ও উদ্ভিদ তাহাতে পুষ্ট হয় কীটের পক্ষ ও খোলা যাহা গলে না, তাহা অবশিষ্ট থাকে। এইরূপ অবশিষ্ট অংশ সকল পাতাতে প্রায় দেখা যায়। হজম শেষ হইলে, পাতা সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কেশগুলি পুনরায় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠে।
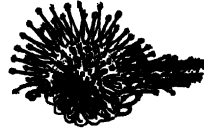
বাংলা দেশের ড্রসেরা

আসামের ড্রসেরা

গিরিডির নিকটে পরেশনাথ যাইবার রাস্তার ধারে সেঁতা পড়া বেলে-মাটিতে শীতকালে **ড্রসেরা** উদ্ভিদ (Drosera Burmanni) দেখা যায়। বর্ধমানের নিকট শাঁকটাগড় নামক ষ্টেশনের কাছে মাঠেও এই উদ্ভিদ শীতকালে জন্মে। এই ড্রসেরার পাতা লালবর্ণ, এবং যেখানে ইহা জন্মে, দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন, কেহ পানের পিক ফেলিয়া গিয়াছে। **ড্রসেরা পেলটেটা** (Drosera peltata) নামক আর এক ড্রসেরা আসামের অন্তর্গত শিলং সহরের পাহাড়ে দেখা যায়। ইহার পাতাতেও পূর্বোক্তরূপ কীট ধরিবার কৌশল আছে—পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্র দেখ।

অনেক পুকুরে গাঁজ বা দাম জন্মে। সেই সকল গাঁজের সহিত **বড় ঝাঁজি** নামক এক প্রকার উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা
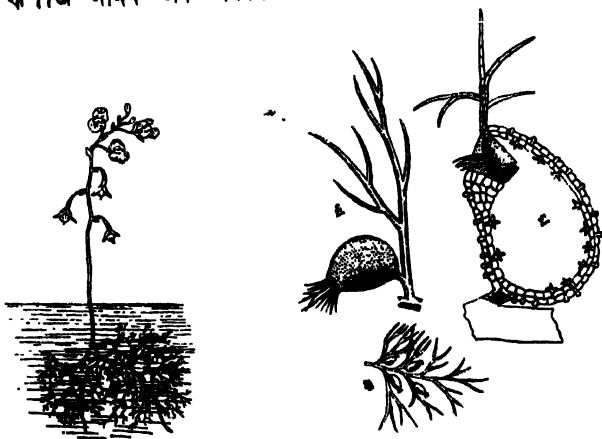
বড় ঝাঁজির স্বাভাবিক আকার

বর্ধিত আকার পুঁটুলি,
আরও বর্ধিত পুঁটুলি লম্বালম্বি চেরা

জলে ডুবিয়া থাকে, ইহার পাতা সরু সরু ও কাটা কাটা ও সেই সকল ছোট ছোট কাটা কাটা পাতার মধ্যে ছোট ছোট থলি বা পুঁটুলি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই থলির মুখে একটি কবাট আছে। ছোট

ছোট গেঁড়ি, গুগলি সেই কবাট ঠেলিয়া অনায়াসে থলির মধ্যে ঢুকে কিন্তু বাহির হইতে পারে না, কারণ ঐ কবাট আপনা হইতেই উপরদিকে উঠিয়া থলির মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। থলির ভিতরের গায়ে বহু গ্রন্থি (ঘ) আছে, সেই গ্রন্থি হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়, তাহাতে গেঁড়ি গুগলি গলে ও গলিত গেঁড়ি গুগলি উক্ত উদ্ভিদকে পোষণ করে। এই গাছের ইংরেজি নাম **ইউট্রিকিউলেরিয়া** (Utricularia)।

এইখানে এক বিদেশি কীটভোজী উদ্ভিদের কীটধরা কৌশলের কথা তোমাদিগকে বলিব। ইহার নাম **ভিনসের মাছিধরা ফাঁদ**। ইহার ফলক মধ্যশিরা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত, প্রত্যেক ভাগের উপর পিঠে তিনটি করিয়া কাঁটা। কোন কীট কাঁটা স্পর্শ করিবামাত্র,
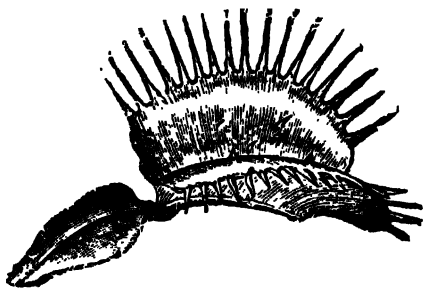
ভিনসের মাছিধরা পাতা

ফলকের দুইভাগ উপরের দিকে উঠিয়া কিনারায় কিনারায় জুড়িয়া যায় ও যেন উদর প্রস্তুত করে। কীট এই উদরে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। উক্ত কাঁটার নিকটস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি হইতে রস বহির্গত হয় ও তাহাতে কীট গলিয়া যায়। গলিত কীট ক্রমে হজম হয়। পরে ঐ পাতা আপনা-আপনি ছড়াইয়া পড়ে অর্থাৎ সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। **এলড্রোভাণ্ডা ভেসিকিউলোসা** (Aldrovanda vesiculosa) নামক এক প্রকার উদ্ভিদ ধাপার জলায় পাওয়া যায়, যাহার পাতার গঠন

অনেকটা উপরি কথিত উদ্ভিদের পাতার মত। ইহাও যে উক্ত উদ্ভিদের অনুরূপ কীটভোজী, তাহা সহজে অনুমান করা যায়।

পিচার উদ্ভিদ (Pitcher plant) নামক গাছের কোন কোন পাতা কলস অর্থাৎ কলসীর মত আকার ধারণ করে। এজন্য ইহাকে বাংলায় **কলস-উদ্ভিদ** বলিতে পার। কলসের মধ্যে রস জমিয়া থাকে। মধুলোভে
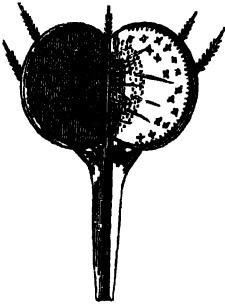
এলড্রোভাণ্ডা ভেসিকিউলোসা

পিচার উদ্ভিদ

আকৃষ্ট হইয়া কীট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণী কলসের মুখে আসিয়া বসে। কলসের মুখের নীচের অংশ এত তেলা যে, কীট-পতঙ্গ পা পিছলাইয়া কলসের মধ্যে পতিত হয় ও ডুবিয়া মরে। তৎপরে তাহারা কলসের রসে গলিয়া উদ্ভিদকে পোষণ করে।

কাণ্ডের পত্র-সজ্জা—কাণ্ড শুধু জল বহিয়া মূল হইতে পাতায় তুলে না, ইহা আপন দেহে পত্রধারণ করে এবং উহাদিগকে এরূপ কৌশলে সাজায় যে, বায়ু ও আলো তাহাদের পক্ষে সুলভ হয়। পাতাগুলি কাণ্ডের উপর নানা প্রকারে সন্নিবিষ্ট থাকে। কোন কোন গাছে প্রতি গাঁইটে পর পর একটি করিয়া আকারে সাজান থাকে। এইরূপ সজ্জাকে **পর্যায়ক্রম** বলিতে পার। ইংরেজিতে ইহাকে **অলটারনেট** (alternate) বলে। অশ্বত্থ, আম, জাম, কাঁটাল প্রভৃতি

গাছের পাতা এইরূপে সজ্জিত। পেয়ারা, গন্ধরাজ, আকন্দ প্রভৃতি গাছের কাণ্ডে, প্রতি গাঁইটে মুখোমুখী করিয়া দুইটি পাতা সজ্জিত থাকে, এইরূপ পত্র-সজ্জাকে **মুখোমুখী** সজ্জা বলিতে পার। ইংরেজিতে ইহাকে **অপোজিট** (opposite) বলে। করবী, শিমূল প্রভৃতি গাছে প্রতি গাঁইটে তিন বা ততোধিক পাতা বৃত্তের আকারে সজ্জিত থাকে, এ প্রকার পত্র-সজ্জাকে **বৃত্তাকার বা চক্রাকার** (whorled) বলে। গাঁইটস্থিত মুখোমুখী ও বৃত্তাকারে সজ্জিত পত্র পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে, এক গাঁইটের পত্রগুলি উহার ঠিক উপর ও ঠিক নীচের গাঁইটের পত্রগুলির উপর না পড়িয়া উহাদের ফাঁকে ফাঁকে পড়িয়াছে। এইরূপ পত্রসজ্জাকে **তির্যক** বলিতে পার। ইংরেজিতে ইহাকে **ডেকসেট** (decussate) বলে। এই সকল সজ্জার ফলে সকল পাতারই আলো ও বাতাস পাওয়ার সুবিধা হয়।

প্রশ্নমালা

(১) পাতা কাণ্ডের কোথায় থাকে? বৃন্ত ও বেষ্টনী কাহাকে বলে?

(২) পক্ষশির, করশির, বক্রশির ও সমান্তরালশির পত্র কাহাকে বলে?

(৩) পাতার আকার, কিনারা, অগ্রভাগ ও শিরা সম্বন্ধে যাহা জান বল।

(৪) ক্লরোফিল কণা কাহাকে বলে? ইহা গাছের কোন্ অংশে থাকে? ইহার কাজ কি?

(৫) গাছের পরিপাক-ক্রিয়া, শ্বাসকার্য ও প্রস্বেদন কাহাকে বলে, বিশদভাবে বুঝাও।

(৬) কীটভোজী উদ্ভিদ কাহাকে বলে? কয়েকটি কীটভোজী উদ্ভিদের বর্ণনা কর।

(৭) উপপত্র ও আকর্ষ বলিলে কি বুঝ? পুস্তকে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া অন্য উদাহরণ দাও।

(৮) পত্রসজ্জা কয় প্রকার? উদাহরণ দাও।

ফুল ও তাহার কার্য

যে সকল গাছপালা সচরাচর দেখিতে পাও, সে সকল গাছে একটু বয়স হইলে ফুল ধরে। সেই ফুল হইতে ক্রমে ফল হয়, ফলের ভিতর বীজ জন্মে, এবং সেই বীজ হইতে শত শত নূতন উদ্ভিদ জন্মগ্রহণ করে। অতএব উদ্ভিদের বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির জন্যই গাছে ফুল ধরে। ফুলের আলোচনা সবিশেষ আবশ্যক।

ফুলের চক্র—ধুতুরা ফুল খুব বড় এবং সকল স্থানে সহজে পাওয়া যায়। এজন্য একটা ধুতুরা ফুল যোগাড় করিয়া প্রথমে তাহারই পরীক্ষা
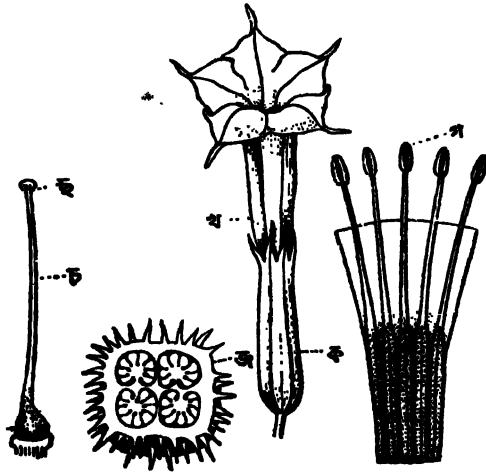
ধুতুরা ফুল

কর। দেখ, ফুলের নীচে এক সবুজ রঙের নল বা চোঙ্গ আছে (ক)। এই চোঙ্গের ভিতর সাদা রঙের এক বড় নল দেখিতে পাইবে, এই বড় সাদা

নলের মুখ তেলের কুপির ন্যায় ছড়ান (খ)। একটু কৌশলে টানিলেই এই সাদা নলটি ফুল হইতে খসিয়া পড়ে। তখন লম্বালম্বি ইহাকে একদিকে চিরিয়া ছড়াইয়া ধরিলে, উহার ভিতর গায়ে পাঁচটি দীর্ঘ কেশাকার অবয়ব লাগিয়া রহিয়াছে দেখা যায় এবং তাহাদের প্রত্যেকের মাথায় একটি করিয়া চ্যাপ্টা লম্বা থলি (গ)। এই কেশাকার অবয়বযুক্ত সাদা নলটি সাবধানে তুলিয়া ফেলিলে, আর একটি অবয়ব দেখিতে পাইবে, তাহার নীচের অংশ স্থূল অর্থাৎ ফোলা (ঘ), মাঝের অংশ সরু দীর্ঘ ও কেশাকার (চ) এবং এই কেশাকার অংশের মাথায় একটা গোল পাগড়ি (ছ) আছে।

এখন বুঝিলে ধুতুরা ফুলে নীচে হইতে সাজান পর পর চারি তবক বা চক্র। নীচের তবক বা চক্রের নাম **বৃতি** (calyx)। এই বৃতির পাঁচ ভাগ, প্রত্যেক ভাগের নাম **বৃত্যংশ** (sepal), বৃত্যংশ পাঁচটি পরস্পর জোড়া। দ্বিতীয় তবক বা চক্রের নাম **দল** বা অন্তরাবরণ (corolla), এই দলের পাঁচ ভাগ, প্রত্যেক ভাগের নাম **পাপড়ি** (petal), এই পাঁচটি পাপড়ি পরস্পর জোড়া। তৃতীয় তবক বা চক্রের নাম **পুংকেশর চক্র** (andraecium)। এই চক্রের পাঁচটি অংশ, প্রত্যেক অংশের নাম **পুংকেশর** (stamen), পুংকেশর পাঁচটি জোড়া নহে। চতুর্থ তবক বা চক্রের নাম **গর্ভকেশর চক্র** (gynaecium or pistil), এই গর্ভ-কেশরের চক্রে একটিমাত্র গর্ভকেশর (carpel)।

প্রত্যেক পুংকেশরের দুইটি অংশ, নীচের সুতার মত সরু অংশ **সূত্র** (filament) এবং এই সুতার উপরের চ্যাপটা লম্বা থলি **পরাগ-কোষ** বা **রেণুস্থলী** (anther)। পরাগ কোষের ভিতর ধূলার মত হলদে **পরাগ** বা **রেণু** (pollen) থাকে।

গর্ভকেশরের তিনটি অংশ। নীচের অংশ একটু স্ফীত—ইহাকে **গর্ভকোষ** (ovary) বলে। গর্ভকোষে এক বা ততোধিক **ডিম্বকোষ**

(ovule) আছে। গর্ভকোষের উপরে একটি নলের ন্যায় **দণ্ড** (style)। দণ্ডের উপরে একটি গোল পাগড়ি বা **মুণ্ড** (stigma)। ডিম্বকোষের ভিতর **ডিম্বক** বা **স্ত্রীজনন-কোষ** (ovum) থাকে।

মূলা, সরিষা, বেগুন, লঙ্কা, শিমূল, কৃষ্ণচূড়া, চাকুন্দা, কলমি, রক্তকম্বল, কলিকা, শিম, মটর, অড়হর, বক, আতসী, তিল, জবা, আকন্দ, শিয়ালকাঁটা প্রভৃতি ফুল পরীক্ষা করিলে, এইরূপ চারি চক্র দেখিতে পাইবে।

সরিষা ফুল পরীক্ষা করিলে দেখিবে, উহার তলায় চারি বৃত্যংশযুক্ত সবুজ বৃতি ও এই বৃত্যংশগুলি পরস্পর বিযুক্ত। বৃতির ভিতর চারিটি পাপড়িযুক্ত হলদে দল ও এই পাপড়িগুলি পরস্পর বিযুক্ত ও প্রত্যেক পাপড়ির বোঁটা আছে। তৎপরে ছয়টি পুংকেশরযুক্ত পুংকেশর-চক্র, পুংকেশরগুলি পরস্পর বিযুক্ত ও উহাদের মধ্যে চারিটি দীর্ঘ ও দুইটি খর্ব। মধ্যস্থলে গর্ভকেশরচক্র, এই চক্রে এক গর্ভকোষ, এক দণ্ড ও এক মুণ্ড। মূলা ফুলও অবিকল সরিষা ফুলের মত, কেবল ইহার দল সাদা। অধিকাংশ ফুলে বৃতি সবুজ ও দল রঞ্জিত হইয়া থাকে। তবে চাঁপা, পেঁয়াজ, রজনিগন্ধ প্রভৃতি ফুলের এই দুই চক্রই রঞ্জিত।
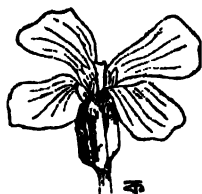
সরিষা ফুল

ফুলের বৃতি দল প্রভৃতি ফুলের পাতা সকল কাণ্ডে সন্নিবিষ্ট থাকে, এই কাণ্ড খর্ব। এই খর্ব কাণ্ডকে ইংরেজিতে **থালামস** (thalamus) বলে। বাংলায় ইহাকে **পুষ্পাধার** বলিলাম। মনে রাখিতে হইবে, সাধারণ সবুজ পাতা, আর ফুলের বৃতি ও দল প্রভৃতি পাতা, রঙে ও আকারে পৃথক হইলেও, গড়নে উহারা একই জিনিষ, অর্থাৎ পত্রযুক্ত কাণ্ডের পরিবর্তনে ফুল জন্মে।

মোটকথা এই যে, পুষ্প ও পত্রযুক্ত কাণ্ড গড়নে একই জিনিষ, কিন্তু উহাদের কার্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন, অর্থাৎ পুষ্পের কাজ বংশবৃদ্ধি, আর পত্রের কাজ গাছের বৃদ্ধি।

পুংপুষ্প, স্ত্রীপুষ্প, দ্বিলিঙ্গ ও একলিঙ্গ পুষ্প—কুমড়া, শসা, লাউ, তরমুজ, পেঁপে প্রভৃতি ফুলে তিনটি চক্র দেখিবে,—অর্থাৎ হয় বৃতি, দল ও পুংকেশরচক্র, না হয় বৃতি, দল ও গর্ভকেশরচক্র। পুংকেশর চক্র ও গর্ভকেশরচক্র এক ফুলে একত্রে দেখিবে না। যে পুষ্পে কেবল পুংকেশরচক্র থাকে, গর্ভকেশরচক্র থাকে না, তাহাকে **পুংপুষ্প** ও যে পুষ্পে কেবল গর্ভকেশরচক্র থাকে, পুংকেশরচক্র থাকে না, তাহাকে **স্ত্রীপুষ্প** বলা যায়। শসা, কুমড়া, লাউ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি উদ্ভিদে, এক গাছেই পুং ও স্ত্রী উভয় পুষ্পই থাকে। পেঁপে, পিটুলি প্রভৃতি উদ্ভিদে এক গাছে কেবল পুংপুষ্প এবং আর এক গাছে কেবল স্ত্রীপুষ্প থাকে, উভয় পুষ্পই এক গাছে থাকে না। যে পুষ্পে উভয় লিঙ্গ থাকে, তাহাকে **দ্বিলিঙ্গ** এবং যে পুষ্পে এক লিঙ্গ থাকে, তাহাকে **একলিঙ্গ** কহে।

উপবৃতি চক্র—কোন কোন ফুলে বৃতিচক্রের নীচে এক উপাঙ্গ-বৃতিচক্র থাকে, যাহাকে ইংরেজিতে **এপিকেলিক্স** (epicalyx) বলে, বাংলায় ইহাকে **উপবৃতি** বলিতে পার, যেমন জবাফুল ও কাপাস ফুল।

ব্রাকেট (bract)—অধিকাংশ ফুল ছোট সবুজ পাতার কক্ষে (axil) অবস্থিত থাকে। এই পাতাকে ব্রাকেট বলিতে পার। বাগান-বিলাস, রাঙচিতে ও লালপাতার গাছের ব্রাকেট বড় ও রঙ্গিন হয়; এই সকল গাছের ফুল ক্ষুদ্র ও প্রায় বর্ণহীন; এই রঙ্গিন বড় ব্রাকেট কীট পতঙ্গকে আকর্ষণ করে।

ফুলের মিলন (Pollination)—কীটপতঙ্গ আপন আপন আহার, মধু ও পরাগ সংগ্রহ করিবার জন্য পুষ্পে পুষ্পে উড়িয়া বেড়ায়,

আর কীটপতঙ্গের গমনাগমনে পুষ্পের উভয় কেশরের মিলন সম্পন্ন হয়। দেখ, শসা গাছে বর্ষাকালে যখন হলুদ বর্ণের ফুল ফুটে, তখন এক প্রকার লাল রঙের কীট গাছ ভরিয়া বসে এবং পুষ্প হইতে পুষ্পে উড়িয়া মধু ও পরাগ খাইয়া বেড়ায়। শসা গাছের কোন ফুলেই পুংকেশর ও গর্ভকেশর উভয় কেশর থাকে না, কোনও ফুলে কেবল পুংকেশর, কোনও ফুলে কেবল গর্ভকেশর থাকে। এরূপ স্থলে পুংকেশর হইতে পরাগ গর্ভকেশরে আনীত না হইলে, মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই। উপরে যে লালবর্ণ কীটের কথা বলিলাম, তাহারা যখন পুংকেশরযুক্ত ফুলে বসে, তখন তাহাদের গায়ে পায়ে পরাগ লাগিয়া যায়। সেই ফুল হইতে উড়িয়া যখন গর্ভকেশরযুক্ত ফুলে বসে, তখন তাহাদের গায়ে ও পায়ে-লাগা পরাগ শেষোক্ত ফুলের গর্ভকেশরে লাগিয়া যায়। এইরূপে শসা ফুলের মিলন হইয়া থাকে। এরূপ না হইলে আদৌ তাহাদের মিলন হইত না। যে সকল ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশর উভয়ই থাকে, সে সকল ফুলে পুংকেশর ও গর্ভকেশরের পরস্পর মিলন, কীটের সাহায্য বিনা হওয়াই সম্ভব বলিয়া আপাতত বোধ হয়। কিন্তু সে সকল ফুলেও নানা কারণে মিলন প্রায়ই আপনা আপনি ঘটে না। কারণ সে সকল ফুলের মধ্যে অনেক ফুল আছে, যাহাদের উভয় কেশর এক সময়ে পাকে না, অথবা যাহাদের উভয় কেশর এরূপভাবে সাজান যে, একের সহিত অপরের আপনা-আপনি মিলন হওয়া একেবারে অসম্ভব। পিঙ্ক ফুলে পুংকেশর পাকিয়া ঝরিয়া পড়িলে পর গর্ভকেশর পাকে; চিতা, রাঙচিতা (Pedilanthus) ও কচুফুলে গর্ভকেশর পাকিয়া শুকাইলে পর, পুংকেশর পাকে। অনেক অর্কিড ফুলে পুংকেশরের রেণুস্থলী ও গর্ভকেশরের মুণ্ড এমনভাবে সাজান যে, উভয়ের মিলন কখন আপনা-আপনি হইতে পারে না। এ সকল স্থলে মিলনের জন্য বাহ্য সাহায্য আবশ্যক। কীট-পতঙ্গ

মধু ও পরাগের লোভে ঐ সকল ফুলে গমনাগমন করে ও সেই সঙ্গে এক ফুলের পরাগ তাহাদের গায়ে লাগিয়া অন্য ফুলের মুণ্ডে আনীত হয়। এইরূপে এই সকল ফুলের মিলন হইয়া থাকে।

যে সকল গাছে বড় লাল টকটকে ফুল হয়, সে সকল গাছে কাক শালিক প্রভৃতি পাখিও দলে দলে আসিয়া বসে এবং কাঠ-বিড়ালীও পালে-পালে উঠা-নামা করে, আর যে সময়ে ফুল ফুটে সে সময়ে গাছের পাতা প্রায় ঝরিয়া পড়ে; সেজন্য লাল টকটকে ফুলের রাশি বহুদূর হইতে দেখা যায়। সেই টকটকে ফুলের রঙ দেখিয়া উক্ত পাখি সকল ও কাঠ-বিড়ালী ঐ সকল গাছে যাতায়াত করে ও তাহাদের সাহায্যে উভয় কেশরের মিলন হয়। পালতেমাদার, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, শিমূল প্রভৃতি ফুল এ পক্ষে উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

মৌমাছি, প্রজাপতি ও পিপীলিকা, মিলন কাজের প্রধান সহকারী বটে, কিন্তু ইহারা আপন-আপন গড়ন অনুসারে আপনার উপযুক্ত ফুল বাছিয়া লয়। পিপীলিকা ক্ষুদ্র, ইহারা যে ফুলে সহজে প্রবেশ করিতে পারে, মৌমাছি সে ফুলে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রজাপতির শুঁড় লম্বা, মৌমাছির শুঁড় অপেক্ষাকৃত ছোট, কাজেই যে ফুলে মধু নলাকার পাপড়ির খুব নীচে থাকে, সে ফুলে মৌমাছি শুঁড় ঢুকাইয়া মধু সংগ্রহ করিতে পারে না, কিন্তু প্রজাপতি পারে। কোন ফুলের পাপড়ির এরূপ গড়ন যে, প্রজাপতি সে ফুলে পাখা লইয়া বসিতে পারে না, অথচ মৌমাছি পারে। অন্য ফুলের পাপড়ির গড়ন প্রজাপতির অনুকূল, কিন্তু মৌমাছির প্রতিকূল। অতএব ফুলের রঙ ও গড়ন এবং কীট-পতঙ্গের গড়ন ও প্রকৃতি উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়। এমন কি কীট-পতঙ্গের গড়ন ও প্রকৃতি অনুসারে পুষ্পের গড়ন, রঙ ও গন্ধ প্রভৃতি উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ফল কথা এই দাঁড়াইতেছে, কীট-পতঙ্গ ফুলের উপকারী এবং ফুল কীট-পতঙ্গের উপকারী।

বায়ুর সাহায্যে যে সকল উদ্ভিদের মিলন হয়, তাহাদের পুষ্পের গড়ন ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাহাদের ফুল ক্ষুদ্র, অনুজ্জ্বল ও মধুহীন। তাহাদের বহু পরিমাণে পরাগ জন্মে, কারণ বায়ুতে ভাসিয়া যাইবার সময় বৃষ্টিতে বা বায়ুর স্রোতে অনেক পরাগ কোথায় গিয়া পড়ে ও নষ্ট হয়, তাহার ঠিকানা নাই। তা ছাড়া ইহাদের পরাগ খুব হালকা, শুষ্ক ও আটাহীন, সেজন্য বায়ুতে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাসিতে থাকে। ইহাদের মুণ্ড প্রায় বড় ও শাখাযুক্ত—যেমন রেড়ীর ফুল ও ধান প্রভৃতি ঘাসের ফুল। বায়ুর সাহায্যে যে সকল গাছের মিলন হয়, সে সকল গাছের মিলনের সময় পাতা প্রায় ঝরিয়া পড়ে, তাহাতে উভয় কেশরের অবাধে মিলন হয়, যেমন শিমূল, বড় কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি। আম, আমড়া, লিচু, জাম, জামরুল, দেশি বাদাম প্রতি গাছের ফুল প্রায়ই বায়ুর সাহায্যে মিলিত হয়।

যে সকল গাছ জলে জন্মে, তাহাদের ফুলের মিলন প্রায়ই জলের সাহায্যে হইয়া থাকে। এই সকল গাছের মধ্যে পাটা শেওলা

ক পাটা শেওলা খ
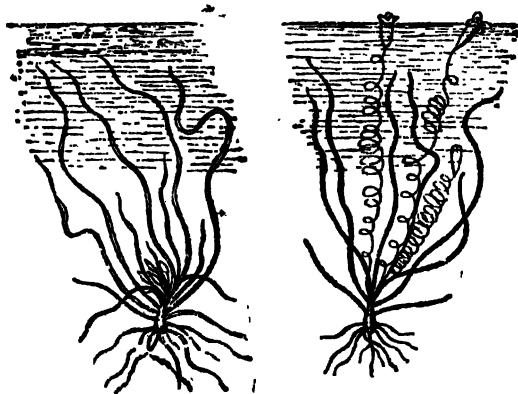
(Vallisnaria spiralis) গাছের মিলন অতি বিচিত্র। ইহার গোছা-বাঁধা মূল পুকুরের পাঁকে পোঁতা থাকে। মূলের উপরিস্থ ক্ষুদ্র কাণ্ড

হইতে পাতার গোছা বাহির হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে। পাতা সকল তিন চারি হাত দীর্ঘ ও প্রায় আধ আঙ্গুল চওড়া। পাতার গোছার মধ্যে মাটির কাছে ফুল ধরে। এক গাছে কেবল স্ত্রীপুষ্প (খ), আর এক গাছে কেবল পুংপুষ্প (ক)। পুংপুষ্পের বোঁটা নাই, স্ত্রীপুষ্পের দীর্ঘ বোঁটা। স্ত্রীপুষ্পের এই বোঁটা ইস্ক্রুপের মত পাক খাইয়া ফুলকে জলের তলায় রাখিয়া দেয়। মিলনের সময় উপস্থিত হইলে, স্ত্রী-পুষ্পের বোঁটার পাক খুলিয়া যায় ও ঐ পুষ্প তজ্জন্য জলের উপর ভাসিয়া উঠে। ঠিক সেই সময়ে বৃন্তহীন পুংপুষ্প গাছ হইতে পৃথক হইয়া জলের উপরে ভাসিয়া উঠে। তখন জলের উপর পুংপুষ্প ও স্ত্রীপুষ্প উভয়ের মিলন হয়। মিলনের পর স্ত্রীপুষ্পের বোঁটা পুনরায় পাক খাইয়া ফুলকে জলের তলায় লইয়া যায়। তথায় ঐ পুষ্পের বীজকোষ পাকিয়া ফলাকার ধারণ করে ও বীজ পাকিয়া যথা সময়ে নূতন গাছের জন্ম দেয়। অনেক পুকুরে পাটা শেওলা জন্মে। ইহার পাতা কাটিয়া লোকে ঝুড়িতে গুড় রাখিয়া তাহার উপর ঐ পাতা চাপা দেয়। ইহার ফলে, তিন চারি দিন মধ্যে গুড় পরিষ্কৃত হইয়া চিনি হয়। এই চিনির ডাক নাম "দোলো"।

প্রশ্নমালা

(১) ফুল উদ্ভিদের কি কাজ করে ?

(২) সরিষা ফুলের চিত্র অবলম্বন করিয়া ফুলের চারি চক্রের বর্ণনা কর।

(৩) পুংকেশর ও গর্ভকেশরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের নাম কর ও চিত্র দিয়া বুঝাইয়া দাও। পুষ্পের আধার কাহাকে বলে ?

(৪) পুং-পুষ্প, স্ত্রী-পুষ্প কাহাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

(৫) কীটপতঙ্গের সাহায্যে ফুলের মিলন কিরূপে হয়, বিস্তৃতভাবে বর্ণনা কর। কীটপতঙ্গ সাহায্যে মিলিত ও বায়ু সাহায্যে মিলিত পুষ্পের প্রভেদ কি ?

(৬) পাটাশেওলা পুষ্পের মিলন বর্ণনা কর।

অষ্টম অধ্যায়

ফলের কথা

ফলের উৎপত্তি ও গড়ন—তোমরা শিখিয়াছ যে, পুংকেশরের রেণুস্থলী বা পরাগস্থলী হইতে পরাগ বাহির হইয়া গর্ভকেশরের মুণ্ডের উপর পড়ে ও তথা হইতে পরাগ ক্রমে গর্ভকোষস্থ ডিম্বকের সহিত মিলিত হয় এবং এই মিলনের ফলে ডিম্বক বীজে পরিণত হয়। উপরি কথিত মিলনের পর, বীজকোষের মধ্যে বীজ উৎপন্ন হইয়া বাড়িতে থাকে ও সেই সঙ্গে বীজকোষও বড় হইয়া ফলাকার ধারণ করিতে থাকে। উক্ত মিলন না ঘটিলে, বীজকোষে প্রায় বীজ জন্মে না, আর বীজকোষও বড় হইয়া ফলাকার ধারণ করে না।

আম জাম খেজুর পেঁপে পেয়ারা তাল নারিকেল সুপারি বাদাম পেস্তা আকরোট কলাইশুঁটি বরবটি সরিষা প্রভৃতি ফল পরীক্ষা করিয়া দেখ। আম, জাম, নারিকেল ইত্যাদি ফল কঠিন অথবা রসাল ও পাকিলে ফাটে না। **কলাইশুঁটি, বরবটি** প্রভৃতি ফল পাকিলে ফাটিয়া যায় ও বীজ ঝরিয়া পড়ে। রসাল ও কঠিন ফল পাকিলেও ফাটে না, বীজও আপনা আপনি ঝরিয়া পড়ে না। ফল অর্থাৎ পরিপক্ক বীজকোষ স্থূল বা মোটা হইলে, তাহার খোসায় প্রায় তিন তবক লক্ষিত হয়—বাহিরে এক তবক (epi-carp), মাঝে এক তবক (meso-carp) ও ভিতরে এক তবক (endo-carp)। দেখ পাকা **আম** খাইবার সময় আমরা যে

কলাইশুঁটি ফল ফাটিয়া দুই ভাগ হইয়াছে

খোসা ফেলিয়া দি, তাহা বাহিরের তবক (ক); যে অংশ খাই, তাহা মাঝের তবক (খ); এবং যে আঁটি ফেলিয়া দি, তাহা ভিতরের তবক (গ)। এই ভিতরের তবক বা আঁটিকে ইংরেজিতে **ষ্টোন** (stone) বলে। আঁটি লম্বালম্বি চিরিলে উহার ভিতরে কশি দেখা যায়, উহাই বীজ (ঘ)। পাকা **খেজুরে** খোসার বাহিরের তবক চকচকে ও ঘোর লাল; এই তবকের পর দ্বিতীয় তবক, যাহা আমরা খাই; এই তবক চুষিয়া খাইলে যে পাতলা সাদা পর্দা বাহির হয়, তাহা তৃতীয় তবক। তাহার ভিতরে কঠিন বীজ, যাহাকে আমরা খেজুর আঁটি বলি। দেখ আমের আঁটি ও খেজুরের আঁটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। আমের আঁটি বীজকোষের খোলার তৃতীয় তবক, আর খেজুরের আঁটি প্রকৃত বীজ। এইরূপ **নারিকেলের** ছোবড়া, বাহিরের ও মাঝের তবকের মিলনে প্রস্তুত, ছোবড়া ফেলিয়া দিলে যে কঠিন খোল বাহির হয়, তাহা তৃতীয় তবক। এই তবক হইতে হুঁকার খোল প্রস্তুত হয়। এই খোলের ভিতর ফাঁপা সাদা জলভরা বীজ। বীজের সাদা অংশ যাহা আমরা খাই, তাহা বীজান্তর্গত সার।

লম্বালম্বি চেরা আম

ফুলের শিষ হইতে এক ফল—উপরে যে সকল ফলের বর্ণনা করিলাম, উহাদের সকলগুলিই এক একটি ফুল হইতে উৎপন্ন। কিন্তু কাঁটাল, আনারস, ডুমুর, অশ্বত্থ ও বট প্রভৃতি ফলের গড়ন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনেক গাছে ফুলের শিষ হয় ও ফুলের শিষের মাঝে একটা দণ্ড বা শির থাকে এবং বহু ফুল ঐ শিরে সজ্জিত থাকে, যেমন সোঁদাল

কাঁটানটে, পালঙ প্রভৃতি ফুলের শিষ। **কাঁটালের** মুচি যাহা বাড়িয়া ফল হয়, তাহা কাঁটালের ফুলের শিষ। পাকা কাঁটাল ভাঙ্গিলে মধ্যস্থলে যে মোটা দণ্ড বাহির হয়, তাহাই শিষের দণ্ড বা শির, আর এই শিরে যে কাঁটালের কোষ জোড়া থাকে, তাহারা এক একটি ফুলের বীজকোষ। ঐ বীজকোষ আবার পাতলা পাতলা ভুতুড়ি দিয়া বেষ্টিত। ঐ ভুতুড়িই ফুলের পাপড়ি। এক এক কোষের মধ্যে এক এক বড় বীজ। **আনারস** কাঁটালের ন্যায় ফুলের শিষ হইতে উৎপন্ন। আনারসের গায়ে বহু চৌকোনা অংশ দেখিতে পাও, উহা এক একটি ফুল হইতে উৎপন্ন। আনারস লম্বালম্বি চিরিলে মধ্যস্থলে যে কঠিন অংশ বাহির হয়, তাহা আনারসের শিষের মাঝের শির। আনারসের চৌকোনা দাগযুক্ত খোলা ছাড়াইলে যে অংশ পাওয়া যায়, তাহা ফুল সমষ্টি হইতে উৎপন্ন, এবং এই অংশই আমরা খাই। ইহার মধ্যে লালবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বীজ থাকে। **ডুমুর** ফল ঘটির আকার বিশিষ্ট ও উহার মধ্যস্থলে ঘটির ন্যায় এক গহ্বর বা কুঠারি। ঐ ঘটিটি ফুল সমষ্টির অর্থাৎ শিষের দণ্ড বা শির। ঐ শির ফাঁপা হইয়া ঘটির আকার ধারণ করে, আর ঐ ঘটির ভিতর গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্প সজ্জিত। ঐ পুষ্প সকলের এক একটি হইতে এক একটি অতি ক্ষুদ্র সরিষার মত ফল উৎপন্ন হয়। ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলগুলিকে আমরা ডুমুরের বীজ বলি, প্রকৃতপক্ষে উহারা বীজ নহে, এক একটি ফল। **অশ্বত্থ** ও **বট ফলের** গড়ন অবিকল ডুমুরের মত।
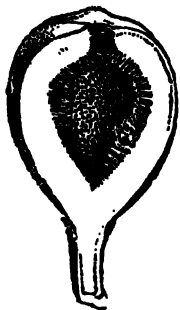
লম্বালম্বি চেরা ডুমুর ফল

বীজ হইতে উদ্ভিদের বংশরক্ষা ও বংশবৃদ্ধি হয়। কাজেই যাহাতে বীজে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, তজ্জন্য বীজ ফলের মধ্যে আবদ্ধ

থাকে। আমরা যেমন টাকাকড়ি ও মূল্যবান জিনিষ বাক্সের মধ্যে রাখি, উদ্ভিদ সেইরূপ আপন বীজ ফলরূপ বাক্সের মধ্যে রাখে, কারণ বীজ তাহাদের পক্ষে সবিশেষ মূল্যবান জিনিষ।

প্রশ্নমালা

(১) ফল কাহাকে বলে? ফলের মধ্যে বীজ উৎপন্ন হয়, কি হইলে?

(২) কোন্ ফল পাকিলে ফাটে, আর কোন ফল পাকিলেও ফাটে না, উদাহরণ দাও।

(৩) আমের খোলা যে তিনটি তবকে বিভক্ত, তাহাদের প্রকৃতি বুঝাইয়া বর্ণনা কর।

(৪) নারিকেলের খোলার তিন তবক ও বীজের বিষয় যাহা জান, লিখ।

(৫) আম, কলাইশুঁটি, ডুমুর, কাঁঠাল, আনারস ও বটফল কয়টি ফুল হইতে উৎপন্ন? ডুমুরের গঠন ও কাঁটালের গঠন চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও।

নবম অধ্যায়

বীজ ও বীজের বিস্তার

বীজের উদ্দেশ্য, উদ্ভিদের বংশ-রক্ষা ও বংশ-বিস্তার করা—এ কথা তোমাদিগকে পূর্বে বলিয়াছি। বীজ মাটিতে পড়িলে বীজের অভ্যন্তরস্থ শিশু-উদ্ভিদ হইতে চারার জন্ম হয়। এই জন্মের জন্য কতকগুলি অনুকূল বাহ্য অবস্থা আবশ্যক। বাহ্য অবস্থা যত বিভিন্ন হইবে, বীজের পক্ষে ততই মঙ্গল। কারণ উদ্ভিদের সকল বীজগুলিই যদি একস্থানে পতিত হয়, আর সেই স্থান যদি শিশু-উদ্ভিদের জন্ম ও বৃদ্ধির পক্ষে অনুপযুক্ত হয়, তাহা হইলে হয় কোন বীজই অঙ্কুরিত হয় না, অথবা যদিও অঙ্কুরিত হয়, শিশু-উদ্ভিদ বাড়িতে পারে না। এইরূপে সেই উদ্ভিদের বংশ-লোপ হয়। আরও, অনেক বীজ ও ফল এক স্থানে পড়িলে, সেই সকল বীজ ও ফলের চারা স্থানাভাবে পরস্পর মারামারি করিয়া ধ্বংস হয়। কিন্তু বীজ সকল যদি একস্থানে না পড়িয়া নানাস্থানে পড়ে, তাহা হইলে কোন বীজ অনুকূল, কোন বীজ প্রতিকূল অবস্থা পায়। কাজেই সকল বীজ না হউক, কতকগুলি বীজ উপযুক্ত অবস্থা পাইয়া অঙ্কুরিত হয় এবং বংশ-রক্ষা ও বংশ-বৃদ্ধি করে। অতএব বংশ-রক্ষা ও বংশ-বৃদ্ধির জন্য বীজের বিস্তার একান্ত বাঞ্ছনীয়। ফলের ভিতরে বীজ থাকে, কোন কোন ফল ফাটিলে বীজ ঝরিয়া পড়ে, কোন কোন ফল ফাটে না, বীজশুদ্ধ ঝরিয়া পড়ে। সেই হেতু বিস্তারের জন্য বীজে ও ফলে নানাপ্রকার কৌশল দেখা যায়। সেই সকল কৌশলের কথা তোমাদিগকে এইখানে বলিব।

বীজ বিস্তারের কৌশল—আকন্দ, করবী, মালতী, কুড়চী, অনন্তমূল, ছাগলবাটি প্রভৃতি উদ্ভিদে ক্ষুদ্র বীজের মাথায় লম্বা সাদা

কেশের গোছা দেখিতে পাইবে। এই কেশের গোছার সাহায্যে বীজ বায়ুতে ভাসিতে ভাসিতে নানা স্থানে গিয়া পড়ে। শিমুল কার্পাস প্রভৃতি গাছের বীজের সমস্ত গাত্র কেশে ভরা, সেই কেশের সাহায্যে উহারা বায়ুতে ভাসিতে ভাসিতে বহুদূরে গমন করে ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পড়ে। আমি কয়েকটি গাছের নাম করিলাম, তোমরা চারিধারে এরূপ শত শত গাছ দেখিতে পাইবে।

কুকশিমা বা কুকুর-শোঁকা, বড় কেশুত্তি, আয়াপান, গাঁধা, বন-পালঙ্গ, কুসুম, কেশে প্রভৃতি গাছে যে ছোট ছোট গোছাকরা ফল ধরে, সেই সকল ফলে কেশের গোছা অথবা পাতলা কাঁটার গোছা থাকে, তাহাদের সাহায্যে ঐ সকল ফল বায়ুতে ভাসিয়া অনেক দূরে যায়।

কুকসিমার বীজের মত ফলের গোছা

ওকড়া, আপাঙ, চোরকাঁটা বা ভাঁটুই গাছ চেন কি? ওকড়া ফলের গায়ে চটচটে কেশ ও কাঁটা আছে, গরু বাছুর বা অন্য কোন জন্তু ওকড়া বনে ঢুকিলে, ওকড়া ফল তাহাদের গায়ে ও লেজে লাগিয়া যায়,—এইরূপে ঐ সকল ফল দূরে গিয়া পড়ে। পাড়াগাঁয়ে রাস্তার ধারে প্রায়ই আপাঙ গাছ জন্মে। এই গাছে কাপড় লাগিলে, ফল গাছ হইতে খসিয়া কাপড়ে লাগিয়া যায়, কাজেই জীবজন্তুর গায়ে লাগিয়া সহজেই ইহাদের বিস্তার হয়। বর্ষাকালে পাড়াগাঁয়ে পড়া জায়গায় চোরকাঁটা বা ভাঁটুই নামে এক প্রকার ঘাস জন্মে; ইহার ফল কিরূপে কাপড়ে বিঁধিয়া যায় ও বিস্তৃত হয়, তাহা তোমরা জান। বাঘনখা গাছের ফল বাঘের নখের ন্যায়

বাঘনখা ফল

কাঁটার সাহায্যে বন্য জন্তুর গায়ে বাধিয়া যায়। এইরূপে শত শত ফল ও তাহার সহিত বীজ দেশ দেশান্তরে গিয়া পড়ে।

পক্ষযুক্ত ফল

পারুল, সোনাপাতি, টুন, মেহগিনি, ইণ্ডিয়ান-কর্ক-ওক (Indian cork oak), ইণ্ডিয়ান সাটিনউড (Indian Satin wocd), আটকপালে প্রভৃতি গাছের বীজে পাতলা ও চওড়া পাখার মত অংশ জোড়া থাকে। সাল, গর্জন, মোহর প্রভৃতি গাছের ফলেও এইরূপ পক্ষ থাকে। এই পক্ষ ফল ও বীজের বিস্তার পক্ষে সাহায্য করে। শত শত বীজ ও ফলে এইরূপ পক্ষ দেখিবে।

দোপাটি, ঝাঁটি, কুলেখাড়া প্রভৃতি উদ্ভিদের ফল পাকিলে এরূপ জোরে ফাটে যে বীজ বহুদূরে গিয়া পড়ে। এরূপ ফলও অনুসন্ধান করিলে অনেক পাইবে।

পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীর সাহায্যেও অনেক বীজ ও ফল বহুদূরে ও নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়। তোমরা বোধ হয় জান, কাক শালিক ও ময়না প্রভৃতি পাখি বট ও অশ্বত্থের ফল বড় ভালবাসে। কিন্তু ঐ সকল ফলের বীজ তাহারা হজম করিতে পারে না, তাহাদের মলের সহিত বহির্গত হয়। পাখি সকল যেখানে মলত্যাগ করে, সেইখানে ঐ সকল গাছ জন্মে। এজন্য কোটার ছাদে ও গাছে ঐ সকল গাছ জন্মিতে প্রায়ই দেখা যায়। পাখিতে খাওয়ায় ঐ সকল বীজের কোনই হানি

হয় না, বরং উহাতে বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয়। শিয়াল ও ভালুক, খেজুর কুল জাম কাঁটাল প্রভৃতি গাছের ফল ভালবাসে। এই সকল ফলের বীজ তাহাদের মলের সহিত বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। বাদুড়, ফল ও বীজের বিস্তারে সবিশেষ সাহায্য করে। বক, কাদাখোঁচা প্রভৃতি পাখি কাদায় কাদায় বেড়ায়। তাহাদের পা হইতে কাদা লইয়া রোপণ করিলে নানা প্রকার উদ্ভিদ জন্মে; তাহার মধ্যে কোন কোন উদ্ভিদ হয় ত সে স্থানের নহে, অন্য স্থানের। পশু পক্ষী সকল এই প্রকারে বীজের বিস্তার করে।

দোপাটির গোটা ফল ও ফাটা ফল

নদী ও সমুদ্র, ফল ও বীজের বিস্তার পক্ষে সাহায্য করে। যে সকল ফল ও বীজ এইরূপে বিস্তৃত হয়, তাহাদের খোলা পুরু ও কঠিন। তাহা না হইলে, ফল ও বীজের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়া উহাদের অভ্যন্তরস্থ শিশু-উদ্ভিদ নষ্ট করে। আরও এই সকল ফল ও বীজ যাহাতে জলে ভাসিয়া থাকে, তাহার নানারূপ কৌশল দেখা যায়। জলে ও জলের ধারে যে সকল গাছ জন্মে, তাহাদের ফলে ঐ সকল কৌশল সবিশেষ লক্ষিত হয়। সুন্দরবনের অনেক গাছের ফল ও বীজ এইরূপ কৌশলে গড়া। দেশি বাদাম, পুন্নাগ, আচ বা আল, ছাগলকুরি, কিয়া, নারিকেল প্রভৃতি গাছের ফল অথবা বীজের খোলা পরীক্ষা করিলে দেখিবে, উহার মধ্যে বায়ু আবদ্ধ থাকে, এমন স্থান আছে। সেইজন্য ঐ সকল ফল অথবা বীজ জলে ভাসে। ইহারা জলে ভাসিয়া বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হয়। সমুদ্রবক্ষে নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হইলে, অল্পদিন মধ্যে উহাতে নানারূপ গাছ জন্মিতে দেখা যায়। এইরূপে জলে-ভাসা অথবা বায়ুতে-ভাসা বীজ ও ফল পড়িয়া দ্বীপে গাছ উৎপাদন করে।

মনুষ্যও বীজের বিস্তার পক্ষে অনেক সাহায্য করে। বাণিজ্যের জন্য দেশ দেশান্তর হইতে নৌকা, জাহাজ ও রেলপথে আমরা কত জিনিষ আনয়ন করি, আর সেই সঙ্গে আমাদের অজ্ঞাতসারে কত প্রকার গাছের বীজ ও ফল আইসে। এইরূপে বীজের ও ফলের বিস্তার সাধিত হয়।

আজকাল জলা, নদী, খাল ও পুকুরে যে বিলাতি পানা বা কচুরি-পানার বড় উপদ্রব হইয়াছে, সেই পানার বীজ মানুষ জাহাজের সাহায্যে অল্পদিন হইল দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এদেশে আনয়ন করিয়াছে। এই অল্পদিনের মধ্যে বাংলাদেশ কচুরি পানাতে ছাইয়া গিয়াছে, বাংলার নদী ও খালে ইহার উপদ্রবে নৌকা যাতায়াত প্রায় বন্ধ।

প্রশ্নমালা

(১) বীজের ও ফলের বিস্তারের আবশ্যকতা কি? বীজ ও ফলের বিস্তারের জন্য কি কি কৌশল দেখা যায়, উদাহরণ দিয়া বর্ণনা কর।

(২) পশু-পক্ষী দ্বারা বীজ ও ফলের বিস্তার কিরূপে সাধিত হয়, উদাহরণ দিয়া বুঝাও।

(৩) দোপাটি ফলের বীজ কিরূপে বিস্তৃত হয়, ছবি দিয়া বুঝাও।

(৪) নদী ও সমুদ্র দ্বারা যে সকল ফল ও বীজ বিস্তৃত হয়, তাহাদের প্রকৃতি কিরূপ, উদাহরণ দিয়া বর্ণনা কর।

(৫) কচুরিপানা বা বিলাতি পানা, কোথা হইতে কিরূপে আনীত হইল? ইহা কি আগে এদেশে ছিল? ইহার উপদ্রবের বর্ণনা কর।

জীব-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

সাধারণ বর্ণনা

যাহাদের জীবন আছে তাহাদিগকে আমরা জীব বলিয়া থাকি। জীবরাজ্যের দুইটি বিভাগ। প্রথম উদ্ভিদ বা গাছপালা, ইহাদের অনেক কথা আগেই বলা হইয়াছে; অপরটি প্রাণী, ইহাদের কথাও তোমাদের কিছু কিছু জানা উচিত।

সমগ্র পৃথিবীর জল-স্থল আকাশ জুড়িয়া যে কত প্রাণী বিচরণ করিতেছে তাহাদের সংখ্যার ইয়ত্তা কে করিতে পারে! একই স্থানে যে আবার কত রকমের প্রাণী পাওয়া যায়, তাহাই বা কে বলিতে পারে! এক জলেই যে কত প্রকার জীব বাস করে তাহার খোঁজ-খবর কিছু জান কি? শামুক, ঝিনুক, চিংড়ি, কাঁকড়া, মাছ, কুমীর, তিমি ইত্যাদি কত রকমের প্রাণী জলে বাস করে, আবার মাছই যে কত রকমের তাহা তোমরা নিশ্চয়ই জান। সুতরাং কোন প্রাণী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে হইলে, প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ (classification) করিয়া লইতে হয়।

সাধারণত আমরা প্রাণীদিগকে মোটামুটি দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। তোমরা জান যে মাছ (রুই, কাতলা ইত্যাদি), ব্যাঙ, সরীসৃপ (সাপ, টিকটিকি, কচ্ছপ, কুমীর ইত্যাদি), পাখী (পায়রা, শালিক, কাক, চড়ুই ইত্যাদি), বাদুড়, হাতী, ঘোড়া, কুকুর, বাঁদর, মানুষ

প্রভৃতি প্রাণীদের হাড় আছে। এই হাড়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড। যে সকল প্রাণীর মেরুদণ্ড আছে, তাহাদিগকে বলা
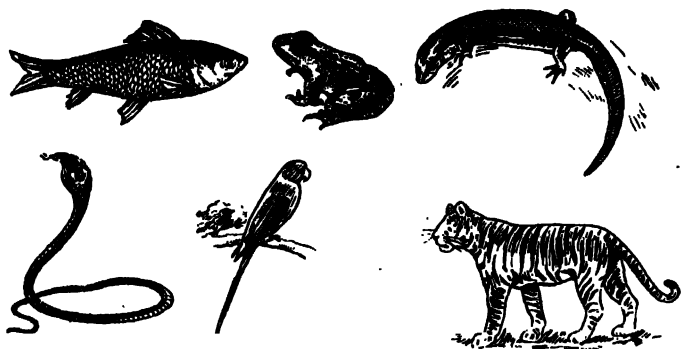
মেরুদণ্ডী প্রাণী

হয় **মেরুদণ্ডী** (vertebrate)। চিংড়ি, কাঁকড়া, মশা, মাছি, প্রজাপতি, শামুক, গুগলি, কেঁচো ইত্যাদি প্রাণীদের হাড় নাই এবং মেরুদণ্ডও
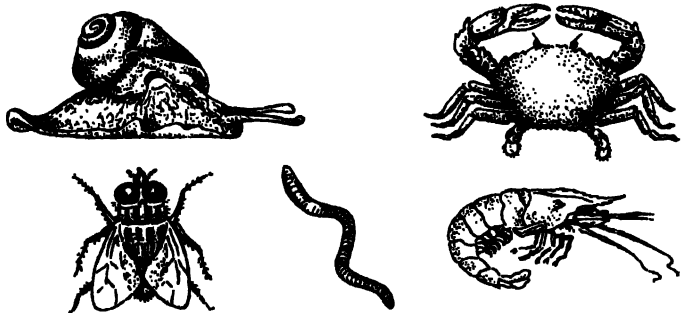
অমেরুদণ্ডী প্রাণী

নাই, সুতরাং তাহাদিগকে বলা হয় **অমেরুদণ্ডী** (invertebrate)

প্রাণী-জগতের শ্রেণীবিভাগ :—

প্রাণী
মেরুদণ্ডী বা কর্ডাটা
অমেরুদণ্ডী
মৎস
উভচর
(ব্যাঙ)
সরীসৃপ
(কুমীর)
পক্ষী
স্তন্যপায়ী
(গরু, বাঘ, বাদুড়)
প্রোটোজোয়া
(আমিবা)
সিলেনটারাটা
(হাইড্রা)
নিমাথেলমিনথিস
(সাধারণ কৃমি)
একাইনোডার্মাটা
(ষ্টার ফিশ বা তারামাছ)
মলাস্কা
(শামুক)
পরিফেরা
(স্পঞ্জ)
প্লাটিহেলমিনথিস
(লিভার ফ্লুক)
আনেলিডা
(কেঁচো, জোঁক)
আর্থ্রোপোডা
(চিংড়ি, মশা, মাছি)
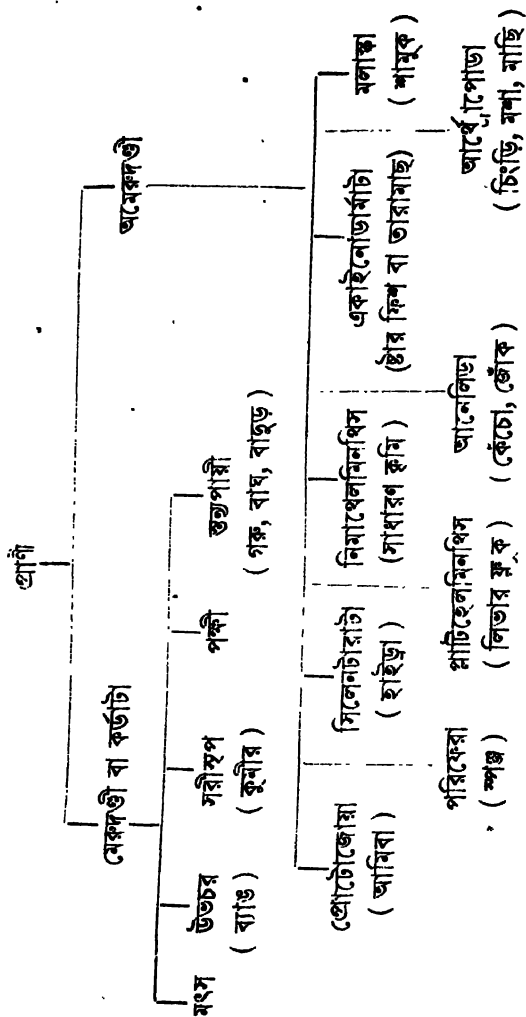
প্রথম পর্ব—প্রোটোজোয়া (Protozoa) বা আগুপ্রাণী :—

এই পর্বের সকল প্রাণী এক কোষবিশিষ্ট। অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত ইহাদিগকে দেখা যায় না। ইহাদের বেশির ভাগ জলে বাস করে এবং কতকগুলি, প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া ব্যাধি জন্মায়। ম্যালেরিয়া

আমিবা

বীজ এক প্রকার প্রোটোজোয়া, ইহা মানবের রক্তে স্থান পাইলে ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। আমিবা নামক এক প্রকার প্রোটোজোয়া মানবের খাদ্যনালিতে প্রবেশ করিয়া আমাশয় রোগ জন্মায়।

দ্বিতীয় পর্ব—পরিফেরা (Porifera) বা ছিদ্রালপ্রাণী :—

এই পর্বের প্রাণীকে সচরাচর উদ্ভিদ বলিয়া ভুল হয় এবং ইহা উদ্ভিদের ন্যায় একই স্থানে থাকে, চলাফেরা করিতে পারে না। ইহারা

স্পঞ্জ

জলে বাস করে। আমরা যে স্পঞ্জ সাধারণত ব্যবহার করি, তাহা এই প্রাণীর কঙ্কাল (skeleton)।

তৃতীয় পর্ব—সিলেনটারাটা (Cœlenterata) বা একনালি দেহী :—

সমুদ্রের জলে ইহারা বাস করে। পুকুরের জলেও হাইড্রা নামক এক প্রকার সিলেনটারাটা পাওয়া যায়। ইহাদের দেহে একটিমাত্র ছিদ্র

জেলিফিশ

আছে; সুতরাং উহা দ্বারা খাদ্যগ্রহণ ও দূষিত দ্রব্য ত্যাগ করিতে হয়। ইহাদের অনেকেরই শুঁড় (tentacle) আছে। এই শুঁড়ের দ্বারা আত্মরক্ষা করে। সমুদ্রের প্রবাল, এই প্রাণীর কঙ্কাল। উদাহরণ—হাইড্রা, জেলিফিশ ইত্যাদি।

চতুর্থ পর্ব—প্লাটিহেলমিনথিস (Platyhelminthes) বা চ্যাপ্টা কৃমি :—

ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর যকৃতে ইহারা বাস করে। সেইজন্য ইহাদিগকে লিভার-ফ্লুক (liver-fluke) বা যকৃৎ কৃমি বলে। মানুষের

লিভার-ফ্লুক

অন্ত্রেও এই শ্রেণীর এক প্রকার কৃমি বাস করে, ইহারা খুব লম্বা হয়। ইহাদিগকে ফিতাকৃমি (tape worm) বলে।

পঞ্চম পর্ব—নিমাথেলমিনথিস (Nemathelminthes) বা গোল কৃমি :—

ইহারা মানুষের অন্ত্রে বাস করে এবং দেখিতে গোল ও লম্বা।

গোল কৃমি

ইহাদের দেহের আবরণ স্বচ্ছ। গোল কৃমি প্রায় সকল ছেলের পেটে বাস করে।

ষষ্ঠ পর্ব—আনেলিডা (Annelida) বা অঙ্গুরীমাল :—

কেঁচো

ইহাদের দেহ লম্বাকৃতি এবং পরের পর সজ্জিত বহু অঙ্গুরী দিয়া গঠিত। শরীরে দুই লিঙ্গই থাকে। উদাহরণ—কেঁচো, জোঁক।

সপ্তম পর্ব—একাইনোডার্মাটা (Echinodermata) বা কণ্টকত্বক :—

এই সকল প্রাণী সমুদ্রে বাস করে এবং নানা আকার ধারণ করে। ইহাদের দেহ সাধারণত কঠিন চূণজাতীয় দ্রব্য দ্বারা আচ্ছাদিত এবং

তারামাছ

বহু কাঁটাযুক্ত। ইহারা মোটেই তাড়াতাড়ি চলাফেরা করিতে পারে না। উদাহরণ—তারামাছ।

অষ্টম পর্ব—আর্থ্রোপোডা (Arthropoda) বা সন্ধিপদ :—

সমস্ত পতঙ্গ যেমন মশা, মাছি, মৌমাছি, আরসোলা প্রভৃতি এই শ্রেণীর

চিংড়ি

অন্তর্গত। তাহা ছাড়া চিংড়ি, মাকড়সা ইত্যাদিও এই পর্বের অন্তর্গত।

নবম পর্ব—মলাস্কা (Mollusca) বা শামুক :—

শামুক, গেঁড়ি, ঝিনুক প্রভৃতি এই পর্বের অন্তর্গত। ইহাদের দেহ সাধারণত এক প্রকার কঠিন পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। উহাকে
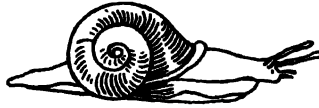
শামুক

ইংরেজিতে শেল (shell) বলে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই জলে থাকে। একজাতীয় আবার ডাঙ্গাতেও থাকে; যেমন—মাটির শামুক (land snail)।

দশম পর্ব—কর্ডাটা (Chordata) বা মেরুদণ্ডী :—
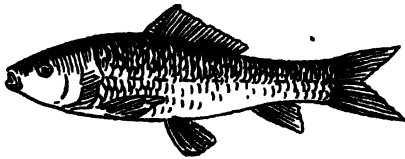
মাছ

ইহাদের শিরদাঁড়া আছে। উদাহরণ—মাছ, ব্যাঙ, কুমীর, সাপ, পাখী, বাদুড়, গরু, বাঘ, মানুষ ইত্যাদি।

প্রশ্নমালা

(১) মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী কাহাকে বলে ?

(২) প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগের বিবরণ দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সজীব পদার্থের বৈশিষ্ট্য

(Special Characteristics of the Living)

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ের দেহই এক অথবা বহু কোষে নির্মিত। প্রত্যেক কোষ **প্রোটোপ্লাজম** (protoplasm) নামক জৈব পদার্থে পূর্ণ। এই প্রোটোপ্লাজম প্রাণশক্তির আধার। উদ্ভিদ কোষের প্রোটোপ্লাজম আবরণে (cell wall) আবৃত, কিন্তু প্রাণীদিগের কোষের প্রোটোপ্লাজম ঐরূপ কোন আবরণে আবৃত নহে।

বৃদ্ধি ও পুষ্টি (growth and nutrition)—উদ্ভিদ জল, জলে গলিত মাটি ও বায়ু হইতে আপন খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে। যে সকল উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতা আছে, তাহারা মূল ও পাতার সাহায্যে খাদ্যের উপদানগুলি জল, মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে শোষণ করে। শৈবাল বা শেওলা প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদের দেহ কেবল কয়েকটি কোষের দ্বারা নির্মিত, উহাদের দেহে মূল কাণ্ড পাতা প্রভৃতি ভাগ নাই। সুতরাং তাহারা নিজেদের অখণ্ডিত সমগ্র দেহের সাহায্যে খাদ্যের উপাদানগুলি শোষণ করে। এই খাদ্য গ্রহণ করিয়া উদ্ভিদের কোষস্থিত প্রোটোপ্লাজমের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার ফলে সমগ্র উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়।

প্রাণীগণ উদ্ভিদের ন্যায় আপন আপন খাদ্যদ্রব্য নির্মাণ করিতে পারে না। উহারা উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ পদার্থ খাইয়া প্রাণধারণ করে। হরিণ, গরু, ছাগল, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি জন্তুগণ উদ্ভিজ্জ পদার্থ খাইয়া বাঁচে। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগুলি, হরিণ, গরু প্রভৃতি জন্তু আহার

করিয়া প্রাণধারণ করে। কিন্তু হরিণ, গরু প্রভৃতি জন্তু উদ্ভিজ্জ খাইয়া প্রাণধারণ করে। কাজেই সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণ আহারের জন্য পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। বস্তুত উদ্ভিদই পৃথিবীর সমুদয় প্রাণীকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে আহার জোগাইতেছে। এই আহার দ্বারা উহাদের ক্ষয়নিবারণ ও পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। নির্জীব পদার্থ আহার গ্রহণ করিতে পারে না। আহার গ্রহণ করা জীবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

গমনশক্তি (locomotion) ও **উদ্দীপনা** (stimulus)—উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে নড়াচড়া করিবার শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। চলচ্ছক্তি না থাকিলেও, উদ্ভিদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি স্থির নহে। উদ্ভিদের মূল মাটির নীচে খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য বহুদূর চলিয়া যায়। কাণ্ড আলোকের অন্বেষণে উপরদিকে সোজা বর্ধিত হয় অথবা একদিকে নুইয়া পড়ে। কোন কোন লতা পাতার সাহায্যে আলো ধরিবার জন্য অন্য বৃক্ষে বা আশ্রয়ে আরোহণ করে। কতকগুলি লতা আকর্ষ দ্বারা কোন আশ্রয়কে আঁকড়াইয়া ধরে। লজ্জাবতী গাছের পাতা স্পর্শ করিলেই বুজিয়া যায় ও নুইয়া পড়ে। কালকাসুন্দা, চাকুন্দা, সোঁদাল, কৃষ্ণচূড়া, তেঁতুল প্রভৃতি গাছের পাতা অন্ধকারে গুটাইয়া পড়ে এবং আলোতে পুনরায় খুলিয়া যায়। কতকগুলি ফুল দিনের আলোতে ফোটে এবং অন্ধকারে মুদ্রিত হয়। আবার কতকগুলি রাত্রে ফোটে ও দিনের আলোতে বুজিয়া থাকে।

এই সব দৃষ্টান্ত ছাড়া উদ্ভিদের কোষস্থিত প্রোটোপ্লাজমের আবর্তন গতি ও প্রবাহগতি দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিদদিগের এইরূপ নড়াচড়া ও চাঞ্চল্য স্বেচ্ছাকৃত ও প্ররোচিত উভয় প্রকারের হইতে পারে। প্ররোচিত গতিগুলি বাহির হইতে মাধ্যাকর্ষণ, আলো, রাসায়নিক পদার্থ, জল, বায়ু ও তাপের **উদ্দীপনায়** (stimulus) সম্পাদিত হয়।

প্রাণীগণ আহার অন্বেষণ ও অন্যান্য কারণে নানা স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে। অধিকাংশ প্রাণী সম্বন্ধে ইহা সত্য। কিন্তু স্পঞ্জ (sponge) ও প্রবাল (coral) নামক প্রাণী উদ্ভিদের মত একস্থানে আবদ্ধ থাকে। প্রাণী হইলেও ইহারা অচল, বাহ্যিক গতিশীলতাহীন।

নির্জীব পদার্থের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত গতি নাই। বায়ুর দ্বারা ধূলি উৎক্ষিপ্ত হয় বটে, কিন্তু উহা ধূলির স্বেচ্ছাকৃত গতি নহে।

শ্বাস-প্রশ্বাস (respiration) :—জীবমাত্রেরই শ্বাস-প্রশ্বাস আছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী কাহারও মধ্যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহস্থিত প্রোটোপ্লাজম বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া থাকে। এই অক্সিজেন প্রোটোপ্লাজমের সহিত মিলিত হয় ও তাহার ফলে প্রোটোপ্লাজম বিশ্লেষিত হইয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও তাপ উৎপন্ন হয়। এই বিশ্লেষণের ফলে প্রোটোপ্লাজমে যে শক্তি আবদ্ধ ছিল, তাহা বিমুক্ত হয়। এই আবদ্ধ শক্তির কিয়দংশ তাপের আকারে বাহির হইয়া যায় এবং কতকটা প্রোটোপ্লাজমের নানা কার্যে নিয়োজিত হয়। এই সমুদয় কার্য্যের নাম শ্বাস-প্রশ্বাস। মূলত, বাহির হইতে অক্সিজেন গ্রহণ এবং শরীর হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-বিমোচনকে শ্বাস-প্রশ্বাস বলা হইয়া থাকে।

মৎস্যগণ ফুলকা দ্বারা জলে মিশ্রিত বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। কুমীর কচ্ছপ প্রভৃতি জলচর জন্তু, সরীসৃপ পশুপক্ষী প্রভৃতি স্থলচর জন্তু, মুক্ত-বাতাস হইতে ফুসফুস দ্বারা অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। কেঁচো শরীরস্থ চর্মের ছিদ্র দ্বারা অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে।

উদ্ভিদদিগের ফুসফুস অথবা ফুলকা নাই, কিন্তু তথাপি উহারা বায়ু হইতে অক্সিজেন শোষণ করে ও শরীর হইতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে। জলবাসী উদ্ভিদ জলে মিশ্রিত বায়ু হইতে অক্সিজেন

গ্রহণ করে ও জলের ভিতর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। উদ্ভিদ-দেহের সকল অংশেই শ্বাস-প্রশ্বাস কাজ হয়। কেবল কোন কোন অংশে শ্বাস-প্রশ্বাস বেশি হইয়া থাকে। পাতা, ফুল, কাণ্ড ও মূলের অগ্রভাগ এবং যে অংশ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে, এইরূপ অংশেই শ্বাস-প্রশ্বাস বেশি হইয়া থাকে।

এই শ্বাস-প্রশ্বাস সজীবতার একটি প্রধান লক্ষণ। ইহা দিবারাত্র সকল সময়েই অবিরাম গতিতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। মৃত বা নির্জীব পদার্থে ইহা দেখা যায় না।

প্রজনন ও মৃত্যু (propagation and death) :—জীবমাত্রই যত কাল সম্ভব বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করে। এইরূপ চেষ্টা উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে সর্বত্র দেখা যায়, কিন্তু অবশেষে জীবমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত। উদ্ভিদ ও প্রাণী হইতে সদৃশ উদ্ভিদ ও সদৃশ প্রাণীর সৃষ্টি হইয়া থাকে।

কতকগুলি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর শরীর বিভক্ত হইয়া বা শরীরের অংশ বিশেষ বিচ্যুত হইয়া, নূতন সন্তানের সৃষ্টি করে। ইহার নাম **অযৌন প্রজনন** (asexual propagation)। অধিকাংশ উদ্ভিদ ও প্রাণীর একটি পুংকোষ ও একটি স্ত্রীকোষ বা ডিম্বের মিলন দ্বারা নূতন সন্তানের সৃষ্টি হয়। ইহাকে **যৌন প্রজনন** বলে (sexual propagation)। কোন কোন উদ্ভিদ ও প্রাণীর স্ত্রীকোষ বা ডিম্ব পুংকোষের সহিত মিলিত না হইয়াও নূতন সন্তান সৃষ্টি করে। ইহাকে **উদ্ভট প্রজনন** (parthenogenesis) বলে। উদ্ভিদ ও প্রাণীদিগের মধ্যে এইরূপ নানা প্রকার প্রণালীতে বংশধরগণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। নির্জীব পদার্থের মধ্যে প্রজনন-শক্তি নাই।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত অভিযোজন (adaptation to environments)—উদ্ভিদ ও প্রাণীদিগের মধ্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া জীবনধারণ করিবার ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া

যায়। তাহাদের দেহের গঠন ও বৈচিত্র্য; জল বায়ু ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অবস্থার দ্বারা বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়া থাকে। যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সংগতি রক্ষা করিতে পারে না, তাহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

যে-সব উদ্ভিদ ও প্রাণী জলে বাস করে, তাহাদের জলে বাস করিবার বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়। যাহারা স্থলে বাস করে, তাহাদের স্থলে বাস করিবার উপযোগী হইতে হয়। জলবাসী-উদ্ভিদগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, উহারা শরীরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বায়ু আবদ্ধ করিয়া রাখে। আবার এই সকল জলবাসী-উদ্ভিদের পাতার রন্ধ্র (stoma) পাতার নীচের ত্বকে না থাকিয়া উপরের ত্বকে থাকে। ইহাতে উহাদের ভাসিয়া থাকিতে সুবিধা হয়। মৎস্যের উদরে একটি বায়ুপূর্ণ থলি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা সন্তরণ ও ভাসমান কার্যে সাহায্য করে।

স্থলবাসী উদ্ভিদগুলি বায়ুমণ্ডলে ডুবিয়া আছে। সুতরাং উহাদের সাধারণত শরীরের মধ্যে বায়ু আবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই।

মরুভূমিতে গাছ সচরাচর ছোট হয়। তাহাদের হয় পাতা থাকে না, না হয় পাতা খুব ছোট ও পুরু হয়, না হয় পাতা কাঁটায় পরিণত হয়। আর এক কথা, মরুভূমিতে বৃষ্টি প্রায় হয় না এবং যখন হয়, ২।১ দিনের মধ্যে মরুভূমির উদ্ভিদের ফুল দেখা দেয় এবং ৬।৭ দিনের মধ্যে ঐ ফুল ফলে পরিণত হইয়া বীজ উৎপাদন করে। শীতপ্রধান দেশের উদ্ভিদ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায় নহে। যে স্থানের উদ্ভিদ হউক না কেন, তাহারা পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী জীবন-যাপন করে।

পারিপার্শ্বিক অভিযোজনের উদাহরণ সমুদ্রগর্ভের প্রাণীদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। সমুদ্রের হাজার হাজার ফুট নীচেও প্রাণীরা বাস করে।

তাহাদের চোখ নাই, কিন্তু চোখের পরিবর্তে শুঙ্গ আছে এবং এই শুঙ্গ দ্বারা পথ এবং শিকার চিনিয়া লয়।

আবার কতকগুলি সামুদ্রিক প্রাণী ঘোর অন্ধকারে বাস করে, তাহাদের মাথার উপর হইতে আলোক বাহির হয় এবং সেই আলোক সাহায্যে তাহারা পথ ও শিকার চিনিতে পারে।

সুন্দরবনে এক রকম বড় গাছের জঙ্গল আছে, যাহাদের ফল গাছ হইতে মাটিতে পড়ে না, কারণ মাটিতে পড়িলে নোনা জলে নষ্ট হইয়া যায়। গাছে থাকিতে থাকিতে ফলের অভ্যন্তরস্থ বীজ কলাইয়া ছোট উদ্ভিদে পরিণত হয়। এই ছোট উদ্ভিদের মূল লম্বা ও স্থচ-মুখ। ক্রমে এই ছোট উদ্ভিদ গাছ হইতে খসিয়া পড়ে ও স্থচ-মুখ মূল দ্বারা মাটিতে পুঁতিয়া যায় ও বড় হইতে থাকে। এই গাছের নাম **ম্যানগ্রোভ** (Mangrove)। এইরূপে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল উৎপন্ন হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কিরূপে উদ্ভিদের অঙ্গাবলির পরিবর্তন হয়, এই গাছ তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
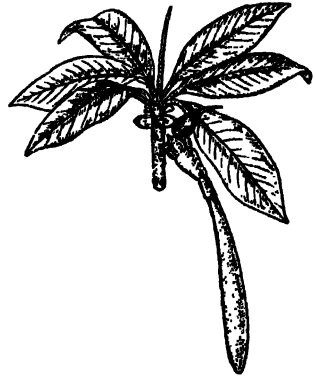
ম্যানগ্রোভ

তোমরা **কিয়াগাছ** অনেকে দেখিয়াছ। ইহার কাণ্ডের নীচের দিকের গাত্র হইতে কতকগুলি অস্থানিক মূল বাহির হইয়া মাটিতে প্রবেশ করে। এই মূলসকলেব ঠেশে ঐ উদ্ভিদ দাঁড়াইয়া থাকে নচেৎ মাটিতে শুইয়া পড়িত। এজন্য এই মূলের নাম **ঠেশমূল** (stilted-root—১৩শ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। এই গাছ পারিপার্শ্বিক অভিযোজনের সুন্দর দৃষ্টান্ত।

উদ্ভিদ ও প্রাণী আত্মরক্ষা ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে। দেখ, গো মহিষ শিঙ দিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে, হরিণকে তাড়া করিলে সে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, কুকুরকে মারিতে গেলে সে কামড়াইতে আইসে, বিড়াল থাবা দিয়া আঁচড়াইয়া দেয়, অশ্বকে বিরক্ত করিলে সে পায়ের চাট মারে, কাক শালিকের বাসা হইতে বাচ্ছা পাড়িতে গেলে কাক ও শালিক মাথায় ঠোকর মারে, চিল নখ দিয়া চিরিয়া দেয়। এইরূপে প্রাণীগণ শিঙ দাঁত পা নখ থাবা ঠোঁট প্রভৃতি দিয়া আপনাদিগকে বাঁচাইতে চেষ্টা করে।

উদ্ভিদেও এইরূপ আপনাকে বাঁচাইবার অনেক কৌশল দেখা যায়। দেখ, শিয়ালকাঁটা, কাঁটানটে, বাবলা, বেল, গোলাপ, নাটা, মনসা, কণ্টিকারী, পাণি-আমড়া, ফণিমনসা প্রভৃতি গাছ কাঁটা দিয়া আপন-আপন প্রাণ বাঁচায়। গরু বাছুর মানুষ কাঁটার ভয়ে তাহাদের নিকট যায় না। কুকশিমা বা কুকুর-শোঁকা, গাঁধাল, তুলসী, পুদিনা, ধনে প্রভৃতি গাছে যেরূপ গন্ধ, তাহাতে কোন প্রাণী তাহাদের কাছেও যায় না। নিম, পটোল, উচ্ছে প্রভৃতি গাছের পাতা ও ডাঁটা এরূপ তিক্ত যে কোন প্রাণী তাহাদিগকে স্পর্শও করে না। লাল ভেরেণ্ডা, রাঙচিতা, সিজু, মনসা, আকন্দ প্রভৃতি গাছের পাতা ও ডাল ভাঙ্গিলে দুধ অথবা জলের মত বিষাক্ত রস বাহির হয়; তজ্জন্য গরু বাছুর সে সকল গাছের কাছেও যায় না। লতা-বিছুটি, লাল-বিছুটি, আলকুশী প্রভৃতি গাছের পাতা ডাঁটা ও ফল এরূপ প্রদাহকর বিষাক্ত সূচল কেশে ঢাকা যে, গরু বাছুর ও মানুষ তাহা দেখিলে ভয় পায়। ওল কচু মান প্রভৃতি গাছের পাতা খাইলে গলা কুটকুট করে, কাজেই উহারা জীবজন্তুর মুখ হইতে বাঁচে। অনেক গাছের নিজের কাঁটা বা অন্য কোন প্রকার আত্মরক্ষার উপায় নাই, তাহারা কাঁটা গাছের ও অন্যান্য গাছের তলায় জন্মে ও এইরূপে আত্মরক্ষা করে। কামিনী

গাছের পাতায় দুর্গন্ধ বলিয়া গরু বাছুর তাহার কাছে যায় না। কথবেলের গাছ ছোট বেলায় দেখিতে অনেকটা কামিনীর মত, সেইজন্য ছোট বেলায় কথবেলের গাছ কামিনীর অনুকরণ করিয়া গরু বাছুরের মুখ হইতে রক্ষা পায়।

প্রাণিগণ আরও নানা উপায়ে আত্মরক্ষা ও স্বার্থসিদ্ধি করে। কোন জাতীয় প্রাণী হুল, দুর্গন্ধ, বিষাক্ত রস, তীব্র আস্বাদন, কঠিন আবরণ, রঙ প্রভৃতির সাহায্যে আত্মরক্ষা করে; সেই স্থানের অন্য কোন জাতীয় প্রাণী, যাহার আত্মরক্ষার সেরূপ কোন উপায় নাই এবং যাহার সহিত প্রথমোক্ত প্রাণীর জাতিগত কোন সাদৃশ্য ও সম্পর্ক নাই, সেই জাতীয় প্রাণী প্রথমোক্ত প্রাণীর বাহিক চেহারা ও রঙের অনুকরণ করিয়া আপনাকে শত্রুর হস্ত হইতে বাঁচায়। দেখ, কোন প্রাণী পাতার আকার, অথবা ডালের আকার, অথবা ফুলের আকার অনুকরণ করিয়া আপনাকে বাঁচায়। কীট-পতঙ্গ মধ্যে এরূপ অনুকরণ সচরাচর দেখা যায়। পাশের চিত্রে

দেখ পোকা (ক) কিরূপে ঠিক ডালের মত হইয়া গাছে লাগিয়া রহিয়াছে, আর উহার রঙও ডালের মত। পর পৃষ্ঠায় চিত্রে দেখ এক পোকা (ক) গাছে লাগিয়া ফুলের মত বলিয়া রহিয়াছে; কে বলিবে ইহা ফুল নহে, পোকা। এইরূপে ইহারা পাখী প্রভৃতিদের মুখ হইতে আত্মরক্ষা করে, অর্থাৎ পাখীরা ডাল পাতা অথবা ফুল মনে করিয়া

তাহাদের নিকটে যায় না। অনুকরণ সাহায্যে আত্মরক্ষা ও স্বার্থ-সিদ্ধির কৌশল প্রাণিগণ মধ্যে অনেক দেখা যায়।

প্রাণী জলবাসী বা স্থলবাসী হউক, উপযুক্ত অঙ্গবিশেষ না পাইলে বাঁচিতে পারে না। মৎস্যের মধ্যে শ্বাসকার্য্যের জন্য ফুলকা দেখা যায়, কিন্তু এই ফুলকা কেবলমাত্র জলবাসী প্রাণীরই উপযুক্ত। কারণ মাছকে জল হইতে ডাঙ্গায় তুলিলে বেশিক্ষণ বাঁচে না। ব্যাঙের প্রথম অবস্থায় ফুলকা দেখা যায় অর্থাৎ ব্যাঙাচির ফুলকা থাকে, কারণ জল ছাড়া ইহার গতি নাই। কিন্তু ব্যাঙ জল ত্যাগ করিয়া, ডাঙ্গায় উঠিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার ফুসফুস গজায়।

পাখীরা আকাশে উড়ে। ইহাদের দেহ উড়িবার উপযোগী করিয়া গড়া। পাখীদের হাড়গুলি ফাঁপা, উড়িবার জন্য ডানা আছে এবং ডানার পেশীগুলি শরীরের সমস্ত পেশী অপেক্ষা দৃঢ়।

অনেক হিংস্র জন্তুর গায়ে ব্যাঘ্রের স্থায় ডোরা ডোরা দাগ থাকে। এই দাগের জন্য ইহারা বনের গাছপালার সঙ্গে মিশাইয়া যায়। সেই জন্য হরিণ প্রভৃতি জন্তু বুঝিতে না পারিয়া পলায়ন করে না এবং সহজেই ধরা পড়ে।

প্রশ্নমালা

(১) সজীব পদার্থের বৈশিষ্ট্য কি ?

(২) শ্বাস-প্রশ্বাস বলিতে কি বুঝ ?

(৩) জীবজগৎ কিরূপে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া জীবনধারণ করে বুঝাইয়া দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

ধান গাছের জীবন-চরিত

একটি ধান উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলে নিম্নবর্ণিত অংশগুলি চিনিতে পারা যায়। ইহার নীচের দিকে অতি ক্ষুদ্র সাদা দুইটি আঁশ আছে। তার পর পাওয়া যায় ইহার খোসা। এই খোসাতে দুইটি তুষ আছে। বাহিরের তুষটি বড় এবং কচি অবস্থায় ধানের ফুলটিকে ধারণ করে। এই তুষের বিপরীত দিকে আর একটি তুষ থাকে ; এই দুইটি তুষ একত্র হইয়া তণ্ডুল-ফলকে আচ্ছাদিত করে। এক একটি আছাঁটা চাউল তণ্ডুল-ফল। আছাঁটা চাউলের গায়ে যে বাদামি বা লাল রঙের অতি পাতলা স্তর থাকে, উহাই ফলের আবরণ, এবং ঐ আবরণের ভিতরের অংশ বীজ। ফলের পাতলা আবরণস্তর বীজের গায়ে লাগিয়া থাকে।

চাউলের সমস্ত অংশটা প্রায় সার, কেবল উহার নীচের দিকে এক পাশে ক্ষুদ্র ভ্রূণ অবস্থান করে। চাউলের নীচে এক পাশে যে ভগ্ন কোণ দেখিতে পাওয়া যায়—উহাই ভ্রূণদ্বারা পূর্ণ ছিল। একটিমাত্র বীজদল ভ্রূণকে ঘিরিয়া থাকে এবং অঙ্কুরণের সময় সার হইতে খাদ্য শোষণ করিয়া ভ্রূণকে প্রদান করে। একটিমাত্র বীজদল থাকাতে, ধান গাছ এক-দল-বীজ গাছের অন্তর্গত।

অঙ্কুরণ :—ভিজা বালিতে ধান পুঁতিলে তিন দিনেই উহা অঙ্কুরিত হয়। অর্থাৎ ভ্রূণমূল নীচের দিকে বর্ধিত হইয়া গুচ্ছমূল আকার ধারণ করে, আর ভ্রূণকাণ্ড উপরের দিকে বাড়িয়া বড় হয়।

ধানের শীষ

পত্র ও কাণ্ড—ধানগাছের কাণ্ড সরু, দীর্ঘ, গ্রন্থিযুক্ত এবং পাবগুলি ফাঁপা। পাতাগুলি কাণ্ডের গায়ে দুই সারিতে সন্নিবিষ্ট। প্রতি **গ্রন্থি** হইতে পর পর বিপরীত দিকে এক একটি পাতা উৎপন্ন হয়, পাতার বেষ্টনী গ্রন্থির উপরস্থ পাবকে ঘিরিয়া থাকে। পাতার ফলক সরু, দীর্ঘ, সূচ্যগ্র ও সমান্তরাল শিরাবিশিষ্ট।

ধান গাছ বড় হইলে, উহার মাথায় শীষ বাহির হয়। এই শীষের গায়ে কয়েকটি শাখা হয়, এবং প্রতি শাখায় কচি কচি ধান হয়। কচি ধানের দুইটি তুষ প্রথমে ফাঁক হইয়া থাকে ; উহাদের ভিতরে ধানের ফুল থাকে। ফুলে এক জোড়া ক্ষুদ্র দল, ছয়টি পরাগ কেশর ও একটি গর্ভকেশর থাকে। ছয়টি পরাগকেশরের অগ্রভাগ

তুষের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া ঝুলিয়া থাকে, এবং বায়ুতে আন্দোলিত হইলে, ইহা হইতে পরাগ চারিদিকে ছড়াইয়া যায়। গর্ভকেশরের দুইটি কেশযুক্ত গর্ভদণ্ড তুষের ফাঁক দিয়া বায়ু হইতে পরাগ গ্রহণ করে। পরাগ গ্রহণ করিলে গর্ভকেশরের নিম্নভাগ বা গর্ভকোষ ফলে পরিণত হয়, অন্যান্য কোমল অংশ বিনষ্ট হয়, এবং তুষ দুইটি মিলিত হইয়া ভিতরে ফল ও বীজকে দৃঢ়রূপে ধারণ করে। ইহাকেই ধান বলা হয়।

ধানের ফল ধানের ফুল

যেখানে জল পাওয়ার সুবিধা আছে, সেইখানেই ধানের চাষ হয়। ভারতবর্ষ, চীনদেশ ও নিকটবর্তী দ্বীপসমূহে প্রচুর ধান জন্মে। যে সকল অঞ্চলে প্রচুর জল পাওয়া যায়, সেই সব স্থানে নানা জাতীয় ধান জন্মিয়া থাকে।

প্রশ্নমালা

(১) ধানগাছের ফুল ও ফলের বর্ণনা কর।

(২) ধানগাছের কাণ্ড ও পাতা কিরূপ?

চতুর্থ অধ্যায়

মটর গাছের জীবন-চরিত

মটর ফল :—মটর ফলকে মটর শুঁটি বলে। এই শুঁটির ভিতর গায়ে কয়েকটি বীজ এক পার্শ্বে সাজান থাকে। সুপক্ক হইলে মটর শুঁটি দুই দিকে ফাটিয়া যায়, এবং বীজগুলি খসিয়া পড়ে।

মটর বীজ :—বীজের খোসা ছাড়াইলে উহার ভিতর যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম ভ্রূণ। ভ্রূণের অংশগুলি পরীক্ষা করিলে, প্রথমে অর্ধগোলাকার দুই খণ্ড সবুজ বা পীতাভ পাতা দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের নাম বীজ-দল বা বীজ-পত্র। এই দুইটি দল পৃথক করিলে দেখা যায়, ইহারা ক্ষুদ্র বৃন্তের দ্বারা একটি দণ্ডের সহিত সংলগ্ন; উহাকে ভ্রূণ-দণ্ড বলে। ভ্রূণ-দণ্ডের একপ্রান্ত ঈষৎ বক্র; উহার নাম ভ্রূণ-কাণ্ড। উহার অপর প্রান্ত সরু, সাদা ও সরল; উহার নাম ভ্রূণ-মূল। বীজের মধ্যে দুইটি বীজ-দল থাকাতে, মটর গাছ দ্বিদল-বীজ উদ্ভিদের অন্তর্গত।

বীজের অঙ্কুরণ—মটরের সুপক্ক বীজ, জল বাতাস ও উপযুক্ত তাপ পাইলে দুই দিনেই অঙ্কুরিত হয়। বীজের খোসা জল শোষণ করিয়া নরম হয়। উহার ভিতর বায়ু প্রবেশ করে ও ভ্রূণের দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ হয়। দুইটি বীজ-দলের ভিতর যে কঠিন ও দুষ্পাচ্য খাদ্য থাকে, তাহা এখন জল, বায়ু ও এক প্রকার পাচক-রসের সাহায্যে কোমল ও সুপাচ্য হয়। ভ্রূণ এই খাদ্য গ্রহণ করিয়া বড় হয়, এবং ঐ ভ্রূণের মূল ও কাণ্ড খোসার ছিদ্র দিয়া অথবা খোসা ভেদ করিয়া বাহির হইতে থাকে। ভ্রূণ-মূল নীচের দিকে বর্ধিত হইয়া সরল

আকার ধারণ করে, এবং মাটি হইতে রস শোষণ করিবার জন্য উহাদের গায়ে রোম উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক মূলের অগ্রভাগ পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, উহা একটি টুপির দ্বারা সুরক্ষিত থাকে ; এজন্য উহা মাটির ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে সহজে আহত হয় না। এই টুপির নাম মূলত্রাণ।

মটর গাছ ও শুঁটি

ভ্রূণের কাণ্ড আলো পাওয়ার জন্য, উপরের দিকে বাড়িয়া থাকে ও সবুজ পত্র ধারণ করে। খাদ্য-পূর্ণ মোটা বীজ-দল দুইটি মাটির উপর উঠিয়া মটর-শিশুর মূল ও কাণ্ডকে কিছুকাল খাদ্য প্রদান করে ; এবং সমুদয় খাদ্য নিঃশেষ হইলে শুকাইয়া যায়। তখন মটর গাছ

ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া, নিজের প্রয়োজনীয় সমুদয় খাদ্য নিজেই প্রস্তুত করিয়া লয় এবং স্বাধীনভাবে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করে। সাধারণত মটর গাছ পাঁচ ছয় মাসের বেশি বাঁচে না; সুতরাং অল্পকাল মধ্যেই পুষ্প, ফল ও বীজ ধারণ করিয়া বংশ-রক্ষার ব্যবস্থা করে।

পাতা ও উহার কার্য—মটরের পাতা যৌগিক বা বহুফলকী। পাতার নীচের দিকে বোঁটার দুই পার্শ্বে দুইটি বড় উপপত্র থাকে। পাতায় কয়েক জোড়া অনুফলক। পাতার অগ্রভাগের কয়েকটি অনুফলক আকর্ষে পরিণত। আকর্ষের স্পর্শশক্তি খুব বেশি; কঞ্চি বা ঐরূপ কোন আশ্রয় পাইলে উহাকে কুণ্ডলী পাকাইয়া আঁকড়াইয়া ধরে। এই ভাবে মটর গাছ আকর্ষ দ্বারা কোন আশ্রয় অবলম্বন করিয়া উপর দিকে আরোহণ করিতে পারে। আশ্রয় না পাইলে গাছটি মাটিতে ছড়াইয়া পড়ে।

গাছ কিরূপে পত্রদ্বারা আপন খাদ্য প্রস্তুত করে ও শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য চালায়, তাহা 'উদ্ভিদ-বিদ্যা' অংশে লিখিত হইয়াছে। মটর গাছ এ সম্বন্ধে সকল গাছের সমান।

মটর ফুল—অঙ্কুরিত হওয়ার প্রায় একমাস পরেই মটর গাছে ফুল ধরে। ফুলের তলায় সবুজবর্ণ বাটির মত অংশটিকে বৃতি বলে। মুকুল অবস্থায় এই সবুজবর্ণ বৃতি ফুলের অন্যান্য অংশকে ঢাকিয়া রাখিয়া রক্ষা করে। ফুল ফুটিলে দল বা পাপড়িগুলি প্রকাশিত হয়। কোন কোন মটর ফুলের দল শ্বেতবর্ণ; কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দলগুলি বেগনি বা নীল-বেগনি রঙের হইয়া থাকে। এই রঙিন পাপড়িগুলি মক্ষিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। মটর ফুলে মধু আছে; এই মধু পান করিবার জন্য মক্ষিকা ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায়; এবং অজ্ঞাতসারে এক ফুলের পরাগ অপর ফুলের গর্ভকেশরের মুণ্ডে স্থাপন করিয়া বীজ উৎপাদনের সুবিধা করিয়া দেয়। পশ্চাৎভাগের পাপড়িটি সর্বাপেক্ষা বড়,

ইহার নাম **পতাকা** বা **ধ্বজা**। ইহাই সর্বাগ্রে মক্ষিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পতাকার দুই পাশে দুইটি ছোট পাপড়িকে **ডানা** বলে। এই দুইটি ডানার মাঝখানে সম্মুখের দিকে দুইটি যমজ-পাপড়ি থাকে; উহাদের নাম **নৌকা**। দশটি পরাগ-কেশর ও একটি গর্ভ-কেশর নৌকার ভিতরে লুক্কায়িত থাকে। দশটি পরাগকেশরের মধ্যে নয়টি সংযুক্ত,

মটর ফুলের পাপড়ি, পুংকেশর, গর্ভকেশর ও ফল
পৃথক পৃথক দেখান হইল

একটি পৃথক। সংযুক্ত পরাগকেশরগুলি গর্ভকেশরকে ঘিরিয়া থাকে। মটর ফুলের পরাগ ঠিক সেই ফুলেরই গর্ভকেশরে স্থাপিত হইলে, সাধারণত গর্ভকেশর তাহা গ্রহণ করে না। কিন্তু অপর একটি মটর ফুলের পরাগ আসিলে তাহা গ্রহণ করে। এইরূপ গ্রহণ করার ফলে গর্ভকেশরের নিম্নভাগে গর্ভকোষের মধ্যে ডিম্বকগুলি বীজে পরিণত হয়; এবং গর্ভকোষ ফলে পরিণত হইয়া বীজগুলিকে পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত ধারণ করে। প্রত্যেক বীজের মধ্যে একটি ডিম্বক বা ভ্রূণ অবস্থান

করে। ফল ফাটিলে বীজগুলি খসিয়া যায়; এবং জল, বাতাস ও তাপের সাহায্যে বীজের মধ্যস্থিত ভ্রূণ বীজ-পত্রস্থিত সার হইতে খাদ্য গ্রহণ করিয়া বর্ধিত হয়, এবং অঙ্কুররূপে বাহির হইয়া আসে।

প্রশ্নমালা

(১) কিরূপ অবস্থায় এবং কি প্রকারে মটর বীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়?

(২) মটর পাতার বর্ণনা কর। উহা দ্বারা কি কি কার্য হয়?

(৩) মটর ফুলের বর্ণনা কর। ফুলের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি চিত্র দিয়া বর্ণনা কর।

(৪) মটর ফুলে মক্ষিকা কেন আসে? উহাতে মটর ফুলের কি উপকার হয়।

(৫) মটর ফুলের দলচক্রের বর্ণনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

কেঁচো

কেঁচো মাটিতে বাস করে। বাগানের মাটিতে সচরাচর যেসকল গর্ত দেখা যায়, তাহা কেঁচো বাসের জন্য প্রস্তুত করে। গর্তগুলি প্রায় সোজাসুজি মাটির নীচে ১৮ ইঞ্চি হইতে ২০ ইঞ্চির মধ্যে অবস্থিত। বেশি গ্রীষ্ম ও শীত পড়িলে, উহারা মাটির ৬।৭ ফুট নীচে পর্যন্ত গিয়াও বাস করে। দিনের বেলা গর্তে থাকে ও রাত্রিকালে আহারের খোঁজে গর্ত হইতে বাহির হয়। ইহারা ছোট কাঁকর ও পাতার কুচি দিয়া গর্তের মুখ ঢাকিয়া রাখে। গাছের কচি পাতার অভাবে মাটি বা মাটির

সহিত যেসকল জৈব পদার্থ (organic matter) থাকে, তাহা ইহারা খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। চর্বি ও স্নেহজাতীয় পদার্থ খাইতে ইহারা অত্যন্ত ভালবাসে।

কেঁচোকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হইলে, ইহাদের মারিয়া ফেলা দরকার। কারণ জীবিত থাকিলে, ইহারা অত্যন্ত সঙ্কুচিত থাকে। স্পিরিটে (methylated spirit) জল মিশাইয়া তাহার মধ্যে ইহাকে ফেলিলে সমস্ত দেহ প্রসারিত করিয়া ইহারা মরিয়া যায়।

কেঁচোর দেহ লম্বা ও গোলাকার। দেহের দৈর্ঘ্য ৭ ইঞ্চি হইতে ৮ ইঞ্চি। ইহাদের সর্বশরীর মসৃণ ও উজ্জ্বল। ভাল করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, ইহাদের দেহ অঙ্গুরীর ন্যায় খণ্ডে (segment) বিভক্ত। ইহাদের দেহে সাধারণত ১০০ হইতে ১২০টি অঙ্গুরীর ন্যায় খণ্ড থাকে। পর পৃষ্ঠার ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, ইহাদের দেহের একস্থান সামান্য একটু বিভিন্ন। সেই স্থানটির নাম **ক্লাইটেলম** (clitellum)। তিনটি অঙ্গুরী মিলিত হইয়া ঐ স্থানটি গঠিত। চলাফেরা করিবার জন্য ইহাদের সমস্ত দেহে এক প্রকার পদ বা পা আছে। ঐ পদগুলিকে **রোম** বা **কিটা** বলে। ইহা খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু ইহা থাকার প্রমাণ যে, কেঁচো হাতে ধরিয়া পিছন হইতে একটু টানিলে বেশ একটু খসখসে বলিয়া মনে হয়। ক্লাইটেলম, প্রথম অঙ্গুরী ও শেষ অঙ্গুরী ছাড়া, ঐ রোম সকল অঙ্গুরীর মধ্যাংশ বেষ্টন করিয়া থাকে। পর পৃষ্ঠার ছবিতে দেখিলে রোম কিরূপে অবস্থিত থাকে বুঝিতে পারিবে। ক্লাইটেলমের অবস্থান দ্বারা কেঁচোর দেহের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগ সহজেই বুঝা যায়। ক্লাইটেলমের সামনে ১৩টি অঙ্গুরী থাকে। প্রথম অঙ্গুরী খণ্ডের (segment) পিঠের দিকে (dorsal) একটি খুব ছোট মাংসপিণ্ড দেখা যায়। ঐ ছোট মাংসপিণ্ডটিই কেঁচোর **ওষ্ঠ** (prostomium)। প্রথম খণ্ড ও ওষ্ঠের মধ্যে পেটের দিকে (ventral) যে ছোট ছিদ্র দেখিতে

পাওয়া যায়, তাহাই ইহাদের **মুখ** (mouth) এবং দেহের সর্বশেষ অঙ্গুরী খণ্ডে যে ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা **পায়ু** বা গুহ্য দ্বার (anus)।

কেঁচোর পৃষ্ঠদেশ (dorsal side) কেঁচোর উদরদেশ (ventral side)
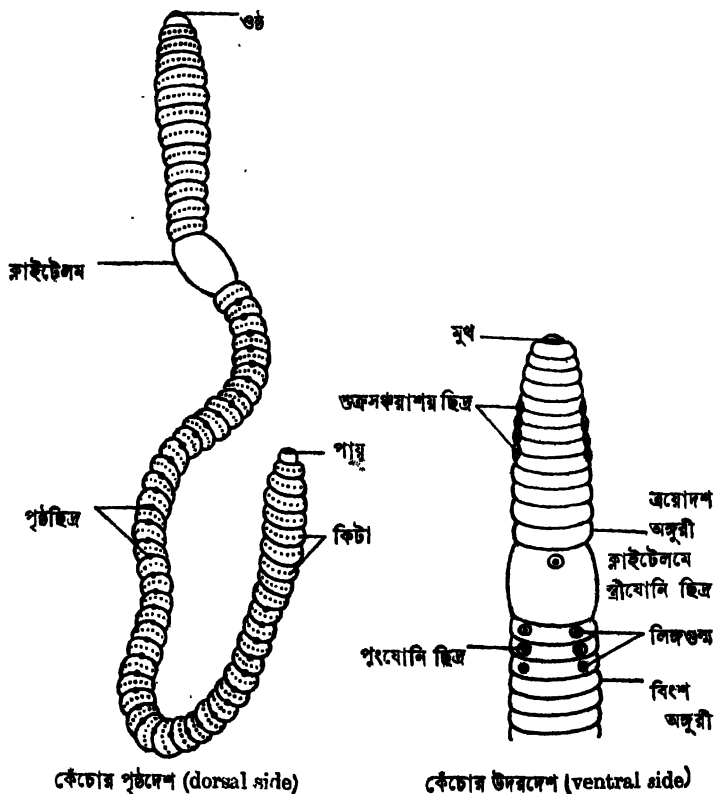
কেঁচো **উভলিঙ্গ** (hermaphrodite) অর্থাৎ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ একই কেঁচোর দেহে অবস্থিত। উদরদেশে (ventral side) ক্লাইটেলমের পুরোভাগে যে একটি ছিদ্র দেখা যায়, তাহা কেঁচোর **স্ত্রীযোনি ছিদ্র** (the aperture of the female generative duct)। অষ্টাদশ অঙ্গুরী

খণ্ডের দুই পাশে দুইটি ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ ছিদ্র দুইটি ইহাদের **পুংযোনি ছিদ্র** (the aperture of the male generative duct)। সপ্তদশ ও উনবিংশ অঙ্গুরী খণ্ডের দুই পার্শ্বে ২টি করিয়া ৪টি গুল্ম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে ছিদ্র বলিয়া সাধারণত ভুল হয়। ইহাদিগকে কেঁচোর **লিঙ্গগুল্ম** (genital papillae) বলে। ইহা ছাড়া ইহাদের দেহে আরো অনেক ছিদ্র আছে। দেহের দুই পার্শ্বে পঞ্চম ও ষষ্ঠ, ষষ্ঠ ও সপ্তম, সপ্তম ও অষ্টম, অষ্টম ও নবম অঙ্গুরীর মধ্যে ২টি করিয়া ৮টি ছিদ্র দেখা যায়। ইহাদিগকে **শুক্রসঞ্চয়াশয় ছিদ্র** (spermathecal aperture) বলে। ইহা সন্তান জন্মাইবার জন্য দরকার হয়। কেঁচোর পিঠের দিকের মধ্যস্থলে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ অঙ্গুরীর যোজন স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া শেষের দুই অঙ্গুরীর সংযোগ স্থান পর্যন্ত কতকগুলি ছিদ্র দেখা যায়। ঐ ছিদ্রগুলি খুব ক্ষুদ্র ; ইহাদিগকে **পৃষ্ঠছিদ্র** (dorsal pore) বলে। এই ছিদ্রগুলির দ্বারা কেঁচো উহাদের শরীর হইতে এক প্রকার রস বাহির করে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, মাটি হইতে যে সমস্ত জীবাণু বা বীজাণু ইহাদের দেহে প্রবেশ করে, সেই সমস্ত জীবাণু বা বীজাণুগুলিকে ইহারা ঐ রস দ্বারা মারিয়া ফেলে।

পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রথম হইতে অষ্টাদশ অঙ্গুরী খণ্ডের মধ্যে কোন স্থান কাটিয়া দুই ভাগ করিলে, তাহার মুখ নূতন করিয়া জন্মায়, কিন্তু কর্তিত পুরোভাগটি নষ্ট হইয়া যায়। আবার অষ্টাদশ অঙ্গুরীর পরের অংশ দুইভাগ করিয়া কাটিলে দেখা যায় যে, কর্তিত পুরোভাগটিতে একটি পশ্চাৎ ভাগ (tail end) উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আর একটি নূতন পায়ু (anus) হয় এবং শেষের ভাগটিতেও আর একটি পশ্চাৎ-ভাগ (tail end) গঠিত হয়। কিন্তু শেষেরটির মুখ না থাকায় ইহা অনাহারে মরিয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কাটিয়া ফেলিলে কেঁচো সব সময়ে মরে না। ইহা ছাড়া তিনটি

কেঁচোকে এমনভাবে জোড়া যায় যে, তাহারা মিলিয়া একটি প্রকাণ্ড কেঁচোতে পরিণত হয়। ইহাকে জোড় কলম (grafting) বলে। একটি কেঁচোর পশ্চাৎভাগ, আর একটি কেঁচোর পশ্চাৎভাগের সহিত কলম
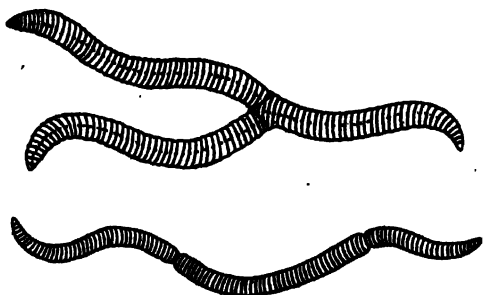
কেঁচোর জোড় কলম

করিলে দেখা যায় যে, ইহার দুইটি মুখ ও একটি পশ্চাৎভাগ গঠিত হইয়াছে।

পৌষ্টিক নালি (alimentary canal)—আগেই বলিয়াছি প্রথম অঙ্গুরীতে মুখ, মুখের ভিতর **ফ্যারিংক্স** (pharynx), তাহার পর **ইসোফেগস** (œsophagus), যাহার ভিতর চর্বণ যন্ত্র **গিজার্ড** (gizzard) অবস্থিত। ইসোফেগসের পর **অন্ত্র** (intestines)। এই অন্ত্র সোজা চলিয়া **পায়ুতে** শেষ হইয়াছে।

রক্তসংবহন তন্ত্র (circulatory system)—পিঠের ভিতর রক্ত বহিবার এক নালি এবং বুকের দিকে আর একটি নালি, দুই পার্শ্বে আরও দুইটি নালি অবস্থিত। অর্থাৎ রক্ত চলাচলের জন্য সর্বশুদ্ধ চারিটি নালি দৃষ্ট হয়। পূরোভাগে পাঁচ জোড়া এড়ো নালি **হৃদয়** বলিয়া পরিচিত।

শ্বাসকার্য (respiration)—গাত্র দ্বারা শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয়, কারণ কেঁচোর ত্বক খুব পাতলা। ইহারা ত্বক দিয়া বাহির হইতে অক্সিজেন

লয় এবং ত্বক দিয়া দূষিত বায়ু ত্যাগ করে। ইহাদের পৃথকভাবে কোন শ্বাস-যন্ত্র নাই। এই অক্সিজেন লইবার জন্য ইহারা সর্বদা শরীর আর্দ্র রাখে।

স্পর্শেন্দ্রিয় (sense organ)—কেঁচোর স্পর্শেন্দ্রিয় খুব প্রখর। শরীরের যে কোন স্থান স্পর্শ করিলেই ইহারা দেহ সঙ্কুচিত করে। কিন্তু ডারউইন পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহারা কোন শব্দ শুনিতে পায় না। ইহাদের চোখ নাই। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, শরীরের অগ্র ও পশ্চাৎ ভাগের কোন কোন অঙ্গুরীতে রাত্রিকালে তীব্র আলো পড়িলে, ইহারা দেহ সঙ্কুচিত করে।

কেঁচোকে অনেকেই ঘৃণার চক্ষে দেখে। কিন্তু এই ঘৃণিত নিকৃষ্ট প্রাণী কৃষকের বিশেষ সহায়তা করে। এরূপ কৃষকসহায় প্রাণী আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই হয়। অনেকেই মাঠে, পথের ধারে, কুণ্ডলী পাকান মাটির ছোট ছোট **কেঁচোর ঢিপি** (casting) দেখিয়াছ, এইগুলি কেঁচোর পরিত্যক্ত বিষ্ঠা। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডারউইন গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে স্থানে কেঁচোরা মাটি কাটিয়া ভিতরে প্রবেশ করে, সেখানে নীচের মাটি বিষ্ঠারূপে উপরে আসে ও সেই মাটি ক্ষেতে সারের কাজ করে। আরও বাসের জন্য গর্ত্ত কাটার ফলে, নীচের মাটি আলগা হইয়া যাওয়ায়, মাটির মধ্যে বায়ু প্রবেশের সুবিধা হয় এবং তাহাতে উদ্ভিদের মূল সকল সহজেই বায়ু পাইয়া মৃত্তিকার মধ্যে বাড়িতে থাকে। ডারউইন দেখাইয়াছেন যে, প্রতি বৎসর ½ ইঞ্চি মাটি কেঁচো কর্তৃক জমির উপর আনীত হয়। এইজন্য উপরে বলিয়াছি, কেঁচো চাষীদের বিশেষ বন্ধু, যেহেতু তাহারা সতত মাটি চষিতেছে ও উহাতে সার দিতেছে। ইহা ছাড়াও কেঁচো আমাদের আরো অনেক উপকার সাধন করে। লোকে কেঁচোর টোপ দিয়া মাছ ধরে। কবিরাজী মতে কেঁচো হইতে অনেক মূল্যবান ঔষধ প্রস্তুত হয়।

প্রশ্নমালা

(১) কেঁচোর আকৃতি বর্ণনা কর।

(২) ক্লাইটেলম, পৃষ্ঠছিদ্র, গিজার্ড বলিতে কি বুঝ?

(৩) কেঁচোর শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য কিরূপে সাধিত হয়?

(৪) কেঁচোর স্বভাব ও উপকারিতা সম্বন্ধে যাহা জান বল।

(৫) কেঁচোকে কাটিলে কি হয়? কেঁচোর জোড়কলম কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়

পতঙ্গ

অমেরুদণ্ডী প্রাণী নানা ভাগে বিভক্ত। পতঙ্গ এক বিভাগীয় অমেরুদণ্ডী। মশা, মাছি, পিপীলিকা, মৌমাছি, প্রজাপতি, উই প্রভৃতি প্রাণী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর যেমন তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল, তেমনি প্রাণী জগতের তিন ভাগ পতঙ্গ এবং এক ভাগ অন্যান্য প্রাণী।

পতঙ্গের পুঞ্জাক্ষি

পতঙ্গের দেহ প্রধানত তিনটি সুস্পষ্ট ভাগে বিভক্ত। সম্মুখদিকে **মস্তক** বা **মাথা** (head), মধ্যে **বক্ষ** বা **বুক** (thorax) এবং সর্বশেষে **উদর** বা **পেট** (abdomen)। মস্তকের উপরে দুই ধারে সরু নরম কাঠির মত নমনীয় দুইটি যন্ত্র আছে, তাহাকে **শুঙ্গ** বা **অ্যানটেনা** (antenna) বলে। এই যন্ত্রটি ইহারা ইচ্ছামত চারিধারে ঘুরাইতে পারে। শুঙ্গ সাধারণত খুব ছোট ছোট রোমে (hair) আবৃত থাকে। মস্তকের দুই পার্শ্বে চক্ষু অবস্থিত। এক

একটি চোখের মধ্যে আবার হাজার হাজার চোখ, সেইজন্য পতঙ্গের চক্ষুকে **পুঞ্জাক্ষি** (compound eye) বলা হয়।

বক্ষ বা বুক তিন খণ্ডে (segment) বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডের নিম্নদেশে একজোড়া করিয়া **পা** আছে। অর্থাৎ ইহাদের সর্বশুদ্ধ ছয়টির বেশি পা নাই। এই বিশিষ্টতার জন্য পতঙ্গের আর এক নাম **ষটপদী** (hexapoda)। বক্ষোদেশের উপর দিকে পতঙ্গের পক্ষ বা **ডানা** (wings) থাকে। পাখির ডানা পালকে মোড়া এবং ভিতরে হাড়,
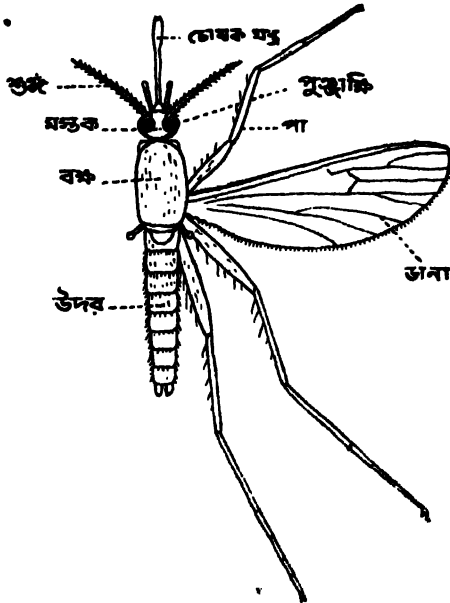
পতঙ্গের দেহ

আর পতঙ্গের ডানা পাতলা, তাহাতে পালকও নাই, হাড়ও নাই। সব পতঙ্গেরই যে ডানা আছে তাহা নয়। দেখ কাহারও কাহারও দুই জোড়া ডানা আছে, যেমন প্রজাপতি, মৌমাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি।

এক জোড়া ডানা আছে এমন পতঙ্গও আছে, যেমন মশা, মাছি ইত্যাদি। ছারপোকা উকুন প্রভৃতি পতঙ্গ ডানাবিহীন। ইহাদিগকে **'অপক্ষ'** (aptera or wingless) পতঙ্গ বলা হয়। পুরাতন পুস্তকের ভিতর যে এক রকম চ্যাপটা রূপালী পতঙ্গ পাওয়া যায়, তাহারা এই অপক্ষ পতঙ্গ বর্গের অন্তর্গত।

শ্বাসযন্ত্র (respiratory organ)—পতঙ্গের উদর বা পেট দশটি খণ্ডে বিভক্ত। বুক ও পেটের প্রত্যেক খণ্ডের দুই পার্শ্বে যে ছোট ছোট ছিদ্র দেখা যায়, সেগুলি ইহাদের **শ্বাস-ছিদ্র** (stigmata or spiracle)। এই ছিদ্রগুলি দেহের মধ্যস্থিত এক প্রকার **বায়ু-নলের** (air-tubes) সহিত সংযুক্ত। ইহাই ইহাদের **শ্বাস-যন্ত্র**। একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, যখন কোন পতঙ্গ কোন কিছুর উপর বসিয়া থাকে, তখন তাহাদের উদরদেশ উঠা নামা করিতেছে। এইরূপ নড়ার দ্বারাই ইহাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস কাজ সম্পন্ন হয়।

আরশুলা, গুবরে পোকা ইত্যাদি দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, পতঙ্গের দেহ এক প্রকার কঠিন আবরণে আবৃত। ঐ কঠিন আবরণ যে পদার্থ দিয়া তৈয়ারি, তাহার নাম **কাইটিন** (chitin)। দেহ নিঃসৃত রস দ্বারা এই দেহাবরণ প্রস্তুত হয়। মধ্যে মধ্যে এই আবরণ ইহারা ত্যাগ করিয়া থাকে। পরিত্যক্ত আবরণকে আমরা **খোলস** বলি। শরীরের অনেক প্রকার দুষিত পদার্থ এই খোলস আকারে রূপান্তরিত হইয়া পরিত্যক্ত হয়। বাচ্ছা অবস্থায় ইহারা ঘন ঘন খোলস ত্যাগ করিয়া থাকে। আরশুলার খোলস ত্যাগ করা, তোমরা কেহ কেহ দেখিয়াছ।

জীবনেতিহাস (life-history)—পতঙ্গের জীবনেতিহাস বড় মজার। আমরা জানি যে গরুর বাচ্ছা গরুর মত দেখিতে হয়, অর্থাৎ পিতামাতার রূপ বা আকৃতি পাইয়া প্রসবিত হয়। কিন্তু পতঙ্গের তাহা হয় না। পতঙ্গের জীবনেতিহাসে দেখা যায় যে, ডিম অবস্থা হইতে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা

প্রাপ্তির মধ্যে আকৃতির ও গঠানাদির পরিবর্তন ঘটে। সাধারণত আমরা চারিটি অবস্থা দেখিতে পাই,—প্রথম **ডিম** অবস্থা, দ্বিতীয় **শূক** বা **লার্ভা** (larva) অবস্থা, তৃতীয় **পিউপা** (pupa) অবস্থা এবং চতুর্থ **ইমাগো** (imago) বা পূর্ণাঙ্গ অবস্থা। পতঙ্গ ডিম পাড়িলে ডিম ফুটিয়া যে বাচ্ছা বাহির হয়, তাহা অনেকটা কৃমির (worm) মত দেখিতে। আমরা তাহাকে **শূক** বা **লার্ভা** বলি। লার্ভা দেখিতে একটুও পিতা-মাতার মতন হয় না। ইহাদের ডানা থাকে না, কাহারও কাহারও পা থাকে, কাহারও বা থাকে না; যাহাদের থাকে, তাহাদের পা-গুলি স্বতন্ত্র প্রকারের। এই অবস্থায় ইহারা বড় পেটুক হয়। গাছের পাতা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব খাইয়া এবং ঘন ঘন খোলস ত্যাগ করিয়া বর্ধিত হইতে থাকে। কিছুকাল এইরূপ জীবনধারণ করিবার পর, দেহের বাহিরে এক প্রকার আবরণ প্রস্তুত করে এবং তাহার মধ্যে বাস করে। এই অবস্থায় ইহারা কিছুই খায় না, কাজও করে না, ঘুমাইয়া থাকে। কিন্তু এই সময়েই ইহাদের দেহের ও গঠনাদির পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থার নাম **পিউপা**। কিছুদিন পরে ঘুমন্ত অবস্থা কাটিয়া যায় এবং ঐ আবরণ কাটিয়া বাহির হইয়া আসে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ। এই পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ, ঠিক তাহার পিতামাতার মত দেখিতে। এই অবস্থাকে **ইমাগো** বলে। রূপ বা আকৃতির এবং গঠনাদির পরিবর্তন হইয়া পরিবর্ধিত হওয়ার ধারাকে **রূপান্তর** (metamorphosis) বলে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পতঙ্গের জীবনেতিহাসে রূপান্তর দৃষ্ট হয়।

প্রশ্নমালা

(১) পতঙ্গের দেহ কয়ভাগে বিভক্ত? তাহাদের বর্ণনা কর।

(২) "পুঞ্জাক্ষি" বলিতে কি বুঝ? ষটপদী কাহাকে বলে?

(৩) পতঙ্গের জীবনেতিহাস বর্ণনা কর।

(৪) পতঙ্গের শ্বাসকার্য বিষয়ে যাহা জান বর্ণনা কর।

সপ্তম অধ্যায়

পিপীলিকা

পিপীলিকা সর্বত্র দেখা যায়। বাড়ীর আনাচে-কানাচে বা যেস্থানে একটুকরা মিছরি বা মিষ্ট পড়িয়া আছে অথবা যেস্থানে একটা আরশুলা বা টিকটিকি মরিয়াছে, সেইস্থানেই পিঁপড়ের দলের আনাগোনার আর বিরাম নাই। মাঠের মধ্যেও তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। বৃক্ষশাখাতেও বিরল নহে। বড় **লাল পিঁপড়া** আমগাছে পাতা বাঁধিয়া বাস করে, তাহা তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। গাছে আর এক প্রকার লাল-কাল রঙ মিশান **কাঠ পিঁপড়া** দেখা যায়, ইহাদের কামড় যে একবার খাইয়াছে সে কখনও ইহাদিগকে ভুলিবে না। বাড়ীতে যে বড় কাল কাল পিঁপড়া দেখা যায়, তাহাকে **ডেঁয়ো পিঁপড়া** কহে। আর এক প্রকার ছোট কাল পিঁপড়া দেখা যায়, সেগুলিকে **সুড়সুড়ে** পিঁপড়া কহে, কারণ ইহারা আমাদের গায়ের উপর চলিলে সুড়সুড়ি লাগে। **ছোট লাল পিঁপড়ার** কামড়ে অনেক সময় অস্থির হইতে হয়। এই রকম কত প্রকারের পিঁপড়া আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাই।

সাধারণ পতঙ্গের ন্যায় পিপীলিকার দেহ তিন ভাগে বিভক্ত,—**মস্তক** বা মাথা, **বক্ষ** বা বুক এবং **উদর** বা পেট। বুক ও পেটের মধ্যে একটি ছোট ত্রিকোনাকার সরু গঠন থাকে। উহাকে পিঁপড়ের **কোমরের** অংশ বলিতে পার। উদর কাহারও গোলাকার, কাহারও বা বেলুনের মত। ইহাদের **শুঙ্গ** বা **অ্যানটেনা** অন্যান্য পতঙ্গের মত নহে। গোড়ার খানিকটা অংশ লম্বা ও সোজা, পরে একটি ভাঁজে ভাঙ্গিয়া সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে, দেখিতে অনেকটা ইংরেজি L-এর মতন। এই শুঙ্গ সাহায্যে ইহারা পথ চিনিতে পারে এবং পরস্পর

খবরাখবর লইয়া থাকে। দুইটি **পুঞ্জাক্ষি** মস্তকের দুইপার্শ্বে অবস্থিত, দেহের রঙএর সহিত মিশান বলিয়া হঠাৎ বুঝা যায় না।

একই জাতীয় (species) পিপীলিকার মধ্যে নানা আকৃতির পিপীলিকা দেখা যায়। শুধু আকৃতিতে বিভিন্ন নহে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কাজও করিয়া থাকে। সাধারণত আমরা যাহাদের দেখিতে পাই, তাহাদিগকে **কর্মী** (worker) পিপীলিকা বলি। ইহাদের ডানা নাই। **পুরুষ ও স্ত্রী-পিপীলিকার** দুই জোড়া করিয়া পাতলা ডানা আছে। তোমরা হয়ত অনেকেই জান না যে পিঁপড়ের আবার ডানা থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ

পুং-পিপীলিকা বা রাজা স্ত্রী-পিপীলিকা বা রানি সৈনিক কর্মী

পিপীলিকার আকৃতিতে পার্থক্য আছে। স্ত্রী-পিপীলিকা পুং-পিপীলিকা অপেক্ষা অনেক বড়। উপরন্তু পেটটি বড়, সম্ভবত ডিমে ভর্তি বলিয়া। আমরা ইহাদিগকে সচরাচর দেখিতে পাই না। বর্ষাকালে মধ্যে মধ্যে আমাদের গৃহাবাসে ইহাদিগকে উড়িয়া আসিতে দেখি। আমরা যে ডানাবিহীন কর্মী পিপীলিকা দেখিতে পাই, তাহার মধ্যেও আবার দুই প্রকার আকৃতির পিঁপড়ে দেখা যায়। একটি আকারে ছোট ও সংখ্যায় খুব বেশি, আর একটি বেশ বড়। ইহার মস্তক খুব বড় এবং মুখের কামড়াইবার যন্ত্র **ম্যাণ্ডিবল** (mandible) বড় হইয়া থাকে। ইহারাই পিপীলিকার **সৈনিক** (soldier)। এখন জানিলে যে, একই জাতির পিঁপড়ের মধ্যে নানা রূপের বা আকৃতির পিঁপড়ে পাওয়া যায়।

সাধারণ পিঁপড়েরা আমাদিগকে কামড়াইয়া জ্বালাতন করে। কয়েক জাতির পিঁপড়ের উদরপ্রান্তে একটি **হুল** (sting) আছে ও

হুলের মধ্যে বিষ থাকে। আমাদের শরীরে হুল ফুটাইয়া দিলে, আমরা অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি।

"বোধ হয় এই পৃথিবীতে মানুষ ছাড়া আর কোন প্রাণী বুদ্ধিতে পিপীলিকাকে হার মানাইতে পারে না।" আমরা সকলেই জানি যে, পিপীলিকারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভালবাসে। এক এক দল এক এক স্থানে বাসা বাঁধিয়া বাস করে। প্রত্যেক দলের বাস করিবার রীতি স্বতন্ত্র। প্রত্যেক দলের বাসায় পুরুষ, স্ত্রী ও কর্মী সকলেই থাকে। কর্মীদের মধ্যে আবার নানা বিভাগ আছে। সৈনিকের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, তা ছাড়া চাকর আছে, দরোয়ান আছে, ধাত্রী আছে, এই রকম নানা কাজের কর্মী আছে। এদের সব লইয়া এক একটি পরিবার গঠিত।

স্ত্রী-পিপীলিকা একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহারা শুধু ডিম পাড়িয়াই খালাস, তাহাদিগকে আর অন্য কোন কাজ করিতে হয় না, এক রকম আলস্যেই দিন কাটায়। কর্মীরা সকলে মিলিয়া খাবার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাকে খাওয়ায়, সেবা করে। পরিবারের মধ্যে ইহারই খাতির বেশি। বোধ হয় এইজন্য ইহাকে **রানি** (queen) পিপীলিকা বলে। রানিকে বাসার বাহিরে আসিতে দেয় না—সদাই সতর্ক পাহারায় রক্ষা করে। একটি পরিবারে একটির বেশি রানি দেখা যায় না।

পুং-পিপীলিকা বড় অলস, যদিও তাহাদিগকে **রাজা** অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইহারা কোন কাজই করে না এবং কাহারও নিকট হইতে যত্ন পায় না। কর্মীরা ইহাদের উপর কেমন যেন একটু বিরূপ।

কর্মীদের নাম সার্থক। তাহাদের শ্রম করিবার ক্ষমতা অপরিসীম। সমস্ত দিন ধরিয়া নিরলসভাবে কাজ করিয়া যাইতেছে, একটুও বসিয়া নাই। বাসা তৈয়ারি, মেরামত, পরিষ্কার করা, খাদ্য সংগ্রহ করা, বাচ্ছাদের লালন-পালন করা, পরিবারের সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ দলবদ্ধ

হইয়া করিয়া যাইতেছে, ঝগড়া নাই, মারামারি নাই,—সুন্দর সুশৃঙ্খলায় সকল কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে। যাহারা বাসা পাহারা দেয়, তাহারা কাজে একটুও ভুল করে না। বিপদ উপস্থিত হইলে সকলকে এক মুহূর্তে সজাগ করিয়া তুলে। তবে কর্ম্মীদের প্রধান কাজ (আমরা যাহা সচরাচর দেখিতে পাই তাহাতে মনে হয়) খাদ্য সংগ্রহ করা। কোন স্থানে কেহ খাবারের সন্ধান পাইলে, দলের সকলকে সে খবর দেয়। নিজেরা সবটুকু খাইয়া ফেলে না। ইহারা পেটুক নহে। খাবার বহন করিয়া আনে, দলের সকলকে ভাগ করিয়া দিবার জন্য। শুধু তাহাই নহে, অসময়ের জন্য ইহারা প্রচুর খাদ্য বাসায় সঞ্চয় করিয়া রাখে। পিপীলিকার এই সকল সামাজিক বৃত্তি মানুষের সহিত তুলনা করা চলে। মনে হয় যেন, মানুষ এই সকল বৃত্তি পিপীলিকার উদাহরণ হইতে শিখিয়াছে। ইহাদের একতা, একাগ্রতা, অধ্যবসায়, কার্যপটুতা প্রভৃতি নানা গুণ আমাদের অনুকরণীয়।

ইহাদের বাসা প্রস্তুত প্রণালী অদ্ভুত। বিভিন্ন জাতির পিপড়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাসা বাঁধিয়া থাকে। যাহারা মাটিতে বাস করে, তাহারা মাটিতে একটি ছিদ্র করিয়া ভিতরে মাটি কাটিয়া বহু ঘর প্রস্তুত করে এবং প্রত্যেক ঘরে যাতায়াতের পথ রাখে। আর এক প্রকার পিপীলিকার বাসার সহিত তোমরা হয়ত অনেকেই সুপরিচিত। ইহারাই সেই বড় লাল পিপড়ে, আমগাছের ডালে পাতা মুড়িয়া বাসা বাঁধিয়া থাকে। তাহাদের বাসা নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিবার মত জিনিষ। একই বাসায় ইহারা বহুদিন থাকে। তবে স্থান সঙ্কুলন না হইলে বা কোন কারণে বাসা ভাঙ্গিয়া গেলে, নূতন স্থান নির্বাচন করিয়া নূতন বাসা বাঁধিয়া থাকে। নূতন বাসা প্রস্তুতের সঙ্গে সঙ্গে সদলবলে সারি বাঁধিয়া বাচ্ছাদের মুখে করিয়া নূতন বাসায় নূতন করিয়া সংসার পাতে। বর্ষার সময় এইরূপ দল দেখিয়া থাকিবে। বাসার মধ্যে হঠাৎ জল

ঢুকিলে, কর্মীরা বাচ্ছা ডিম ইত্যাদি মুখে করিয়া 'রানি,' 'রাজা' ও 'সৈন্য' সমভিব্যাহারে সারি বাঁধিয়া দলে দলে নূতন বাসায় যায়। রানি ও রাজার প্রতি কর্মীরা সতর্ক দৃষ্টি রাখে, পাছে তাহারা দলভ্রষ্ট হয়।

পিপীলিকাদের সুমিষ্ট খাদ্য-দ্রব্য যে সব চেয়ে প্রিয়, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু ইহাদের অনেক জাতিই সর্বভুক্। ইহারা মরা জীবজন্তু খাইতে ভালবাসে, তাহা তোমরা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছ। তবে কয়েক জাতীয় মেঠো পিঁপড়ে আছে, তাহারা একমাত্র শাক-শবজীর উপর জীবনধারণ করে। শুনা যায় যে, আফ্রিকা দেশে এমন পিঁপড়ার দল আছে, যাহারা অতি অল্পকালের মধ্যে বড় বড় জানোয়ার নিঃশেষে খাইয়া ফেলে, মাত্র শুধু হাড় কয়খানি পড়িয়া থাকে।

খাবার দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বাসার সকলকে খাওয়াইয়া, ইহারা পরিত্যক্ত অংশ বাহিরে নিক্ষেপ করে। কেহ মরিয়া গেলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ মুখে করিয়া আনিয়া বাসার বাহিরে ফেলিয়া দেয়। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ইহারা কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে।

দুগ্ধ পান করিবার জন্য আমরা যেমন গরু পুষিয়া থাকি, সেইরূপ অনেক পিপীলিকা এক প্রকার পোকা পুষিয়া থাকে। সেই পোকারা পাতা খাইয়া এক প্রকার দুধের মত রস নিঃসৃত করে এবং পিঁপড়েরা তাহা মহা আনন্দে পান করে। এই সকল পোকাকে ইহারা মাটির ঘের দিয়া বন্দি করিয়া রাখে।

পিপীলিকা-ধেনু
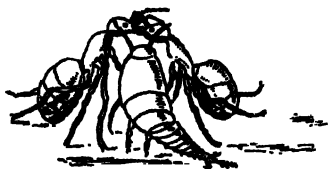
এই পোকাদিগকে **পিপীলিকা-ধেনু** (ant-cow) নাম দেওয়া হইয়াছে।

পিঁপড়াদের পোকা-পোষার কথা যেমন আশ্চর্য, তাহাদের **কৃষি-কার্য** বা চাষবাসের চেষ্টা তাহা হইতেও আশ্চর্য। বৃষ্টির দিনে ভিজা জায়গায় পচা গাছের পাতা প্রভৃতির চারিধারে ছাতা নামক উদ্ভিদ কেমন গজাইয়া উঠে, তাহা তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। ঐ ছাতার বীজ সংগ্রহ করিয়া পিঁপড়ারা তাহাদের আবাসের চারিপাশের জমিতে ঐ বীজ বুনিয়া সেই ছাতার ফসল করে। যখন জল পাইয়া ঐ সব লাগান ছাতা গজাইয়া উঠে, তখন উহারা পরম আনন্দের সহিত ঐগুলি কাটিয়া খায়। ইহাই পিঁপড়ার চাষবাস ও কৃষিকার্য।

মধ্যে মধ্যে বহু কারণে ইহাদের দুই দলের মধ্যে খণ্ড যুদ্ধ হইয়া যায়। ভিন্ন জাতি হইলে ত কথাই নাই। সে যে তুমুল যুদ্ধ হয়, তাহা যে না দেখিয়াছে, তাহার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। সে একটা প্রলয় কাণ্ড। এক দল আর এক দলের বাসা অধিকার করা না পর্যন্ত এবং একটা পিপড়ে বাঁচিয়া থাকা পর্যন্ত, তুমুল যুদ্ধ চলিয়া থাকে। বিজয়ী দল বিজেতা দলের খাদ্য-দ্রব্য সব লুঠতরাজ করিয়া, নিজের বাসায় বহন করিয়া আনে। পলাতকদের ধরিয়া আনিয়া দাস বা চাকর করিয়া রাখিয়া দেয়। এই সকল যুদ্ধের আক্রমণ প্রণালী, কৌশল, ব্যূহ-রচনা ইত্যাদিতে ইহাদের প্রচুর বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পিপীলিকার জীবনেতিহাসে সাধারণ পতঙ্গের ন্যায় চারিটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। সচরাচর আমরা যেগুলিকে পিঁপড়ের ডিম বলি আসলে সেগুলি তাহার **শূক** বা **লার্ভা**। পিঁপড়ের **ডিম** খুব ছোট। ডিম অতি অল্পকালের মধ্যে কৃমির আকার প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগকে শূক বা লার্ভা বলে। লার্ভার পা, শুঙ্গ বা চোখ থাকে না। পিঁপড়ার ডিম অনেকে পোষা পাখিকে খাইতে দেয়। পিঁপড়ের শূকেরা অন্যান্য পতঙ্গের শূকের ন্যায় নিজেরা খাইতে পারে না।

কর্মীরা ইহাদিগকে সযত্নে খাওয়ায় ও দেখা শুনা করে। শূক পরিণত অবস্থায় তাহার মুখের লালা দিয়া নিজের শরীরের বাহিরে এক প্রকার আবরণ প্রস্তুত করে এবং তাহার মধ্যে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বাস করিয়া থাকে। ইহাকে **পিউপা** অবস্থা বলে। এই অবস্থায় ঐ
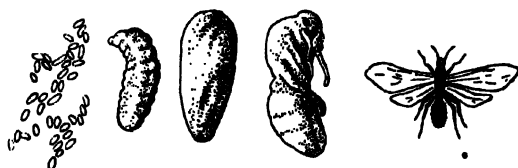
ডিম লার্ভা গুটি গুটি হইতে মুক্ত পিউপা পূর্ণাঙ্গ পিপীলিকা

আবরণের মধ্যে শূকের দেহে পরিবর্তন ক্রিয়া চলিয়া থাকে। কিছুকাল মধ্যে তাহার সমস্ত দেহ সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। পিউপা উক্ত আবরণ কাটিয়া যখন বাহির হইয়া আসে, তখন দেখা যায় যে স্ত্রী ও পুরুষ পিঁপড়ের ডানা থাকে, কর্মীদের একেবারেই ডানা থাকে না।

পুরুষ ও স্ত্রী পিঁপড়েরা বাসা হইতে উড়িয়া বাহির হইয়া যাইবার জন্য বহু চেষ্টা করে। কর্মীরা যথেষ্ট বাধা প্রদান করিলেও দেখা যায় যে, তাহারা উড়িয়া পলাইয়াছে। বাসার বাহিরে যাইয়া তাহারা অকালে প্রাণ হারায়। পুরুষ পিঁপড়েরা উড়িতে উড়িতে ডানা খসাইয়া ফেলে এবং টিকটিকি, ব্যাঙ, পাখি প্রভৃতি অনেক প্রাণীর ভক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। এখন বুঝিতে পারিয়াছ যে, কেন কথায় বলে "পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে"। অনেক স্ত্রী-পিঁপড়েও এইরূপে মারা যায়, কিন্তু যেসকল স্ত্রী-পিঁপড়ে ডানা খসিয়া যাওয়া সত্ত্বেও জীবিত থাকে, তাহারাই বাসায় গিয়া নূতন পরিবার গঠন করে।

পিপীলিকারা, উই ছারপোকা প্রভৃতি পোকামাকড় সমূলে ধ্বংশ করে। এইজন্য পরোক্ষভাবে ইহারা মনুষ্য জাতির উপকার সাধন করে।

প্রশ্নমালা

(১) স্ত্রী ও পুরুষ পিপীলিকার আকৃতির প্রভেদ বুঝাইয়া দাও।

(২) কর্মী ও রানি পিপীলিকার কাজ কি? সৈনিক পিপীলিকা কাহাকে বলে?

(৩) পিপীলিকার সমাজ, কৃষিকর্ম ও ধেনুপোষার সম্বন্ধে যাহা জান বল।

অষ্টম অধ্যায়

মধুমক্ষিকা

আমরা যে মধু খাই সেই মধু যে পতঙ্গেরা সংগ্রহ করে, তাহাদিগকে মধুমক্ষিকা বা মৌমাছি বলে। এদের নামে 'মাছি' যোগ থাকাতে তোমরা হয়ত মনে করিতে পার যে আমাদের বাড়ীতে যে সব 'মাছি' দেখা যায় তাহাদের সঙ্গে এদের জ্ঞাতিত্ব আছে। কিন্তু একটা পার্থক্যের

কর্মী   রানি   রাজা

কথা জানিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, উহাদের মধ্যে সত্যিকার কোন সম্পর্ক নাই। 'মাছি'র মাত্র দুইখানি ডানা, আর মৌমাছির

চারিখানা। মৌমাছির সঙ্গে বোলতা, ভীমরুল, কাঁচপোকা, পিপীলিকা প্রভৃতি পতঙ্গের সহিত খুব আকৃতিগত মিল আছে বলিয়া, ইহারা এক বর্গের (order) প্রাণী।

পিপীলিকার মধ্যে যেমন স্ত্রী, পুরুষ ও কর্মী দেখা যায়, ইহাদের মধ্যেও ঠিক সেই রকম স্ত্রী, পুরুষ ও কর্মী আছে। ইহাদের প্রত্যেকেরই দুই জোড়া করিয়া ডানা। তোমরা পূর্বেই জানিয়াছ যে কর্মী পিপীলিকাদের ডানা থাকে না, কিন্তু কর্মী-মৌমাছিদের থাকে, শুধু এইটুকুই তফাৎ। অন্যান্য সকল গঠন পিঁপড়ের মতন।

স্ত্রী-মৌমাছিকে **রানি** বলে। রানির পেটের দিকটা একটু লম্বা বলিয়া বড় দেখায় এবং ইহার গায়ের রঙ কিছু উজ্জ্বল। পুরুষ-মৌমাছি অত লম্বা না হইলেও বেশ মোটাসোটা এবং মাথা ও চোখ রানির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়। ইহাদিগকে **রাজা** বলা হয়। কর্মীরা স্ত্রী ও পুরুষ-মৌমাছি অপেক্ষা আকারে ছোট। কর্মীদের পেটের পিছনে **হুলে** এক রকম বিষ থাকে। কেহ জ্বালাতন করিলে ইহারা হুল ফুটাইয়া দিয়া প্রতিশোধ লয়। রাজার হুল নাই, কিন্তু রানির আছে, তাহাও খুব ছোট বলিয়া বড় একটা বুঝা যায় না এবং সচরাচর তাহা কাহাকেও ফুটাইবার দরকার হয় না।

ইহাদের সর্বদেহ লোমে ঢাকা। পিছনের পায়ের এক পাশে চিরুনীর কাঁটার মত দুই সারি বড় বড় রোমের **ঝাড়** থাকে এবং তাহা অনেকটা চুপড়ির মতন দেখায়।

কর্মী মৌমাছির পিছনের পায়ে ফুলের পরাগ সংগ্রহের জন্য লোমের ঝাড়

মৌমাছির মুখ ফুলের মধু চুষিয়া খাইবার জন্য বিশেষভাবে তৈয়ারি বলিয়া মুখের অংশ অনেকটা শুঁড়ের মতন দেখায়। সারাদিন কর্মী-মৌমাছিরা এক ফুল হইতে অন্য ফুলের

মধু সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। মধুর কতকটা অংশ তাহারা খায়, আর বাকি অংশ পাকস্থলীর (stomach) এক পাশে এক থলি আছে, তাহাতে সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং বাসায় ফিরিয়া আসিয়া, ভাঁড়ার-ঘরে সঞ্চয় করিয়া রাখে। শীতকাল এবং অকালের জন্য এই সঞ্চয়, কখনও কখনও বাচ্ছাদিগকে এই মধু খাওয়ায়। যখন মধুলোভী মধুপ এক ফুলে গিয়া মধুপানে বসে, তখন তাহার পায়ে ফুলের পরাগ বা রেণু লাগিয়া যায়। আবার অন্য ফুলে গিয়া যখন বসে, তখন তাহার পায়ের পরাগ ঐ ফুলের গর্ভকেশরে লাগিয়া যায়। ফলে, গাছে ফল ও বীজ জন্মলাভ করে। মৌমাছি এইরূপে গাছের মিলন সম্পন্ন করে। এখন সর্বাঙ্গে যে পরাগ লাগিয়া রহিল, তাহা পিছনের পা দিয়া বুরুশের মত আঁচড়াইয়া মুখের লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া, ছোট ছোট বড়ির মতন প্রস্তুত করে। পরে পিছনের পায়ের সেই চুপড়িতে তাহা সংগ্রহ করে। বাসায় ফিরিয়া তাহা বাচ্ছাদের খাওয়ায় এবং ভাঁড়ার ঘরে সঞ্চয় করিয়া রাখে। ঐ পরাগের বড়ি মৌমাছিদের বাচ্ছাদের একমাত্র প্রধান খাদ্য।

মৌমাছির বাসার মধ্যে মধু সঞ্চিত থাকে বলিয়া তাহার নাম মৌচাক। মৌচাক তোমরা অনেকে দেখিয়া থাকিবে। যে স্থানে
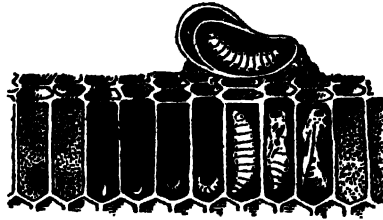
মৌচাকের মধ্যে মৌমাছির ডিম, লার্ভা ও পিউপা

আলো-বাতাস যায় অথচ রৌদ্র-বৃষ্টির উৎপাত কম, সেইস্থানে ইহারা চাক বাঁধিতে আরম্ভ করে। গাছের ডালে বা বাড়ীর বারান্দার কোণে

প্রায়ই মৌচাক দেখা যায়। এক একটি চাকে বহু ছোট ছোট ছয়-কোণা ঘর থাকে। কর্মীরা এই চাক মোম দিয়া প্রস্তুত করে এবং যে মোম দরকার হয়, তাহা দেহ হইতে নিঃসৃত করে। এই চাক প্রস্তুত করিবার কালে তাহারা যথেষ্ট মধুপান করে। আমাদের শরীর হইতে যেরূপ ঘাম বাহির হয়, সেইরূপ কর্মীদের দেহ হইতে মোম নিঃসৃত হইয়া পেটের তলায় জমা হয়। পরে তাহা পা দিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া মুখে পুরিয়া দেয় এবং লালার সহিত মিশাইয়া নরম করিয়া বাসা তৈয়ারি করে। এই রকম করিয়া ধীরে ধীরে চাক বাঁধে।

এক একটি চাকে হাজার হাজার মৌমাছি থাকে। তাহাতে মাত্র একটি **স্ত্রী-মৌমাছি** থাকে, **পুরুষ-মৌমাছি** খুব কম থাকে, বাকি সবাই **কর্মী**। অবশ্য ইহা ছাড়া নানা অবস্থার বাচ্ছারা থাকে, তাহাদের কথা পরে বলিতেছি। বাস করিবার ঘর ছাড়া, মধু-সঞ্চয়-কোষও যথেষ্ট থাকে। সেই মধু আমরা পিষিয়া বাহির করিয়া লই। পিপীলিকার মত স্ত্রী ও পুরুষ-মৌমাছি দুইই অলস, কিন্তু কর্মীরা কর্মঠ ও পরিশ্রমশীল। তাহারাই সব কাজ করে, **রানিকে** খাওয়ান-দাওয়ান, বাচ্ছাদের লালন-পালন, মধু-সঞ্চয় ইত্যাদি সব কাজই কর্মীরা করিয়া থাকে। পিপীলিকার কর্মীদের মত, ইহাদের কাজ করিবার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ আছে, প্রত্যেকেই কলের মত কাজ করিয়া যায়। ইহাদের নিকটও আমাদের শিক্ষনীয় বহু জিনিষ আছে।

কর্মীরা বেশিদিন বাঁচে না। দুই তিন মাসের মধ্যে মরিয়া যায়। রানি ২।৩ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। অকর্মা পুরুষেরা কিন্তু বেশি দিন বাঁচে না।

পিঁপড়ের মত ইহাদের জীবনেতিহাস বড়ই চমৎকার। রানি সর্বদাই কর্মীদের তদারকে থাকে। হঠাৎ সে পলাইয়া গেলে, দেখা যায় দুই একটি অলস পুরুষ তাহার সঙ্গে গিয়াছে। কর্মীরা তখন রানিকে

ফিরাইয়া আনিবার জন্য পিছনে যায়। আকাশ বিহার শেষ হইলে রানিকে কর্মীরা বাসায় ফিরাইয়া আনে, অথবা নূতন স্থানে নূতন চাক বাঁধিতে আরম্ভ করে। রানি দুই একদিনের মধ্যে বাসায় ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। প্রত্যেক কামরায় এক একটি **ডিম** পাড়ে। ডিম পাড়া হইতে পূর্ণাঙ্গ হওয়া পর্যন্ত মৌমাছির জীবনেতিহাস সাধারণ অন্যান্য পতঙ্গের অনুরূপ। তিন দিনের পর ডিম ফুটিয়া কৃমির মত **শূক** বা **লার্ভা** বাহির হয়। ইহাদের **শুঙ, ডানা ও চোখ** থাকে না। একদল কর্মী ইহাদের ধাত্রীর মত রক্ষণাবেক্ষণ করে। রানি ডিম পাড়িয়াই খালাস, কর্মীদের উপর বাচ্চাদের লালন-পালনের ভার দিয়া নিশ্চিত মনে দিন কাটায়। প্রথমে লার্ভারা কর্মীদের দেহ নিঃসৃত এক প্রকার দুধের মত রস খাইয়া বড় হয়। এইরূপ দিন তিনেক কাটানর পর, ইহারা খাইতে শিখে এবং তাহাদের প্রিয় ও প্রধান খাদ্য ফুলের পরাগের বড়ি খাইয়া এবং ঘন ঘন খোলস ত্যাগ করিয়া বড় হইতে থাকে। আরও দিন-তিনেক পরে, ইহারা দেহের বাহিরে একটি আবরণ বুনিয়া বাস করে। ইহাকেই **পিউপা** কহে। যে সকল কুঠারিতে এই পিউপারা থাকে, তাহা মোম দিয়া কর্মীরা বন্ধ করিয়া দেয়। এইরূপ অবস্থায় বারদিন থাকার পর আবরণ কাটিয়া **পূর্ণাঙ্গ** প্রাপ্ত মৌমাছি বাহির হইয়া আসে।

শীতপ্রধান দেশ ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ইহাদের গতি-বিধি। মধু বহুস্থানে খাদ্য ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মধুর জন্য অনেক দেশে মৌমাছি পুষিয়া চাষ করা হয়। শুনা যায় মৌমাছি বেশ পোষ মানে। সাধারণত পদ্মবনের নিকট ও সরিষার ক্ষেতের নিকট ইহারা চাক বাঁধিয়া থাকে। যে-রকম গুণের মধু দরকার, ঠিক সেই রকম ফুলবনের নিকট রাখিয়া তাহাদের চাষ করা হয়। পদ্মমধুর কথা তোমরা হয়ত শুনিয়াছ। ইহা চক্ষুরোগে বিশেষ উপকার দেয় বলিয়া শুনা যায়। এই মধু সংগ্রহ করিতে হইলে পদ্মবন নিকটে থাকা চাই।

ব্যবসায়ীরা পদ্মবনের নিকট ইহাদের লইয়া চাষ করে। মৌমাছির নিকট হইতে যে আমরা কেবল মধুই পাই তাহা নহে, ইহাদের চাক হইতে মোম পাই। মোমবাতি, নানাপ্রকার খেলনা ইত্যাদি এই মোম হইতে তৈয়ারি হয়।

প্রশ্নমালা

(১) মধুমক্ষিকার সহিত পিপীলিকার তুলনা কর।

(২) কর্মীর আকার ও স্বভাব বর্ণনা কর। মৌমাছি কিরূপে ফুলের মিলন সম্পন্ন করে ?

(৩) মৌচাক কিরূপে প্রস্তুত হয় ? মধুমক্ষিকা আমাদের কি কি উপকারে আইসে ?

(৪) মধুমক্ষিকার জীবন-ইতিহাস বল।

নবম অধ্যায়

মশক

মশার ভোঁ ভোঁ গান কে না শুনিয়াছে। মশার কামড়ে কে না অস্থির হইয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকে যে, মশার কামড় অপেক্ষা ভোঁ ভোঁ শব্দই বড় বিরক্তিকর। রাত্রে ঘুমের প্রথম মুখে কানের গোড়ায় উহাদের গান শুনিলে কি তোমাদের ঘুম আসে ? মশার এক জোড়া করিয়া ডানা থাকে। মাছিরও তাহাই থাকে। সেইজন্য ইহারা **দ্বিপক্ষ পতঙ্গ**। ইহাদের মধ্যে কেবল **স্ত্রী** ও **পুরুষ** আছে, কর্মী নাই।

মশার **মাথা** গোলাকার, মাথার দুই ধারে দুইটি **পুঞ্জাক্ষি**। সম্মুখে সরু কাঠির মত রোমাবৃত **শুঙ্গ**। **শুঙ্গ** দেখিয়া স্ত্রী ও পুরুষ মশা চেনা যায়। **পুরুষ** মশার শুঙ্গোতে বড় বড় রোম থাকায় একটা ঝাড়ের মতন দেখায়। রস বা রক্ত চুষিয়া খাইবার জন্য মুখে অনেকটা চোঙ্গের মত দেখিতে এক যন্ত্র আছে। এই চোঙ্গ বিঁধিয়া ইহারা রস বা রক্ত পান করিয়া থাকে। পুং-মশা মানুষের গায়ে চোঙ্গ ফুটাইতে পারে না এবং রক্তও খায় না, সাধারণত তাহারা গাছের রস খাইয়া জীবন কাটায়। **স্ত্রী-মশাই** সকল অনিষ্টের মূল, তাহারাই মানুষ বা পশুর রক্ত ঐ চোঙ্গ ফুটাইয়া চুষিয়া খায়।

ইহাদের বুক **কুব্জাকার** এবং **তিন খণ্ডে** বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডে এক জোড়া করিয়া খুব সরু কাঠির মত কাল **লম্বা পা** থাকে। মধ্য খণ্ডে এক জোড়া স্বচ্ছ পাতলা **ডানা**। মশারা যে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে, তাহা উড়িবার সময় ডানার দ্রুত কম্পনে উৎপন্ন হয়, আবার যখন তাহারা ডানার কম্পন থামাইয়া বাতাসে ভাসিতে থাকে, তখন শব্দ বন্ধ হইয়া যায়। ডানার কম্পন বন্ধ করিবার জন্য বুকের তৃতীয় খণ্ডে ডানার ঠিক পিছনে খুব ছোট দুইটি গিঁটের মতন গঠন থাকে।

উদরদেশ লম্বা ও সরু, তবে ভরপেট খাওয়ার পর একটু অন্যরূপ দেখায়। উদর ও বক্ষের প্রত্যেক খণ্ডের পার্শ্বদেশে **শ্বাস-ছিদ্র** অবস্থিত।

মশা সাধারণত দিনে বাহির হয় না। অন্ধকার স্থানে বিশ্রাম করে। তোমরা কি ঘরের ছবির পিছনে, সেলফের পুস্তকের পিছনে, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির গোপন কোণে, ইহাদের বসিয়া থাকিতে দেখ নাই? অন্ধকার ভালবাসে বলিয়া, ইহারা রাত্রে মানুষের রক্ত খাইতে অভিযান করে। এক কথায় ইহারা নিশাচর। আলো বাতাস ইহারা একটুও সহ্য করিতে পারে না এবং একটুও ভালবাসে না। মাছিদের ঠিক ইহার

বিপরীত অভ্যাস। তাহারা দিবাচর। তোমরা কি ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের সেই কবিতা শুন নাই ?

"রাতে মশা দিনে মাছি,
তাই নিয়ে কলকাতায় আছি।"

মশা নানা জাতীয়। যে জাতীয় মশা আমাদের দেহে ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু সংক্রমিত করে, তাহাদিগকে **এ্যানোফিলিস** (Anopheles) মশা কহে। যাহারা গোদের (ফাইলেরিয়া রোগ) জীবাণু বহন করে, তাহাদিগকে **কিউলেক্স** (Culex) মশা কহে। আর যাহাদের দংশনে আমাদের ডেঙ্গু জ্বর হয়, তাহাদিগকে **স্টেগোমায়া** (Stegomya) মশা বলে। আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় মশার সহিত বেশি পরিচিত।

এ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশা চিনিবার সহজ উপায় তোমাদের জানিয়া রাখা উচিত। দুইটির বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া বলা যায় যে, কোন্‌টি এ্যানোফিলিস, আর কোন্‌টি কিউলেক্স। কিউলেক্স যে বস্তুর উপর স্থির হইয়া বসে, তাঁহার সহিত তাহার দেহ সমান্তরালভাবে থাকে। এ্যানোফিলিস যে বস্তুর উপর স্থির হইয়া বসে, তাহার সহিত তাহার দেহ সমান্তরালভাবে থাকে না, দেহ উঁচু করিয়া রাখিয়া বস্তুর সহিত কোণ প্রস্তুত করে। পর পৃষ্ঠার চিত্রে তাহাদের বসিয়া থাকিবার ভঙ্গি দেখিয়া রাখিলে, সহজেই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে।

মশার জীবনে চারিটি অবস্থা দেখা যায়, **ডিম, শূক** বা **লার্ভা, পিউপা,** এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত মশা বা **ইমাগো**। এ্যানোফিলিস ও কিউলেক্সের জীবনেতিহাস এক প্রকার হইলেও, আমরা তাহাদের বিভিন্ন অবস্থার পার্থক্য সহজেই ধরিতে পারি।

মশা ভোর রাত্রে ডিম পাড়ে। কিউলেক্স মশা যে কোন স্থানে একটু জল পাইলেই ডিম পাড়িয়া যায়। গভীর জলাশয়ে ডিম পাড়িতে চায় না। এ্যানোফিলিস মশা পরিষ্কার জল না পাইলে ডিম পাড়িতে

চায় না, বড় পুকুর বা নদীতে সচরাচর ডিম পাড়ে। কিউলেক্সের ডিম গায়ে গায়ে লাগিয়া জলে ভাসে, এ্যানোফিলিসের ডিম ছাড়া ছাড়া।
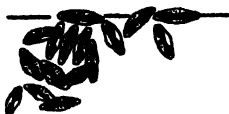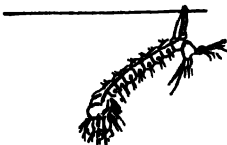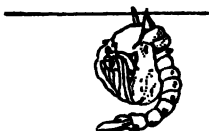
কিউলেক্সের বসিবার ভঙ্গি এ্যানোফিলিসের বসিবার ভঙ্গি

একসঙ্গে ২০০-৪০০ শত ডিম দেখা যায়। ডিম ফুটিয়া অনেকটা ক্রিমির মত শূক বা লার্ভা বাহির হয়। ইহাদের শরীরের পার্শ্বে লম্বা লম্বা

রোম থাকে। ইহাদের চক্ষু আছে কিন্তু পা নাই। ইহারা জলের মধ্যে খেলিয়া বেড়ায় ও জলের মধ্যে একরূপ ঝাঁকি মারিয়া চলাফেরা করে। জলের মধ্যে জীবাণু খাইয়া বড় হয়। সম্পূর্ণ জলের মধ্যে থাকিয়া ইহারা শ্বাস ক্রিয়া চালাইতে পারে না। ইহাদের শ্বাস-যন্ত্র এমন যে, জলের উপর হইতে বাতাস লইতে পারে। বাতাস লইবার পদ্ধতি দেখিয়া, এ্যানোফিলিস লার্ভাকে কিউলেক্স লার্ভা হইতে পৃথক করা যায়। কিউলেক্স লার্ভার নলাকর শ্বাস-যন্ত্র পেটের শেষ দিকে অবস্থিত, এ্যানোফিলিস লার্ভার উহা নাই। শ্বাসক্রিয়ার সময় এ্যানোফিলিস লার্ভা জলের লাইনের সমান্তরালে অবস্থান করে, কিন্তু কিউলেক্সের লার্ভার মস্তক নিম্নদিকে ঝুলিতে থাকে এবং শ্বাস-যন্ত্র দুইটি জলের লাইন হইতে একটু জাগিয়া থাকে। এই অবস্থায় খাইয়া-দাইয়া ইহাদের দেহ বৃদ্ধি পায় এবং তিন বার খোলস ত্যাগ করে। ৭ হইতে ১০ দিন লার্ভা অবস্থা কাটাইবার পর, দেহের প্রচুর পরিবর্তন হয় এবং পিউপা অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য পতঙ্গের পিউপা যেমন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, মশকের পিউপা সেরূপ থাকে না, লার্ভার মত সদাই সক্রিয়। অন্যান্য পতঙ্গের সহিত কিন্তু একদিকে মিল, অর্থাৎ তাহাদের মত এই পিউপা অভুক্ত থাকে। পিউপাদের দেহটা মনে হয় যেন, বাঁকা বঁড়শীর মত এবং দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাদের সমস্ত দেহটা বাঁকা বলিয়া মনে হয় যেন সর্বদাই হেঁট হয়ে আছে। সম্মুখে মাথা ও বুক মিশিয়া এক গোলাকার বলের মত দেখায় এবং পিছনে সরু ও লম্বা উদারাংশ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। এই অবস্থায় কিউলেক্স পিউপার শ্বাসযন্ত্র উদরের শেষ ভাগ হইতে সরিয়া মস্তকের দুই পার্শ্বে দেখা যায়; এ্যানোফিলিস পিউপার শ্বাসযন্ত্র নূতন করিয়া জন্মায় এবং এক হইতে তিন দিন এইরূপ অবস্থা কাটাইবার পর, জলের উপরের সীমানায় পৌঁছে। সেইস্থানে খোলস ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া আসে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত

মশক। প্রথমে ইহারা পরিত্যক্ত খোলসের উপর বসে। হঠাৎ জলে পড়িয়া গেলে মরিয়া যায়, এইরূপে অনেক মশক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তবে যাহারা ৫।১০ মিনিট পর্য্যন্ত খোলসের উপর বসিয়া থাকিতে পারে, তাহাদের ডানা ও পা বলিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং তাহার পর উড়িয়া পলাইতে সক্ষম হয়।

এ্যানোফিলিস মশকের দৌরাত্ম্যে বাংলার অনেক গ্রাম সহর ও পল্লী বন-জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত লোকের রক্ত চুষিয়া **স্ত্রী-এ্যানোফিলিস** মশক ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণু বহন করে এবং পরে আর এক ব্যক্তিকে কামড়াইবার সময়, তাহার রক্ত মধ্যে ঐ জ্বরের জীবাণু মিশাইয়া দেয়। মশক বাহক মাত্র; সে কিন্তু জ্বরে ভোগে না, ভোগে যে ব্যক্তির রক্ত চুষিয়া খায়। ঠিক এই উপায়ে গোদ, কিউলেক্স মশক দ্বারা এবং ডেঙ্গু, স্টেগোমায়া মশক দ্বারা সংক্রমিত হয়। এখন এই সকল রোগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, মশককুল ধ্বংস করা কর্ত্তব্য। ঔষধ দ্বারা রোগ নিরাময় করা যায় সত্য, কিন্তু দেশ হইতে রোগ তাড়ান যায় না। রোগের মূল নষ্ট করিতে হইলে, মশককুল ধ্বংস করিতে হইবে, কিন্তু তাহা সাধ্যাতীত। তবে এই সকল মশকের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা কতকগুলি প্রতিষেধক উপায় গ্রহণ করিতে পারি। ঝোপে, ঝাড়ে, জঙ্গলে যে সকল স্থানে মশক লুকাইয়া থাকে, সেই সকল স্থান পরিষ্কার রাখিতে হইবে। রাত্রে মশারির সাহায্যে উহাদের কামড় হইতে নিজেদের রক্ষা করা উচিত। এক উপায় আছে যাহাতে উহারা বংশবৃদ্ধি করিতে না পারে। বাড়ীর যে সকল স্থানে বা জলপাত্রে মশা ডিম পাড়ে, তাহা এমনভাবে পরিষ্কার রাখা উচিত যাহাতে উহারা ডিম না পাড়িতে পারে। পুকুর বা জলাশয়ে কেরাসিন তৈল ছড়াইয়া দিলে জলের উপর একটা স্বচ্ছ আবরণ প্রস্তুত হয়, সেই আবরণ ভেদ

করিয়া মশা ডিম পাড়িতে পারে না এবং লার্ভা ও পিউপা শ্বাস-ক্রিয়ার জন্য বাহির হইতে বাতাস লইতে পারে না। প্যারিস গ্রীণ (paris green) নামক আর এক প্রকার ঔষধ আছে, তাহাও এইরূপ ফলদায়ক। পুকুর, নদী, জলাশয়ে মাছেরা অনেক সময় মশক-শিশু ভক্ষণ করিয়া থাকে। 'তেচোখো' মাছ মশকশিশু খাইতে বড়ই ভালবাসে, যাহাতে এ সকল মাছ জলে থাকে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। সোনা ব্যাঙের ব্যাঙাচিরাও মশকশিশু খাইয়া থাকে। এইরূপ নানা উপায় অবলম্বন দ্বারা সমবেত চেষ্টায় আমরা দেশ হইতে মশা তাড়াইতে পারি। মশক যাহাতে রোগের জীবাণু বহন করিতে না পারে এবং যাহাতে ইহার বংশ অযথা বৃদ্ধি না পাইতে পারে, তাহা আমাদের কর্তব্য।

প্রশ্নমালা

(১) এ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশার প্রভেদ কি? কোন্ মশার কামড়ে ডেঙ্গু জ্বর এবং কোন্ মশার কামড়ে গোদ হয়? মশা নিবারণের উপায় কি?

(২) মশার বহিরাকৃতি বর্ণনা কর। স্ত্রী ও পুরুষ মশার তফাৎ কি?

(৩) মশার জীবন-ইতিহাস বল।

দশম অধ্যায়

প্রজাপতি

মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে পাখী দেখিতে সর্বাপেক্ষা সুশ্রী, আর সমগ্র পতঙ্গশ্রেণীর মধ্যে প্রজাপতি সর্বাপেক্ষা দেখিতে সুন্দর। এই বর্গের দুইটি প্রধান ভাগ আছে। যাহারা দিবাচর তাহাদিগকে আমরা **প্রজাপতি** (butterfly) বলি, আর যাহারা নিশাচর তাহাদিগকে বলি **মথ** (moth)। রাত্রিকালে আলোর নিকট তোমরা বহু বিচিত্র-বর্ণের মথ দেখিয়া থাকিবে।

প্রজাপতি

মথ
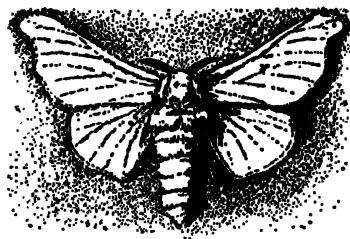
সাধারণ পতঙ্গের ন্যায় প্রজাপতি ও মথের দেহ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রজাপতির **শুঙ্গ** বা **অ্যানটেনা** অনেকটা গদার মত দেখিতে অর্থাৎ গোড়ার দিক সরু ও আগার দিক মোটা। মথের **শুঙ্গ** অন্য প্রকার। সাধারণত শেষের অংশ সরু, প্রজাপতির মত মোটা নহে। অথবা ইহা অনেকটা চিরুনীর মত ও লোমশ। **চক্ষুদ্বয়** বেশ বড়। প্রজাপতির মুখের যন্ত্র বড়ই মজার। সরু একটা নল স্প্রিংএর মত জড়ান এবং মাথার নিম্নদিকে অবস্থিত। যখন ফুলের উপর রস খাইতে বসে, তখন পাক

খুলিয়া নলটি সোজা হইয়া যায় এবং ফুলের মধ্যে তাহা ঢুকাইয়া চুষিয়া রস পান করে। বুকে তিনজোড়া সরু সরু কাঠির মতন **পা** থাকে। সামনের দুইজোড়া পা পিছনের পা হইতে ছোট। পা হাঁটিবার অপেক্ষা আটকাইয়া থাকিবার জন্ম ব্যবহৃত হয় বেশি। সবচেয়ে বৈচিত্রপূর্ণ ব্যাপার হইল তাহাদের **ডানা**। ডানা দুইজোড়া এবং তাহা দেহের তুলনায় বড়। আমাদের দেশে এক ফুট ডানাওয়ালা প্রজাপতিও পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রজাপতির ডানার গড়ন ও রঙের নক্সা নানাপ্রকার। ডানায় একপ্রকার চূর্ণ পদার্থ থাকে, আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিলে হাতে লাগিয়া যায়। প্রজাপতি যখন উড়িয়া কোথায়ও গিয়া বসে, তখন উহার ডানাগুলি একত্রিত হইয়া পিঠের উপর পতাকার ন্যায় উঁচু হইয়া থাকে। মথেরা যখন বসে, তখন তাহাদের ডানা শোয়ান থাকে বা একটুখানি মেলিয়া থাকে, প্রজাপতির মত উঁচু হইয়া থাকে না।

অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় প্রজাপতির জীবনেও তিনটি অবস্থা দেখা যায়। **স্ত্রী-প্রজাপতি** পাতায় পাতায় একসঙ্গে অনেক **ডিম** পাড়িয়া যায়। কিছুদিন পরে ডিম হইতে **শূক** বা **লার্ভা** বাহির হয়। প্রজাপতির লার্ভাকে আমরা শুঁয়াপোকা বলি, বলিবার কারণও আছে; সেই সব লার্ভাকে শুঁয়াপোকা বলি, যাহাদের সর্বাঙ্গ এক প্রকার লম্বা লোমের মত কাঁটার দ্বারা আবৃত থাকে। যে সকল লার্ভার গায়ে শুঁয়া থাকে না, তাহাদের লার্ভা বলিলেই চলিবে। প্রজাপতির লার্ভাকে ইংরেজিতে বলে **ক্যাটার-পিলার** (caterpillar)। গায়ে শুঁয়া থাকার দরুণ কোন শত্রু ইহাদিগকে সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। কোন কোন জাতির শুঁয়াগুলি বিষাক্ত।

শুঁয়াহীন লার্ভা যেরূপ গাছে বাস করে, সেই গাছের রঙ-এর সহিত মিশিয়া যায় এবং সহজেই শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। মথের

লার্ভাদের দেহে শুঁয়া থাকে না। লার্ভার মতন পেটুক আর নাই। প্রথমেই নিজেদের ডিমের খোলাটি খাইয়া ফেলে, পরে গাছের
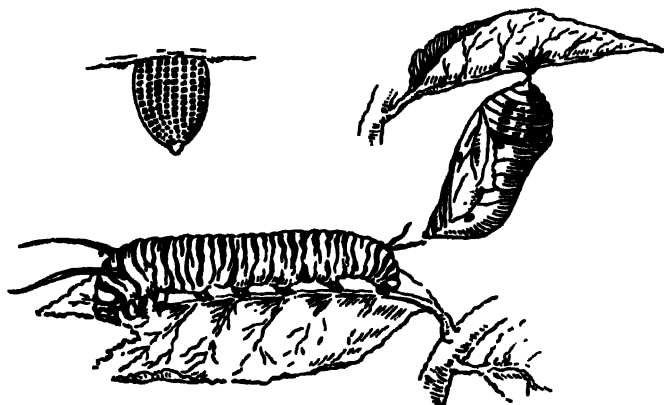
প্রজাপতির ডিম, লার্ভা ও নোলকের মত গুটি

কচি কচি পাতা খাইয়া গাছ উজাড় করিয়া ফেলে। ফলে, আমাদের চাষবাসের যথেষ্ট ক্ষতি করে। গুরুভোজন ও খোলস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে উহাদের দেহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তারপর খাওয়া বন্ধ করিয়া একটি নির্জন নিরাপদ স্থান খুঁজিয়া লইয়া মুখের লালার দ্বারা দেহের চারিধারে একটি রেশমের আবরণ বুনে। ইহাকে **পিউপা** বলে। রেশম মথের পিউপা অর্থাৎ **গুটি** হইতে রেশম সূতা হয়—এই গুটিগুলি আকারে হাঁসের ডিমের মত বড়। ইহাকেই **রেশম-গুটি** (silk cocoon) বলে। এই সকল গুটি বা পিউপা সাধারণত বৃক্ষশাখা হইতে নোলকের মত ঝুলিতে দেখা যায়। স্বকৃত আবরণের

প্রজাপতির পাখা তুলিয়া গাছে বসা

মধ্যে বন্দি বা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকিলেও দেহের প্রচুর পরিবর্তন হয়। ধীরে ধীরে পিতামাতার আকৃতি পাইতে থাকে। দেহের সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হইলে, গুটি বা পিউপা আবরণ কাটিয়া **পূর্ণাঙ্গ** প্রাপ্ত পতঙ্গরূপে বাহির হইয়া আইসে এবং কিছু পরে উড়িয়া যায়। রেশম-পোকার গুটির ভিতর হইতে পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি বাহির হইবার পূর্বে, মুখ হইতে এক প্রকার লালা নিঃসৃত করে, যাহার ফলে রেশম-গুটি নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা ব্যবসা করে, তাহারা গুটি কাটিবার পূর্বেই উহাকে গরমজলে ডুবাইয়া ভিতরের গুটি-পোকাকে মারিয়া ফেলে।

প্রশ্নমালা

(১) প্রজাপতি ও মথের প্রভেদ কি ?

(২) প্রজাপতি কিরূপে ফুলের মধু খায় ?

(৩) প্রজাপতির জীবনচরিত বুঝাইয়া দাও।

(৪) প্রজাপতির পিউপা ও লার্ভা সম্বন্ধে যাহা জান বল। রেশমগুটি কাহাকে বলে ?

(৫) শুঁয়াপোকা বলিতে কি বুঝ ?

একাদশ অধ্যায়

মাকড়সা

পতঙ্গের যেমন তিন জোড়া করিয়া ছয়টি পা থাকে, মাকড়সার থাকে চারি জোড়া করিয়া আটটি **পা**। বাড়ীর দেওয়ালে, দরজার কোণে, মাঠে, বৃক্ষশাখায়, নানাস্থানে বিভিন্ন জাতির মাকড়সা ও তাহার জাল দেখা যায়।

পতঙ্গের দেহ তিনভাগে বিভক্ত, মাকড়সার দেহ মাত্র দুইভাগে বিভক্ত। ইহার কারণ, **মাথা** ও **বুক** মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে এবং পিছনে আছে **উদর** বা **পেট**। ইহাদের দেহ ক্ষুদ্র রোমে আবৃত। মাথার উপরে চারিজোড়া করিয়া দুই সারিতে আটটি গোলাকার **চক্ষু**; কোন কোন জাতির ছয়টি চক্ষু। সব চক্ষুগুলির আয়তন ও আকার এক প্রকার নহে। দুই একজোড়া চক্ষু খুব ছোট, সহজে বুঝা যায় না। পতঙ্গের মত, চক্ষুগুলি **পুঞ্জাক্ষি নহে,** সরল। পতঙ্গের মত ইহাদের **অ্যানটেনা** বা **শুঙ্গ** নাই। ইহাদের মুখ সহজে দেখা যায় না। মুখের দুইধারে বড় বড় দুইটি দন্তযুক্ত কামড়াইবার যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রের সামনে, মোড়া যায় এমন একটি সূচ্যগ্র লম্বা **বিষদাঁত** আছে। এই দাঁতের মধ্যে ছিদ্র আছে, তাহা দিয়া বিষ বাহির হইয়া আসে। কোন প্রাণীকে ধরিয়া কামড়াইয়া ঐ
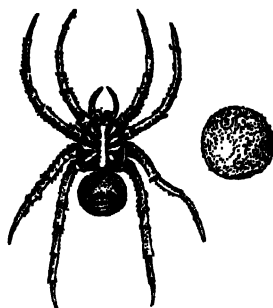
মাকড়সা ও তাহার ডিম

বিষদাঁত তাহার শরীরে ফুটাইয়া দিয়া বিষ ঢালিয়া দেয়। তখন ঐ প্রাণী প্রথমে অসাড় হইয়া পরে মরিয়া যায়। মরিয়া গেলে তাহার রস চুষিয়া খায়। এই মুখযন্ত্রের পাশে আর দুইটি পায়ের মত যন্ত্র থাকে। তাহার দ্বারা মাকড়সা খাবার জিনিষ ধরিতে সাহায্য পায়। এই যন্ত্রের অগ্রভাগ পুরুষ-মাকড়সায় গদাকার; স্ত্রী-মাকড়সায় সরু কাঠির মতন।

মাকড়সার **উদর** নানা রকমের হয়, সাধারণত ডিম্বাকার। উদরের নিম্নদিকে পশ্চাতে একস্থানে চারিটি বা ছয়টি নাতিউচ্চ মাংসপিণ্ড আছে, ইহাই ইহাদের **জালবুনন** যন্ত্র।

মাকড়সার পেটের নীচে **শ্বাসকার্য** চালাইবার জন্য এক প্রকার গঠন আছে। ইহাকে ইংরেজিতে **লাঙ-বুক** (lung-book) কহে। বই-এর পাতার ন্যায় ইহাতে অনেকগুলি ছোট ছোট পাতা আছে। বায়ুর অক্সিজেন ঐ পাতার রক্তের দ্বারা শোষিত হইয়া শরীরে চালিত হয় এবং দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড বাহির হইয়া যায়।

পুরুষ-মাকড়সা স্ত্রী অপেক্ষা আকারে ছোট। পুং-মাকড়সা নানা বর্ণের হয় বলিয়া, তাহাকে খুব সুন্দর দেখায়, **স্ত্রীগুলি** দেখিতে সুন্দর হয় না। সাধারণত আমরা স্ত্রী-মাকড়সাই বেশি দেখিতে পাই।

মাকড়সা এক প্রকার জাল বুনিয়া থাকে। ইহাদের জাল বুনন কার্য বিচিত্র। পতঙ্গ প্রভৃতি শিকার ধরিবার জন্যই বোধ হয় ইহারা জাল বুনিয়া থাকে। জাল-বুনন যন্ত্র হইতে এক প্রকার রস বাহির করে, সেই রস কোন স্থানে লাগাইয়া দিয়া টানিতে থাকে। ঐ রস সূতার ন্যায় ক্রমে দীর্ঘ হইয়া পড়ে এবং বাতাসের সংস্পর্শে শুকাইয়া কঠিন হইয়া যায়। এইরূপে রস বাহির করিয়া সূতা টানিয়া বুনিয়া জাল প্রস্তুত করে। মধ্যস্থলে বসিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রকার বোনা জাল থাকে। মাকড়সা অনেক সময়ে কোন হতভাগ্য উড়ন্ত পতঙ্গের জালের মধ্যে আটকাইয়া যাইবার অপেক্ষায়, ঐ মাঝের বুনা-জালের

মধ্যে বসিয়া থাকে, অথবা জালের প্রান্ত বা কিছুদূরে গিয়া বসে। পায়ের সঙ্গে রাখে জালের একগাছি সূতা—শিকার জালে পড়িলেই ঐ সূতা টেলিগ্রামের তারের মতন সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যায়। মাকড়সা তখন ছুটিয়া গিয়া শিকার ধরে। সব সময়েই যে জাল বুনিয়া ইহারা
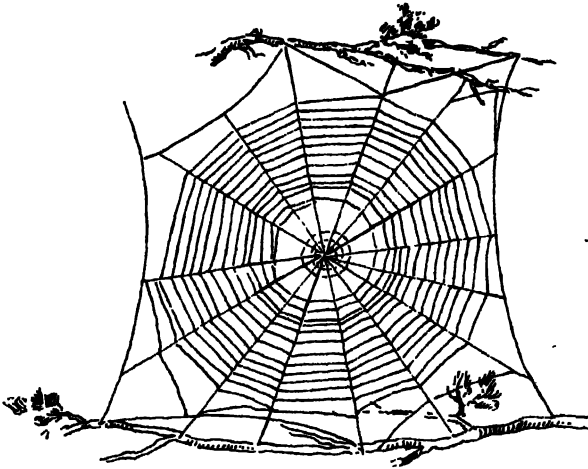
মাকড়সার জাল

শিকার ধরিয়া থাকে, তাহা নহে। সময় সময় শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িয়া শিকার মারিয়া ফেলে। আমাদের দেশে এমন বড় মাকড়সা আছে, যাহারা মাছ ও ইঁদুর পর্যন্ত ধরিয়া খাইতে পারে। ইহাদের জাল বুনিবার কৌশল হইতে আরম্ভ করিয়া শিকার ধরা পর্যন্ত, প্রচুর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

মাকড়সার **ডিম** সাধারণত একটি থলির মধ্যে থাকে। থলি সিল্কের এবং জাতি বিশেষে বিভিন্ন প্রকারের হয়। যতদিন পর্যন্ত না বাচ্চা

বাহির হয়, ততদিন পর্যন্ত ডিম এই থলির মধ্যে রক্ষিত হয়। কতকগুলি স্ত্রী-মাকড়সা ডিমের থলি উদরে সংলগ্ন করিয়া বহন করিয়া বেড়ায়। কয়েক জাতির মাকড়সা জালে থলি ঝুলাইয়া রাখে। বাড়ির দেওয়ালে
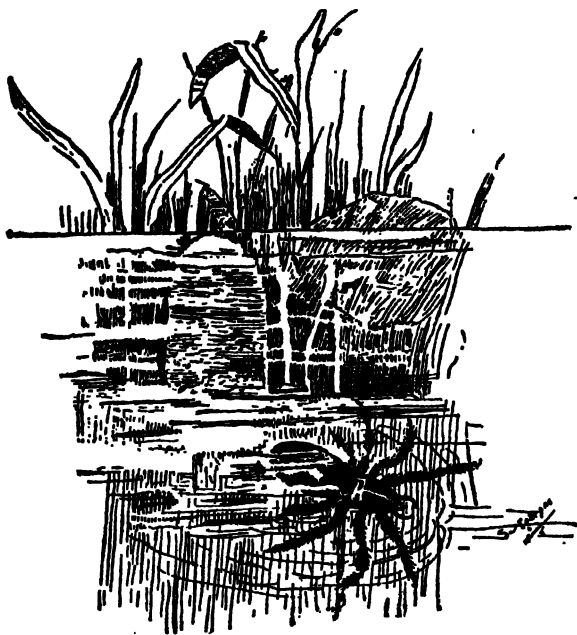
জলের মাকড়সা

গোলাকার ডিমের থলি অনেক দেখিয়াছ। ডিম হইতে ফুটিয়া যে বাচ্ছা বাহির হয়, তাহারা আকৃতি ও গঠনাদিতে পিতামাতারই মতন, শুধু আকারে ছোট। পতঙ্গের মতন ইহাদের জীবনেতিহাসে

রূপান্তর নাই, তবে মাঝে মাঝে খোলস ত্যাগ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

জলের মাকড়সা (water spider)—মাকড়সা যে পোকা হইতে অন্য রকমের প্রাণী, তাহা তোমরা জান। মাকড়সা ডাঙ্গার প্রাণী ও সাক্ষাৎভাবে বায়ু হইতে শ্বাসগ্রহণ করে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, মাকড়সা শ্রেণীরও কয়েক রকমের মাকড়সা জলের প্রবাসী হইয়াছে। ইহারা পুকুরের জলোঘাস ও গাছে, **সূতার এক ক্ষুদ্র তাঁবু গাঁথিয়া লয়।** উহা দেখিতে দর্জির অঙ্গুলি-ত্রাণের মত। ছবিতে তোমরা ইহার প্রতিকৃতি দেখ। জলের নীচের ঘাস প্রভৃতির ভিতর খুঁজিলে ঐ তাঁবু দেখিতে পাইবে। এই আবাস গৃহের আচ্ছাদন এত ঘন যে, উহার ভিতর হইতে কোনরূপে বায়ু বাহির হইতে পারে না। এই আবাসে আস্তরণ দেওয়া হইয়া গেলে পর, মাকড়সা জলের উপরে উঠিয়া চিৎ হইয়া ভাসিয়া তাহার পা জলের উপর তুলিয়া ধরে। তাহার পাগুলি রোমে আবৃত। পায়ের রোমে বাতাস আটকাইয়া সে তাড়াতাড়ি তাঁবুর নীচে গিয়া পায়ের রোমে আটকান বায়ু ছাড়িয়া দেয় এবং এইরূপ বায়ুতে গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়।

প্রশ্নমালা

(১) পতঙ্গের সহিত মাকড়সার প্রভেদ কি ?

(২) মাকড়সার জাল-বুননের বিষয় বর্ণনা কর। ঐ জাল তাহাদের কি প্রয়োজনে আইসে ?

দ্বাদশ অধ্যায়

মাছ

মাছ নানা প্রকার। সমুদ্রে, নদীতে, পুকুরে ও অন্যান্য জলাশয়ে যে কত প্রকার মাছ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমাদের দেশের কতকগুলি ছোট ও বড় মাছের নাম দিতেছি। যথা রুই, কাতলা, মিরগেল, ইলিস, ভেটকি, খয়রা, বোয়াল, চেতল, পুঁটি, টেঙ্গরা, পায়রা-চাঁদা, মৌরলা, শিঙ্গি, মাগুর, কই ইত্যাদি।
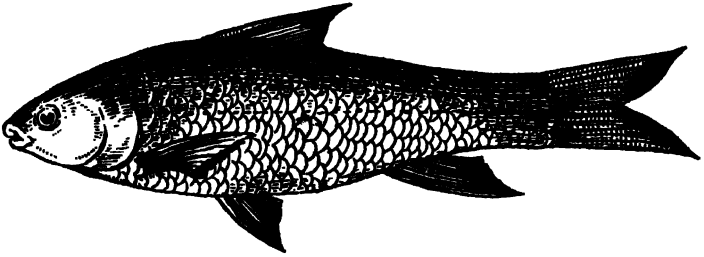
রুই

পাখির যেমন পালক থাকে, বিড়াল কুকুরের যেমন লোম থাকে, মাছের সেইরূপ আঁশ থাকে। আঁশই ইহাদের শরীরের একমাত্র আবরণ। আঁশগুলি খোলাবাড়ীর ছাতের খোলার ন্যায় মাছের গায়ে একটির উপর একটি সাজান থাকে। আঁশের উপর এক রকম তৈলাক্ত পদার্থ মাখান থাকে; সেইজন্য ইহাদের দেহ পিচ্ছিল, সহজে কেহ ধরিতে পারে না। মাগুর, শিঙ্গি, টেঙ্গরা প্রভৃতি মাছের আঁশ নাই, কিন্তু ইহাদের দেহেও ঐরূপ তৈলাক্ত পদার্থ মাখান থাকে।

মাছের মাথার উপর দুই পার্শ্বে দুই **চক্ষু**, মাথার দুই পার্শ্বে কানকো দিয়া ঢাকা শ্বাসযন্ত্র **ফুলকা**, ও দেহের বিশেষ বিশেষ স্থানে পাখনা থাকে। এই পাখনা সাহায্যে মাছ জলে সাঁতরাইতে পারে। মাছ মাত্রেরই জোড়া পাখনা (paired fins) থাকে। লেজের পাখনা সাঁতরাইবার সময় হালের কাজ করে ও অন্যান্য পাখনা দাঁড়ের কাজ করে। মাছের **পটকা** তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। ইহা সর্বদা এক প্রকার বাষ্পে পূর্ণ থাকে। সেইজন্য এই পটকার সাহায্যে ইহারা ইচ্ছামত জলে ভাসিতে, চলাফেরা করিতে, উঠিতে ও নামিতে পারে। মাছের দেহে কানকো হইতে আরম্ভ করিয়া লেজ অবধি দুইটি লম্বা রেখা দেখা যায়। এই রেখা দুইটিকে ইংরেজিতে lateral line sense organ বলে। এই রেখা দ্বারা মাছ স্পর্শ অনুভব করে। মাছ সাধারণত পুকুরের বা নদীর শেওলা, পাঁক ইত্যাদি খায়। ছোট ছোট প্রাণী, বাচ্চা মাছ, এবং নিজের ডিমও কোন কোন মাছের খাদ্য।

স্ত্রী-মাছেরা ডিম পাড়ে এবং **পুরুষ-মাছ** আসিয়া সেই ডিমের উপর এক প্রকার রস ছড়াইয়া দিয়া যায়। ইহার পর কেহই সেই সমস্ত ডিমের খোঁজ করে না। একটি বড় মাছের পেটে ৮।১০ লক্ষ ডিম হইতে পারে। ডিমের অর্ধেক প্রায় নিজেরা বা অন্য কোন মাছ খাইয়া ফেলে। বাকিগুলি অবশেষে ২।৩ সপ্তাহ পরে ফুটিয়া ছোট ছোট বাচ্চায় পরিণত হয়।

ভেটকি মাছ

ভেটকি মাছের গাত্র আঁশ দিয়া ঢাকা। ইহার দেহ, মুখ ও লেজের দিক অপেক্ষাকৃত সরু এবং দুইপাশে অপেক্ষাকৃত চাপা। মস্তকে দুই চক্ষু, চক্ষুতে পাতা নাই; নাকের গর্ত শ্বাসকার্যের সাহায্য না করিয়া আঘ্রাণের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার পিঠে দুইখানি পাখনা, লেজে একখানি পাখনা, মলনালির পিছনে একখানি পাখনা, বক্ষোদেশের

দুইধারে কানকোর নীচে দুইখানি পাখনা এবং পেটের দুইধারে দুইখানি পাখনা অর্থাৎ সবশুদ্ধ আটখানি পাখনা আছে। লেজের পাখনা সাঁতরাইবার সময় হালের কাজ করে।
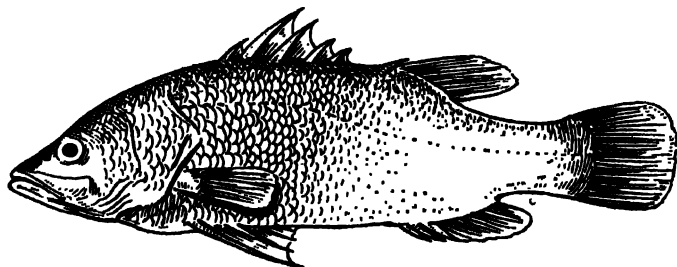
ভেটকি

পৌষ্টিক নালি (alimentary canal)—ভেটকির মুখগহ্বর বড়। এই মুখগহ্বরে জিহ্বা আছে। মুখগহ্বরের শেষভাগের নাম **ফেরিংক্স** (pharynx)। ইহার পরের অংশের নাম **গলনালি** (œsophagus),
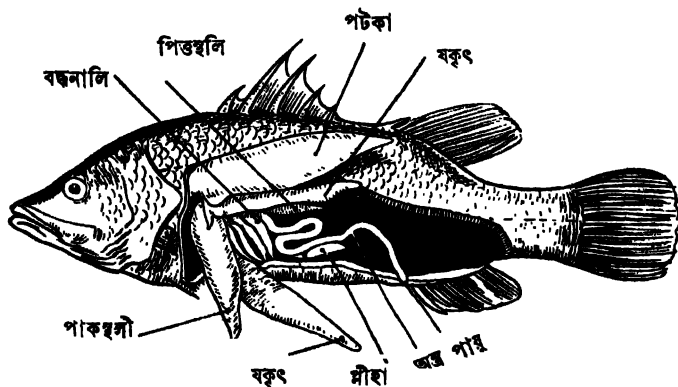
ভেটকি মাছের ভিতরের যন্ত্রসমূহ

ইহার পর পাকস্থলী বা **আমাশয়** (stomach)। পাকস্থলীর একধার হইতে দীর্ঘ **অন্ত্র** (intestines) বাহির হইয়া **পায়ুতে** (anus) শেষ

হইয়াছে। মুখবিবর হইতে আরম্ভ হইয়া পায়ুতে যে নালি শেষ হইল, তাহার নাম **পৌষ্টিক নালি**। পাকস্থলীর দুইধারে লম্বা দুই **যকৃৎ** (liver) থাকে। অন্ত্র যেস্থল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থলে পাঁচটি ছোট **পাইলরিক সিকা** বা বদ্ধনালি (pyloric cœca) আছে। দুইটি যকৃতের মাঝে **পিত্তস্থলি** (gall bladder) অবস্থিত।

রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র (circulatory system)—পেট কাটিলে যে লাল যন্ত্র দেখা যায়, তাহার নাম রক্তসঞ্চালন যন্ত্র বা **হৃদয়** (heart)। এই হৃদয় দুইভাগে বিভক্ত, নীচের ভাগ **অরিকল** (auricle) এবং উপরের ভাগ নিলয় বা **ভেণ্ট্রিকল** (ventricle)। ভেণ্ট্রিকলের উপরে **ধমনী** (ventral aorta), অরিকলের নীচে **সাইনস ভিনোসস** (sinus vinosus)।

ইহাদের হৃদয়ে দূষিত রক্ত থাকে, সেই দূষিত রক্ত ধমনী দিয়া দুই পাশের ফুলকায় নীত হয় এবং তথায় জলের অক্সিজেন সেই রক্তের সহিত মিশিয়া তাহাকে বিশুদ্ধ করিয়া সর্বশরীরে চালিত করে। আবার শরীরের অন্যান্য স্থান হইতে দূষিত রক্ত শিরা দিয়া আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে। শিরা ও ধমনীর সংযোগ স্থলে **সূক্ষ্মজাল** (capillaries) আছে। হৃদয়ের অরিকলের ভিতরে এক **ভাল্‌ভ** বা কপাটিকা (valve) এবং ভেণ্ট্রিকলের ভিতর আর এক ভাল্‌ভ আছে। এই দুই ভাল্‌ভ সাহায্যে রক্ত একদিকে চালিত হয়, হৃদয়ের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পায় না। হৃদয় অনবরত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতেছে। এই সঙ্কোচন ও প্রসারণ বলে রক্ত সর্বাঙ্গে চলাচল করে। রক্তের তরল অংশের নাম **প্লাজমা** (plasma)। এই প্লাজমায় দুই প্রকার কঠিন কণিকা ভাসমান। এক প্রকার কণিকার রঙ লাল, অপর প্রকার কণিকার রঙ সাদা। লাল কণিকার ইংরেজি নাম **রেড করপাসকল** (red corpuscle), আর সাদা কণিকার নাম **হোয়াইট করপাসকল** (white corpuscle).

শ্বাসতন্ত্র (respiratory system)—শ্বাসকার্য ফুলকা দ্বারা সম্পাদিত হয়। কারণ মাছের সাধারণত ফুসফুস (lungs) থাকে না। ইহাদের মাথার দুই পার্শ্বে দুইটি কানকো (operculum) আছে। ঐ কানকো খুলিলে উহার ভিতর লাল ফুলকা দেখা যায়। বাঁকা চিরুনির মত দুইপার্শ্বে ৪টি করিয়া ৮টি ফুলকা থাকে। ফুলকাগুলির মধ্যে অনেক রক্তনালি থাকায় তাহাদিগকে ঐরূপ লাল দেখায়।

শ্বাস গ্রহণের সময় ইহারা মুখের মধ্যে খানিকটা জল টানিয়া লয়। ঐ জলে অক্সিজেন মিশ্রিত থাকে। জল টানিবার সময় উহাদের কানকো দুইটি বন্ধ থাকে। তারপর উহারা মুখ ও গলা বন্ধ করিয়া মুখগহ্বরের তলদেশ উঁচু করে; ইহাতে মুখগহ্বরটি ছোট হইতে থাকে এবং ভিতরের জলে খুব চাপ পড়ে, ঐ চাপের ফলে ভিতরের অক্সিজেন মিশ্রিত জল ফুলকার মধ্যে চলিয়া যায় এবং কানকোও তখন খুলিয়া যায়। তখন জলের মধ্যে যে অক্সিজন থাকে, উহা ফুলকার ভিতরের রক্তনালির দ্বারা শোষিত হয় (absorbed) এবং ঐ রক্তের দ্বারা অক্সিজেন সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হয় এবং পূর্বের দূষিত রক্তের কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলের সহিত মিলিত হইয়া কানকো দিয়া বাহির হইয়া যায়।

রুই, কাতলা, পারশে, বাটা প্রভৃতি মাছ ভেটকি মাছের মতই ফুলকা দ্বারা শ্বাসকার্য করে। কিন্তু মাগুর, শিঙ্গি ও কই মাছের ফুলকা থাকা সত্ত্বেও, তাহারা অন্যান্য উপায়ে জলের বাহিরে ডাঙ্গাতে শ্বাসকার্য চালাইতে পারে। ঐরূপভাবে শ্বাসকার্য চালাইবার জন্য ইহাদের শরীরের ভিতর বিভিন্ন রকমের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে। ফুলকার দ্বারা ইহারা আংশিকভাবে শ্বাসকার্য চালাইলেও, সর্বদাই অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র ঐ কার্যে ব্যবহার করে। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এই রকম মাছ জলের উপর আসিয়া বাতাস মুখে পুরিয়া আবার জলে নামিয়া যায়। কই মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র ঠিক ফুলকার উপরেই

অবস্থিত এবং দেখিতে একটি ফুটন্ত ফুলের পাপড়ির মত। শিঙ্গি মাছের ফুলকার পিছনে দুইটি বায়ুনলের মতন গঠন আছে। তাহার মধ্যে বাতাস ভরিয়া লয়। মাগুর মাছেও অনেকটা কই মাছের মত অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র আছে।
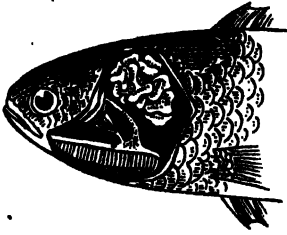
কই মাছের ফুলকার উপর অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র
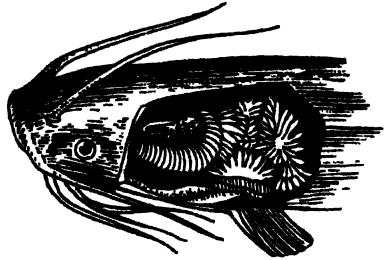
মাগুর মাছের ফুলকার পাশে অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র

শিঙ্গি মাছের বায়ুনলের ন্যায় অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র
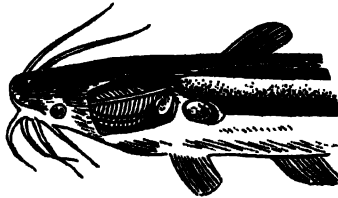
অস্থিতন্ত্র (skeletal system)—মাছের মস্তক বা মুড়া অস্থি নির্মিত। মানুষের খুলির সহিত উহার তুলনা করা যাইতে পারে। মাছের পিঠে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া আছে। এই শিরদাঁড়া কতকগুলি কশেরুকা (vertebra) দ্বারা গঠিত। ইহা ছাড়া ইহাদের আরও কতকগুলি অস্থি থাকে।

রেচন তন্ত্র (excretory system)—শিরদাঁড়ার সম্মুখের দিকে দুইধারে দুইটি লম্বা চকলেট রঙের **বৃক্ক** (kidney) আছে। প্রত্যেক

বৃক্কের শেষভাগ হইতে এক একটি পাতলা নল বাহির হইয়া অল্প দূরে সম্মিলিত হইয়া পায়ুতে উপস্থিত হয়। ঐ নলের মধ্য দিয়া প্রস্রাব পায়ু দিয়া বাহির হইয়া যায়।

প্রশ্নমালা

(১) ভেটকি মাছের বহিরাকৃতি বর্ণনা কর। ইহাদের রক্ত-সঞ্চালন যন্ত্র সম্বন্ধে যাহা জান বল।

(২) মাছের শ্বাসকার্য বর্ণনা কর।

(৩) কই, মাগুর ও শিঙ্গি মাছ ডাঙ্গায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে কেন?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্যাঙ

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে ব্যাঙ যে শ্রেণীর অন্তর্গত, তাহাকে **উভচর শ্রেণী** (amphibious) কহে। উভচর এইজন্য বলা হয় যে, ইহারা জলে এবং স্থলে উভয় স্থানেই বাস করে। জলচর অবস্থায় ইহাদের থাকে মাছের ন্যায় ফুলকা এবং স্থলচর অবস্থায় ইহাদের ফুসফুস থাকে। ইহাদের জীবনের এক অবস্থায় প্রায় প্রত্যেক জাতির ব্যাঙই জলচর; সেইটি হইল ইহাদের ব্যাঙাচি অবস্থা। ব্যাঙাচি অবস্থায় ইহারা কতকটা সময় মাছের মতন ফুলকা দ্বারা নিশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। পরে ফুসফুস উৎপত্তি লাভ করিলে, দুই-এরই ব্যবহার করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে নানা জাতির ব্যাঙ পাওয়া যায়। এক বাংলা দেশে ৭।৮ জাতির ব্যাঙ দেখা যায়। যে দুইটি ব্যাঙ আমরা সাধারণত দেখিতে পাই, সেই দুইটি ভারতবর্ষের অতি সাধারণ ব্যাঙ। একটিকে বলি **কোলা ব্যাঙ** বা **সোনা ব্যাঙ,** আর একটিকে বলি **খসখসে** বা **কুনো ব্যাঙ**। গেছো ব্যাঙও খুব সাধারণ, কিন্তু আমরা সচরাচর ইহাদিগকে দেখিতে পাই না। গেছো ব্যাঙের অঙ্গুলীর অগ্রভাগের গঠন চক্রাকার। তাহার সাহায্যে ইহারা গাছে উঠিতে পারে।

সোনা ব্যাঙ সাধারণত জলে থাকে, তবে সময় বিশেষে ইহাদিগকে জলাশয়ের নিকটবর্তী ডাঙ্গায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

কোলা বা সোনাব্যাঙ

সোনা ব্যাঙ বা কোলা ব্যাঙ আকারে খুব বড়। ইহাদের গায়ের রঙ দুই প্রকার—যে অংশ মাটির দিকে থাকে তাহা হলুদ বর্ণের, অনেকটা কাঁচা সোনার রঙ, বোধ হয় এইজন্যই ইহার এক নাম সোনা ব্যাঙ। পিঠের দিকে কাল চাকা চাকা দাগ থাকে—অনেকটা বাঘের গায়ের

কাল ডোরা দাগের মতন। সোনা ব্যাঙের ত্বক মসৃণ এবং সর্বদাই ভিজা ভিজা, হাতে ধরিলে পিছলাইয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশি। ত্বক হইতে ঘামের মতন পিচ্ছিল রস বাহির হইয়া সর্বদাই দেহটাকে আর্দ্র রাখে। একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, পিঠের ত্বক কয়েকটি লম্বা সারিতে কুঞ্চিত। পিঠের মাঝখান দিয়া একটি হলদে লাইন দেখা যায়। ইহাই ইহাদের বিশেষত্ব, অন্য জাতীয় ব্যাঙে ইহা দেখা যায় না।

কুনো ব্যাঙ স্থলচর। বৃক্ষকোটরে, মাটির নীচে, ঝোপে ঝাড়ে, নানাস্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। জলাশয়ে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা আকারে বেশ বড়। ইহাদের কুৎসিৎ চেহারার জন্য কেহই ইহাদিগকে পছন্দ করে না। ইহাদের

কুনো বা খসখসে ব্যাঙ
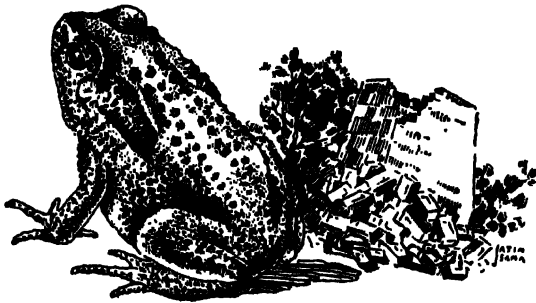
ত্বক মসৃণ ত নয়ই, বরং খসখসে। উপরন্তু সর্বশরীর আঁচিলের মত গুল্মে ভরা। পিঠের উপরকার গুল্মগুলি বড়, ইহা হইতে এক প্রকার বিষাক্ত রস বাহির হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই বিষাক্ত রসের জন্য শিকারী কুকুর ইহাদিগকে মুখে করিয়া কামড়াইবামাত্র ছাড়িয়া দিতে পথ পায় না এবং খুব কাসিতে থাকে। ইহারা নানা রঙএর হয়।

সোনাব্যাঙের এক জাতভাই সর্বদাই নালা, ডোবা, পুকুর, ধানক্ষেত ইত্যাদি নানাপ্রকার জলাশয়ে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ইহাদের দিকে অগ্রসর হইলে, ইহারা জলের উপর দিয়া ছ্যাড়-ছ্যাড় শব্দ করিয়া গিয়া দূরে ডুব দেয়; কিছুক্ষণ পরে জলের উপর নাকটি উঠাইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে। বোধ হয় এইজন্যই বাংলাদেশের লোকেরা ইহাদিগকে "ছ্যাড়-ছ্যাড়" ব্যাঙ বলে। ইহারা আকৃতিতে বেশি বড় হয় না।

সোনাব্যাঙের শরীরে দুইটি ভাগ দেখা যায়। **মস্তক** বা **মাথা** এবং **দেহকাণ্ড**। ইহাদের ঘাড় নাই, লেজও নাই। ঘাড় নাই বলিয়া দুই পার্শ্বে কিছু দেখিতে হইলে, সমগ্র দেহটি ঘুরাইয়া দেখিতে হয়। মস্তকের অগ্রভাগে ছুঁচল চোখ দুইটি বড়। চোখের উপর পাতা বড়, নীচের পাতা নাই বলিলেই হয়, তবে একটি তৃতীয় পাতা আছে, তাহার দ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া রাখে। চক্ষুর পিছনে পাতলা চামড়া দিয়া ঢাকা যে গঠনটি দেখা যায়, তাহাকে **কর্ণপটহ** কহে। ইহাদের মুখের হাঁ মস্ত বড়। মস্তকাগ্রে দুইটি নাসারন্ধ্র আছে। তাহার মধ্য দিয়া শ্বাস-ক্রিয়ার জন্য বাতাস যাতায়াত করে। ইহাদের সামনের পা ছোট এবং তাহাতে **চারিটি** করিয়া অঙ্গুলি আছে। পিছনের পা বেশ লম্বা এবং তাহাতে **পাঁচটি** করিয়া অঙ্গুলি এবং সেই অঙ্গুলিগুলি হাঁসের মতন ত্বক দিয়া জোড়া। পিছনের পা জলে সাঁতরাইতে সাহায্য করে। পিছনের পা বড় বলিয়া ইহারা বেশ বড় বড় লাফ দিতে পারে।

কুনোব্যাঙের মুখ থ্যাবড়া এবং উপর-নীচ চ্যাপ্টা। মস্তক সমতল নয়। মস্তকের উপর কাল কাল শক্ত হাড়ের উঁচু লাইন (ridge) দেখা যায়। ইহাদের কর্ণপটহের পিছনে শিমের বীচির মত দুইটি গঠন দেখা যায়। ইহা হইতে প্রচুর বিষাক্ত রস নির্গত করিতে পারে এবং পিচকারির মত

দূরে নিক্ষেপ করিতে পারে। ইহাদের পিছনের পা সম্মুখের পা হইতে বেশি বড় নহে। ইহারা খুব বেশি লাফাইতেও পারে না। থপ্ থপ্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। দৌড়াইয়া লাফাইয়া পালাইতে ইহারা অক্ষম। অন্যান্য ব্যাঙের ন্যায় পিছনের পায়ের অঙ্গুলিগুলি চর্ম দ্বারা পূর্ণ-যুক্ত নহে। ইহারা একটু আধটু মন্দ সাঁতার দিতে পারে না।

ব্যাঙে পোকা-মাকড়, কেঁচো ইত্যাদি ধরিয়া খায়। মৃত প্রাণী স্পর্শ করিতে চাহে না, তবে মৃত পতঙ্গাদি ধরিয়া সম্মুখে নাড়িলে, তাহা জীবিতজ্ঞানে খাইয়া ফেলে। সোনাব্যাঙ সর্বভুক, এমন কি নিজেদের জাতভাইদিগকে খাইয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হয় না। ছোট কুনোব্যাঙও ইহারা খাইয়া থাকে। শামুক, গুগলি ইহাদের অপ্রিয় খাদ্য নহে। কুনোব্যাঙ, কেঁচো পতঙ্গাদি বেশি খাইয়া থাকে—অনেক সময়ে কৃষিক্ষেত্রে অনুপকারী পতঙ্গ খাইয়া কৃষকের উপকার করে। কোন কোন স্থানের কৃষিক্ষেত্রে ইহাদিগকে পুষিয়া রাখা হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, আমরা ব্যাঙের নিকট হইতে কিছু উপকার পাই।

ব্যাঙের জিহ্বা একটু ভিন্নপ্রকৃতির। আমাদের জিহ্বা যেমন পিছনে আটকান থাকে, ব্যাঙের তেমনি সম্মুখে লগ্ন থাকে। উহারা জিহ্বাদ্বারা পতঙ্গাদি ধরিয়া খায়। জিহ্বা উল্টাইয়া বাহির করিয়া দেয় এবং তাহা চটচটে হওয়ার দরুণ হতভাগ্য পতঙ্গের গায়ে পড়িলে পতঙ্গ আটকাইয়া যায় এবং নিমেষমাত্রে মুখের ভিতর শিকার ঢুকাইয়া লয়। কেঁচো খাইবার সময় ইহারা সম্মুখের পা ব্যবহার করে। সোনাব্যাঙের **উপর-পাটিতে দাঁত আছে।** নীচের পাটিতে নাই। কুনোব্যাঙের কোন পাটিতেই দাঁত নাই।
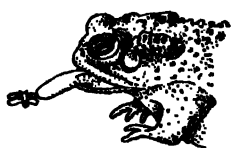
জিহ্বা দ্বারা পোকা ধরিবার প্রণালী

ব্যাঙের নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালী বড়ই মজার। মুখ বন্ধ করিয়া নাকের মধ্য দিয়া নিশ্বাসগ্রহণ করে। গলা ফুলাইয়া বাতাস মুখগহ্বরে জমা করে। পরে নাসারন্ধ্র বন্ধ করে এবং ঢোঁক গেলার মত করিলে মুখের গর্ত ছোট হয়, ফলে মুখের ভিতরের বাতাসে চাপ পড়ে এবং সেই চাপে নিশ্বাসবায়ু ফুসফুসে চলিয়া যায়। প্রশ্বাসের সময়ও ইহারা গলা ফোলায় এবং ফুসফুসে চাপ দিলে, মুখের গর্তে বাতাস সহজেই আসিতে পারে এবং নাসারন্ধ্র খোলা থাকিলে বায়ু প্রশ্বাসিত হয়। এইপ্রকার উপায়ে ইহারা শ্বাস-ক্রিয়া চালায়। তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ যে, ব্যাঙ মুখ বন্ধ না করিলে, নিশ্বাস গ্রহণ বা প্রশ্বাস বাহির করিয়া দিতে পারে না। ব্যাঙের মুখ হাঁ করাইয়া রাখিলে অথবা কণ্ঠদেশ ফুটা করিয়া দিলে, ব্যাঙের শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়া ব্যাঙ মরিয়া যায়। তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবে যে, ব্যাঙের কণ্ঠদেশ অধিকাংশ সময়ে ওঠা-নামা করিতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে ইহাদের শ্বাসকার্য চলিতেছে। ব্যাঙ যে শরীর ফোলায় কেমন করিয়া, বোধ হয় তোমরা জান না। প্রচুর বাতাস ফুসফুসের মধ্যে লইয়া ইহারা শরীর ফোলায়—তবে ফাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ যে কোন মুহূর্তে সব বাতাস একসঙ্গে বাহির করিয়া দিতে পারে।

ইহাদের রক্ত শীতল, পাখি বা আমাদের মত গরম নহে। সেইজন্য ইহাদিগকে **শীতল-শোণিত** (cold-blooded) প্রাণী কহে। শীতকালে ইহারা **শীত-ঘুমে** ব্যস্ত থাকে। কারণ একেই ইহাদের রক্ত শীতল, তাহার উপর বাহিরের শীতাধিক্য ইহারা সহিতে পারে না।

ব্যাঙের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। **পুরুষ-ব্যাঙ, স্ত্রী-ব্যাঙ** হইতে অপেক্ষাকৃত ছোট। বর্ষাকালে আমরা দিনে পুকুর পাড়ে, বা জলাশয়ে যে সুমধুর কনসার্ট শুনিয়া থাকি, তাহা এই পুরুষ-ব্যাঙ দ্বারা গীত হয়। তোমরা পুরুষ সোনাব্যাঙের গলার দুইপার্শ্ব দিয়া বেলুনের

মত দুইটি ফোলা জিনিষ দেখিয়া থাকিবে, উহাকে **স্বর-স্থলী** কহে। উহার মধ্যে বাতাস ভরিয়া লইয়া উহাদের গলার স্বরকে অনুরণিত করে। কুনোব্যাঙের স্বরস্থলী পাতলা ও কাল ত্বক দিয়া ঢাকা থাকে। আমাদের দেশের কোলাব্যাঙের ডাক ষাঁড়ের মতন গম্ভীর বলিয়া, ইংরেজেরা উহাদিকে **বৃষ-ব্যাঙ** (bull-frog) বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে।

ব্যাঙের জীবনেতিহাস বড়ই মুগ্ধকর। পতঙ্গের মতন ইহাদের জীবনেতিহাসে রূপান্তর সম্পূর্ণরূপে দৃষ্ট হয়। ডিম হইতে যে বাচ্ছা ফুটিয়া বাহির হয়, তাহা ব্যাঙের আকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং এই বাচ্ছা বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে দিয়া পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়।

যেসকল ব্যাঙে ডিম পাড়িবে, তাহাদিগকে বেশ মোটা-সোটা দেখায়। বর্ষাকালে স্ত্রী-ব্যাঙেরা **ডিম** পাড়ে। ইহারা সাধারণত জলে ডিম পাড়ে। কুনোব্যাঙেরা যেখানে একটু জল পায়, সেইখানেই ডিম পাড়ে। সোনাব্যাঙ সাধারণত একটু বড় জলাশয়ে ডিম পাড়িয়া থাকে। সোনা-ব্যাঙের ডিম জলে ছড়াইয়া পড়ে এবং একত্র সংলগ্ন থাকে—অনেকটা সাগুদানা জলে ছড়াইয়া দিলে যেমন দেখিতে হয় সেইপ্রকার। ইহার মধ্যে কাল কাল দানাগুলিই ব্যাঙের ডিম, এই ডিমগুলি জেলির মতন একরূপ পদার্থ দ্বারা একত্র সংলগ্ন থাকে। কুনোব্যাঙের ডিম **সূত্রাকার** এবং তাহাতেও সাদা জেলির মতন পদার্থ থাকে। একটি সূতার মতন নলের ভিতর, অর্ধেক কাল ও অর্ধেক সাদা মটর দানার মত অসংখ্য ডিম থাকে। ইহাদের ডিম্বনল খুব লম্বা দড়ির মতন দেখায় এবং জলজ গাছপালার গায়ে আটকান থাকে। সোনাব্যাঙের ডিমগুলি কুনো ব্যাঙের ডিমের মত কাল নহে। কুনোব্যাঙের ডিম হাতে করিলে হড়হড়ে লাগে। ডিমগুলি জল পাইয়া বেশ ফুলিয়া উঠে এবং জলে ভাসে।

কয়েকদিন পরে ডিম ফুটিয়া বাচ্ছা বাহির হয়। ইহারাই ব্যাঙের **লার্ভা**, অর্থাৎ **ব্যাঙাচি** (tadpole)। ব্যাঙাচির প্রথম অবস্থায় মাথা ও লেজ থাকে। মাথার নিকট মুখের পাশে অতি ক্ষুদ্র দুইটি গোলাকার গঠন থাকে, তাহার সাহায্যে ইহারা জলের মধ্যে পাতায় সংলগ্ন থাকে।
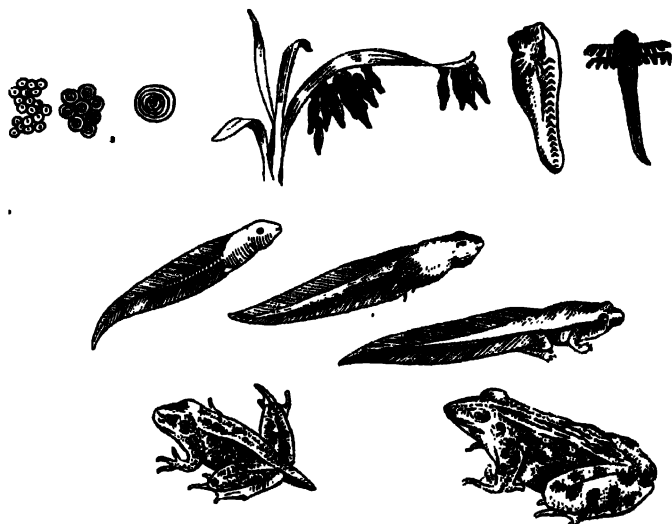
কোলা ব্যাঙের ডিম ও ব্যাঙাচি

এই অবস্থায় মাথার দুই পার্শ্বে ফুলকা বাহিরে ঝুলিতে থাকে এবং মাছের মত ফুলকা দ্বারা জলের মধ্যেই শ্বাসক্রিয়া চালাইতে থাকে। ইহারা মুখ খুলে না এবং কিছু খায় না, কারণ ইহাদের দেহাভ্যন্তরে খাদ্য সঞ্চিত থাকে, তাহা খাইয়া বর্ধিত হয়, এবং লেজ সাহায্যে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়। ক্রমে ব্যাঙাচির ফুলকা চর্মাবৃত হইয়া দেহের ভিতরে চলিয়া যায় এবং দেহপার্শ্বে একটি ছিদ্র রাখিয়া যায়, তাহার মধ্যদিয়া জল

বাহির হইয়া যায়। মুখের উপর-নীচে ওষ্ঠ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে সারি সারি চিরুনীর কাঁটার মতন দাঁত থাকে। পাতার গায়ে সংলগ্ন শেওলা বা জলজ জীব ইত্যাদি কুরিয়া কুরিয়া খাইতে থাকে। আভ্যন্তরীণ ফুলকার দ্বারা শ্বাসক্রিয়া চালায়। লেজ অপেক্ষাকৃত লম্বা হয়। লেজের মধ্যাংশ মাংসখণ্ডে গঠিত এবং তাহার উপর ও নীচের অংশ পাতলা চর্মে আবৃত। সোনাব্যাঙের ব্যাঙাচি কুনোব্যাঙের

কুনো ব্যাঙের ডিম ও ব্যাঙাচি

ব্যাঙাচি অপেক্ষা বড় হয়—বড় হয় ইহার লেজটি প্রধানত। সোনা-ব্যাঙের ব্যাঙাচির লেজ লম্বা ও ছুঁচ'ল এবং গায়ে ছিটেফোঁটা রঙ-এর সমাবেশ থাকে। পেটের দিকটা সাদাটে। কুনোব্যাঙের ব্যাঙাচির লেজ লম্বা হয় না, ইহার শেষভাগ গোলাকার এবং সর্বশরীর কাল। এই অবস্থায় ইহারা প্রায় সম্পূর্ণই মাছের মতন, লেজের দ্বারা সাঁতরাইয়া

বেড়ায় এবং ফুলকার দ্বারা শ্বাসকাজ চালায়। জল হইতে স্থলে রাখিলে অতি অল্পকাল মধ্যেই মরিয়া যায়।

আরও কিছুকাল পরে লেজ ও দেহের সংযোগস্থল হইতে সাদা দুইটি গুল্ম বাহির হয়—ক্রমে ক্রমে ইহা ব্যাঙের পায়ের মতন অবস্থায় পরিণত হয়। ইহাদের সামনের পা বাহিরে দেখা যায় না বটে, কিন্তু দেহাভ্যন্তরে একই সময়ে উৎপত্তিলাভ করে এবং ইহা ফুলকার আবরণ দ্বারা ঢাকা থাকে বলিয়া আমরা দেখিতে পাই না। ইহার মধ্যে পা দুইখানি ভাঁজকরা অবস্থায় থাকে। পূর্ণবয়স্ক ব্যাঙাচির ফুলকা থাকা সত্ত্বেও ফুসফুস গজায়, এইজন্য ইহারা জল হইতে মধ্যে মধ্যে জলের উপরে উঠিয়া আসিয়া একমুখ বাতাস লইয়া জলের নীচে নামিয়া যায় ও ভুড়ভুড়ি কাটে অর্থাৎ ফুসফুস হইতে মুখ দিয়া বাতাস বাহির করিয়া দেয়। এই অবস্থায় ফুলকা ও ফুসফুস উভয় যন্ত্র দিয়াই শ্বাসক্রিয়া চলিতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে ফুলকার কাজ এক ফুসফুস দ্বারা চালিত হইতে থাকে। ফুলকা ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। তারপর উহা একেবারে অন্তর্হিত হয়। তখন ফুলকার আবরণে ঢাকা ভাঁজকরা পা দুখানি বাহির হইয়া আসে, আর ব্যাঙাচি সম্পূর্ণরূপে বায়ুগ্রহণকারী প্রাণী হইয়া চার পায়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় ইহারা পাড়ে আসিয়া চার পায়ে দাঁড়াইয়া শ্বাসকাজ চালায়। অনেকের ধারণা ব্যাঙের লেজ খসিয়া যায়, উহা ভুল ধারণা। দেখা যায় যে, লেজটি ধীরে ধীরে শোষিত হইয়া দেহের পুষ্টিসাধন করিতেছে ও ক্রমে ক্রমে ছোট হইতেছে। লেজ যখনও সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় নাই, সেই অবস্থায় ইহারা ডাঙ্গায় বিচরণ করে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকামাকড় ধরিয়া খাইতে আরম্ভ করে। দুই একদিনের মধ্যে লেজ সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন ব্যাঙাচি ব্যাঙে রূপান্তরিত হয়। পতঙ্গের লার্ভা বা শূকের আকৃতির পরিবর্তন পিউপার ভিতরে হয় বলিয়া আমরা চাক্ষুষ কিছু

দেখিতে পাই না, কিন্তু ব্যাঙের বেলায় আমরা কিছু পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। ইহাই হইল ব্যাঙের রূপান্তর ক্রিয়া বা জীবনের ইতিহাস।

প্রশ্নমালা

(১) কোলা ব্যাঙ ও কুনো ব্যাঙের তফাৎ কি ?

(২) ব্যাঙের শ্বাসকার্য কিরূপে হয় বর্ণনা কর।

(৩) ব্যাঙের জীবন-ইতিহাস বর্ণনা কর।

(৪) ব্যাঙাচি কাহাকে বলে ? ইহার বর্ণনা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর নির্ভরতা

উদ্ভিদ না হইলে প্রাণী বাঁচিতে পারে না, আবার প্রাণী না হইলে উদ্ভিদ বাঁচে না। উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগৎ এইরূপে একসূত্রে বাঁধা। সকল প্রাণীই সাক্ষাৎভাবে অথবা পরোক্ষভাবে উদ্ভিজ্জ খাইয়া জীবনধারণ করে, একথা তোমাদিগকে আগে বলিয়াছি। অন্যদিকে বায়ুর অন্তর্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, উদ্ভিদের খাদ্যের প্রধান উপাদান। উদ্ভিদ এই গ্যাস বায়ু হইতে সংগ্রহ করিয়া, আপন খাদ্য প্রস্তুত করে ও তাহা খাইয়া পুষ্টিলাভ করে। বায়ুতে কিন্তু এই গ্যাসের পরিমাণ অতি অল্প, কাজেই উদ্ভিদের আক্রমণে ইহা শীঘ্রই ফুরাইয়া যাইত। যাহাতে ইহা না ফুরায় তজ্জন্য প্রাণীর সাহায্য অনিবার্য। প্রাণীগণ দিবারাত্র প্রশ্বাসের সহিত অনবরত এই গ্যাস ছাড়িয়া থাকে ও তাহা বায়ুর সহিত মিশ্রিত

হয়, কাজেই এই গ্যাসের মাত্রা বায়ুতে প্রায় অটুট থাকে। এখন বুঝিলে, উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগৎ পরস্পর কিরূপ পরস্পরের উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদ না থাকিলে প্রাণী বাঁচিত না, এবং প্রাণী না থাকিলে উদ্ভিদ বাঁচিত না। তাই উপরে বলিয়াছি, উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ একসূত্রে বাঁধা। এই বন্ধনের তিরোধান হইলে, উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েরই তিরোধান হইত।

উদ্ভিদের বিস্তার জগৎব্যাপী। এ বিস্তারের ব্যবস্থা অতি বিচিত্র। এক গাছের ফল ও বীজ যদি সমস্ত সেই গাছের তলাতেই পড়িয়া অঙ্কুরিত হইত, তাহা হইলে ঐ এক স্থানে বহু গাছ জন্মিয়া আত্মরক্ষার জন্য পরস্পর মারামারি করিত এবং এই সংগ্রামের ফলে সকলেই নিহত হইত ও তাহাদের বংশ লোপ পাইত। যাহাতে এইরূপে গাছের বংশ লোপ না হয়, তজ্জন্য অনেক প্রাণী সাহায্য করে। তোমরা হয়ত দেখিয়াছ, বট ও অশ্বথ জাতীয় গাছের ফল যখন পাকে, তখন কত কাক শালিক প্রভৃতি পক্ষী আসিয়া সেই সকল গাছের ফল খাইতে থাকে। ঐ সকল ফল তাহারা বড় ভালবাসে। তাহারা ফল খাইয়া দূরে গিয়া অন্য গাছে বসে ও তথায় বিষ্ঠা ত্যাগ করে। বিষ্ঠার সহিত উপরিকথিত বটবৃক্ষাদির বীজ ও ফল সেই গাছে অঙ্কুরিত হইয়া নূতন গাছের জন্ম দেয়। সেই সকল নূতন গাছ বড় হইলে, তাহাদের মূল ক্রমে মাটি স্পর্শ করে ও মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। এইরূপে বটবৃক্ষাদির বিস্তার ঘটে।

আরও দেখ, অনেক বন্য গাছের ফল ও বীজ আটাল অথবা কণ্টক-যুক্ত। শিয়াল, কুকুর প্রভৃতি জন্তু যখন সেই সকল গাছের কাছ দিয়া গমনাগমন করে, তখন সেই সকল গাছের বীজ ও ফল তাহাদের গায়ে লাগিয়া যায়। সেই সকল জন্তু দূরে গমন করিয়া অন্য গাছে গা ঘষে, সেই সময় ঐ সকল ফল ও বীজ ঐ স্থানের মাটিতে পড়ে ও তাহা হইতে নূতন গাছ জন্মে। এইরূপে শিয়াল, কুকুর প্রভৃতি জন্তু গাছের বিস্তারের সাহায্য করে।

বক, কাদাখোঁচা প্রভৃতি পাখি জলাশয়ের ধারে বসিয়া আহার আহরণ করে। সেই সময়ে তাহাদের পায়ের নখে জলবাসী উদ্ভিদের বীজ ও ফল লাগিয়া যায়। ঐ সকল পাখি উড়িয়া দূরবর্তী জলাশয়ের ধারে বসিলে, তাহাদের নখ হইতে ঐ সকল ফল ও বীজ ঝরিয়া পড়ে ও নূতন গাছের উৎপত্তি হয়। ইহা পাখির সাহায্যে উদ্ভিদ-বিস্তারের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত।

প্রশ্নমালা

(১) উদ্ভিদ না হইলে প্রাণী বাঁচে না, এবং প্রাণী না হইলে উদ্ভিদ বাঁচে না—এই বিষয় বিশদভাবে বুঝাইয়া বর্ণনা কর।

(২) উদ্ভিদের বিস্তারে পাখিপকালি কিরূপে সাহায্য করে, উদাহরণ দিয়া বর্ণনা কর।

শারীর-বিদ্যা

উপক্রমণিকা

শারীর-বিদ্যা বলিতে আমরা এস্থলে কেবল মানবের শরীর সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যের আলোচনাই বুঝিতে চাহি। দেহের বাহ্যিক আকৃতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা অনেকেরই আছে। কিন্তু দেহ বুঝিতে হইলে, দেহের অভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন যন্ত্রাদির আকৃতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। মানব-দেহ কিরূপে সচল হয়, তাহার ইন্দ্রিয়াদি কিরূপে কার্য করে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি কিরূপে পরিচালিত হয়, দেহের বিভিন্ন অংশ কিরূপে গড়িয়া উঠে ও বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে ভাঙিয়া যায়,—অর্থাৎ এক কথায় জীবনধারণের ক্রিয়া কিরূপে পরিচালিত হয়,—এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে, দেহের মধ্যস্থিত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার ও ক্রিয়া সর্বাগ্রে জানিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের জনসাধারণ এই সব অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় এক প্রকার জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার ফলে দেহচর্চার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারেন না।

শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, রক্ত-সঞ্চালনক্রিয়া, দেহের পুষ্টি, অন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যাদির দেহে প্রবেশলাভ ও দেহ হইতে নির্গমন, মস্তিষ্ক, মেরুদণ্ড ও অন্যান্য স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য—এই সবই এক একটি জটিল ব্যাপার। শারীর-বিদ্যা হইতে আমরা এই সকল বিবিধ বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। আয়ুর্বেদশাস্ত্র পাঠে জানা যায় যে, এই বিদ্যা

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল; কিন্তু কালস্রোতে উহা এক প্রকার লুপ্তপ্রায়। য়ুরোপীয় আদর্শে উক্ত বিদ্যার বৈজ্ঞানিক অনুশীলন আমাদের দেশে এক প্রকার আধুনিকই বলিতে হইবে। এমন কি য়ুরোপেও উক্ত বিদ্যার বৈজ্ঞানিক অনুশীলন এই শতাব্দীতেই অধিকতর প্রসার লাভ করিয়াছে।

শারীর-বিদ্যা চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হইলে শারীর-বিদ্যা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা দরকার। অসুস্থ দেহের লক্ষণসমূহ বুঝিতে হইলে, সুস্থ দেহের বিভিন্ন যন্ত্রাদির স্বাভাবিক ক্রিয়া জানা একান্ত আবশ্যক।

সকল বিদ্যার্থীরই শারীর-বিদ্যা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা দরকার। এই জ্ঞানের সহায়তায় তিনি স্বীয় দেহের প্রতি যত্নবান হইতে পারিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানবদেহ

মেটে ঘরের চাল প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে বাঁশ ও কাঠের শক্ত কাঠামো গড়িতে হয়, পরে সেই কাঠামো বিচালি দিয়া ছাইতে হয়। সেইরূপ মানবের দেহ একখানি অস্থির কাঠামোর উপর রচিত। ছোট ও বড় বহু অস্থির সমন্বয়ে এই কাঠামো তৈয়ারি হইয়াছে। অস্থিগুলি পরস্পর এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে, তাহাদের নড়াচড়ার কোন বাধা হয় না। এই সকল অস্থির উপর দৃঢ় মাংসপেশী সংলগ্ন। এই সকল পেশী চর্ম দ্বারা ঢাকা। রক্তবহা-নাড়ী (blood vessels) এবং নার্ভসমূহ (nerves) এই সকল পেশীর মধ্যে স্ব স্ব ক্রিয়ার জন্য স্থাপিত রহিয়াছে।

বাহ্যত মানবদেহকে তিন অংশে ভাগ করা যায়—(১) মস্তক, (২) দেহকাণ্ড, (৩) অবয়ব।

মস্তক (Head)

মস্তক বলিতে আমরা বাহ্যত বহু ছোট বড় অস্থির সমন্বয়ে নির্মিত একটি বাক্সের ন্যায় আধারকেই বুঝি। ইহার নাম **খুলি** বা **করোটি** (cranium)। খুলিটি অনেকগুলি অস্থি দ্বারা নির্মিত। ইহার মধ্যে **মস্তিষ্ক** বা **মগজ** (brain) নামক একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ সুরক্ষিত আছে। মানবের চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি প্রভৃতি যাবতীয় উচ্চ
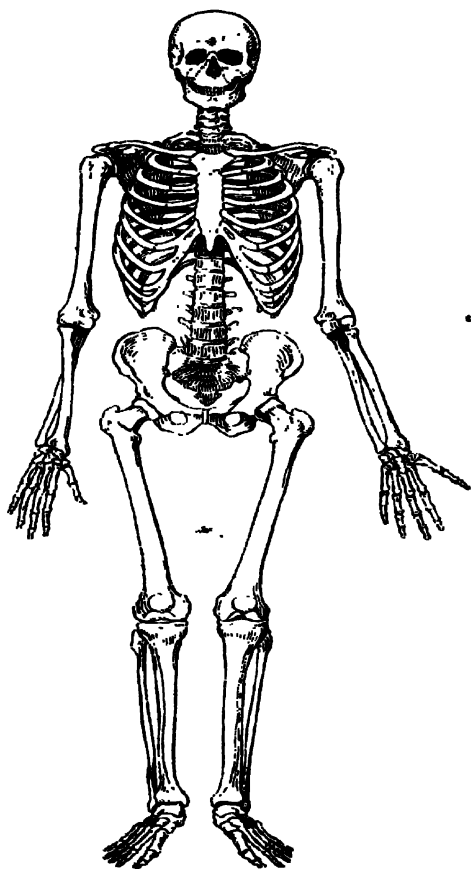
মানবদেহের কঙ্কাল

বৃত্তিসমূহের কেন্দ্রস্থল এই মগজ। মস্তকের সম্মুখভাগকে **মুখমণ্ডল** (face) বলে। মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশকে **চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা,**
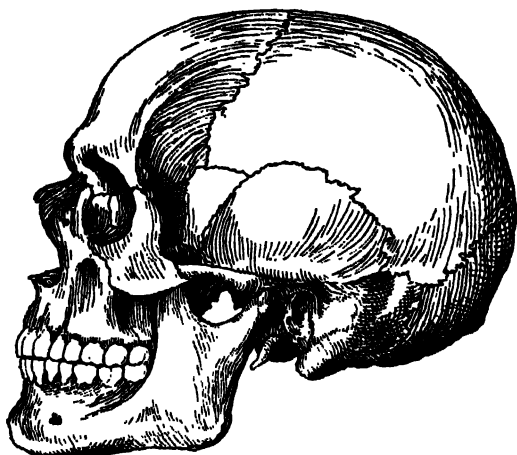
মস্তক

ওষ্ঠ ও **মুখগহ্বর** কহে। এই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে আমরা ভিন্নভাবে আলোচনা করিব

দেহকাণ্ড (Thorax and Abdomen)

দেহকাণ্ড বলিতে আমরা মানব-দেহের মাত্র **মধ্যমাংশই** বুঝি। এই অংশেই মানব-দেহের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যন্ত্রসমূহ বিদ্যমান। বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায় এই মধ্যমাংশকে দেহের কাণ্ডস্বরূপ বলা যাইতে পারে। হস্ত, পদ ও মস্তক ইহার সহিত অস্থিদ্বারা সংলগ্ন। এই মধ্যমাংশকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে: যথা—গ্রীবা, বক্ষ ও উদর।

এই মধ্যমাংশের ঠিক মাঝখানে পিঠের দিকে তেত্রিশটি অস্থিখণ্ড দ্বারা গঠিত **মেরুদণ্ড** বা **শিরদাঁড়া** (vertebral column) রহিয়াছে। ইহাই দেহকাণ্ডের প্রধান অস্থি। এক এক অস্থিখণ্ডের নাম **কশেরুকা** (vertebra)। প্রত্যেক কশেরুকার মধ্যে একটি করিয়া ছোট গহ্বর আছে। অস্থিখণ্ডগুলি পর পর এমনভাবে সন্নিবিষ্ট যে, উক্ত গহ্বর-গুলি একত্র মিলিত হইয়া একটি নালার সৃষ্টি করিয়াছে। এই নালার মধ্যে **মেরুরজ্জু** বা **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) থাকে। **গ্রীবায়** (cervical) সাতখানি, **পৃষ্ঠে** (dorsal) বারো-খানি এবং **কটিতে** (lumbar) পাঁচখানি পৃথক পৃথক কশেরুকা আছে এবং **বস্তিতে** (sacral) পাঁচখানি কশেরুকা পরস্পর জুড়িয়া রহিয়াছে। সব শেষে, **পুচ্ছতে** (coccygeal) যে চারিটি কশেরুকা আছে, তাহাও জুড়িয়া রহিয়াছে। প্রতি দুইখানি কশেরুকার মধ্যে একটি করিয়া **তরুণাস্থির** (cartilaginous) গদির ন্যায় পদার্থ থাকে। ইহা থাকিবার জন্য দেহের বিবিধ ভঙ্গির সময় মেরুদণ্ড তদনুযায়ী হেলিতে দুলিতে পারে।

মেরুদণ্ড

মস্তক ও দেহকাণ্ডের মধ্যে তিনটি গহ্বর আছে। আমরা ক্রমান্বয়ে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

মুখগহ্বর (buccal cavity)—নাসারন্ধ্র ও চিবুকের মধ্যস্থলে এই গহ্বর অবস্থিত। সম্মুখে ওষ্ঠদ্বয় ইহার দ্বারের কার্য করে। উক্ত

ওষ্ঠদ্বয়ের পশ্চাতেই দুই পাটি দন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা জানি, সকল দন্তগুলি উঠিলে প্রত্যেক পাটিতে ষোলটি করিয়া দন্ত থাকে। দন্তের প্রধান কার্য আহার্য-চর্বন। এই চর্বনের বিভিন্ন কার্যানুযায়ী দন্তসমূহের বিভিন্ন শ্রেণী নির্ধারিত হইয়াছে। পাটির সম্মুখেই অন্যান্য দন্তের তুলনায় ঈষৎ চওড়া চারিটি দন্তকে **ছেদনদন্ত** বলা যায়। ছেদন
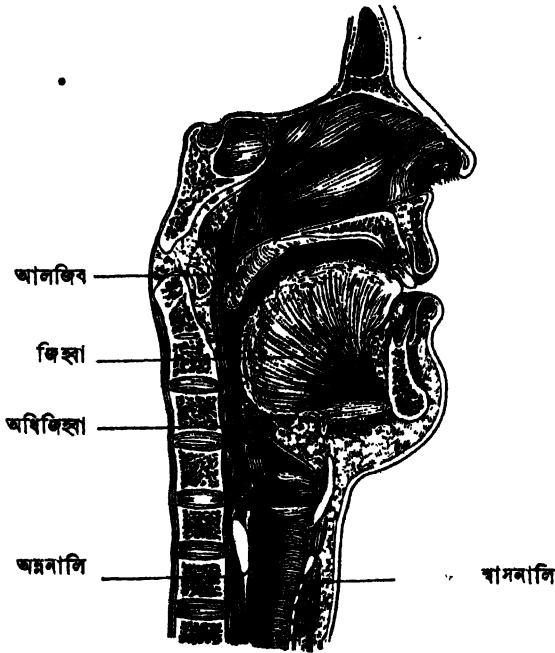
মুখগহ্বরের মধ্যস্থিত যন্ত্রাদি

দন্তের দুই পাশে এক একটি করিয়া দুইটি তীক্ষ্ণ দন্ত আছে, তাহাদিগকে **শ্বদন্ত** বলে। দুই কশে দুইটি দুইটি করিয়া চারিটি **চর্বনদন্ত** এবং পাটির সর্বশেষে উভয় পার্শ্বে তিন তিনটি করিয়া ছয়টি **পেষণদন্ত** আছে।

খাদ্যদ্রব্য মুখবিবরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, জিহ্বার সাহায্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া এই সব বিভিন্ন দন্তসমূহের কাছে গিয়া উপস্থিত হয় এবং দন্তসমূহ তখন তাহাদের স্ব স্ব কার্য করিয়া থাকে। মুখগহ্বরের নীচের অংশকে **ফেরিংক্স** (pharynx) বলে। এইস্থলে **শ্বাসনালি** (trachea) এবং **গলনালি** (gullet) নামক দুইটি ভিন্ন ভিন্ন নালি আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সম্মুখে শ্বাসনালি এবং তাহার পশ্চাতে গলনালি অবস্থিত। জিহ্বা গলনালি হইতে আরম্ভ হইয়া দন্ত পর্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। মাংসপেশী জিহ্বার মধ্যে এরূপ সুন্দরভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে যে, জিহ্বার গতিবিধি প্রয়োজনানুসারে আপনা হইতেই নিয়ন্ত্রিত হয়। জিহ্বামূলে এবং শ্বাসনালির উপরে, **অধিজিহ্বা** (epiglottis) নামক একটি ঢাকনার ন্যায় যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রের এক বিশেষ উপযোগিতা রহিয়াছে। খাইবার সময় চর্বিত খাদ্য যাহাতে কোনক্রমে শ্বাসনালির মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য ঐ অধিজিহ্বা শ্বাসনালির উপর ঢাকনার ন্যায় পড়িয়া থাকে এবং তাহারই ফলে চর্বিত খাদ্য সহজে গলনালি বাহিয়া আমাশয়ের দিকে নামিয়া যায়। মুখগহ্বরের উপরিভাগ বা ছাদের নাম **তালু** (hard palate)। এই তালু বেশ কঠিন। ইহার ঠিক পিছনে **নরম তালু** (soft palate) রহিয়াছে। এই নরম তালু ফেরিংক্স ও নাসারন্ধ্রের মাঝখানে থাকিয়া, ফেরিংক্স হইতে নাসারন্ধ্রের মুখকে বন্ধ রাখিয়া পৃথক রাখে। অন্যমনস্কভাবে খাদ্য গ্রহণ করিলে, অকস্মাৎ এই নরম তালু ও অধিজিহ্বার কার্যে গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহার ফলে খাদ্যের কণা অকস্মাৎ শ্বাসনালি বা নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া অশেষ কষ্ট দিতে পারে ; ইহাকেই **বিষমলাগা** বলা হয়।

বক্ষোগহ্বর (thoracic cavity)—দেহকাণ্ডের উপরের অংশকে বক্ষোগহ্বর বলে। । এই গহ্বরেই আমাদের দেহের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যন্ত্র, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস অবস্থিত। এই গহ্বরটি বিভিন্ন

অস্থি দ্বারা এরূপভাবে গঠিত যে, ইহাকে একটি পিঞ্জরের ন্যায় দেখায়। এই পিঞ্জরের সম্মুখে **উরঃফলক** (sternum) এবং পশ্চাতে মেরুদণ্ডের দ্বাদশটি কশেরুকা। প্রতি কশেরুকা উরঃফলকের সহিত **পঞ্জরাস্থি** (rib) দ্বারা সংযুক্ত। মেরুদণ্ডের দুই পাশে দ্বাদশখানি করিয়া চব্বিশখানি পঞ্জরাস্থি আছে। উপরের দশখানি পঞ্জরাস্থি উরঃফলকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জোড়া। নীচের দুইখানি পঞ্জরাস্থি উরঃফলক পর্যন্ত পৌছায় নাই,
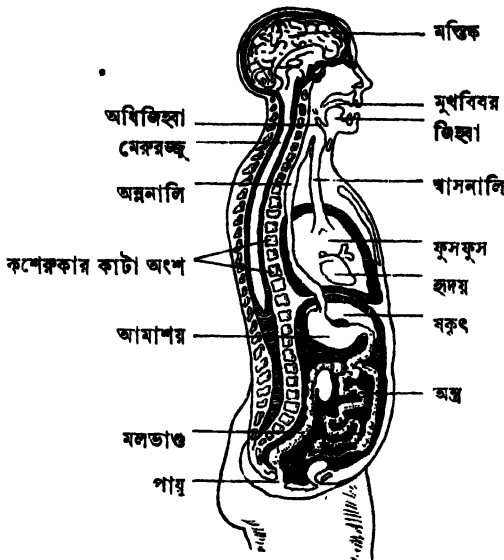
মুখগহ্বর, বক্ষোগহ্বর ও উদরগহ্বর

তরুণাস্থি (cartilage) দ্বারা উহারা উরঃফলকের সহিত জোড়া রহিয়াছে। এইরূপে উভয় পার্শ্বের পঞ্জরাস্থি হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, উহাদের সংখ্যা সর্বসমেত চব্বিশখানি। এই সকল পঞ্জরাস্থি চ্যাপ্টা এবং বক্র ও ইহাদের সম্মুখের অংশ নরম তরুণাস্থি দ্বারা নির্মিত। এই গহ্বরের উপরের দিকে উরঃফলকের সহিত জোড়া **কণ্ঠাস্থি** (clavicle) নামক

আরও দুইখানি দৃঢ় অস্থি আছে। তাহারা কণ্ঠের নিম্নদেশে দুই পার্শ্বে অবস্থিত এবং মাংসপেশী দ্বারা নিম্নস্থ পঞ্জরাস্থিগুলির সহিত জোড়া।

উদর-গহ্বর (abdominal cavity)—দেহকাণ্ডের নিম্নের অংশকে উদর-গহ্বর বলে। দেহকাণ্ডের উপর ও নিম্নের গহ্বরের মধ্যে একটি সুদৃঢ় পেশীনির্মিত পর্দা আছে। এই পর্দাকে **মধ্যচ্ছদা** (diaphragm) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গলনালির নীচের অংশ, যাহা **আমাশয়ের** (stomach) সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাকে **অন্ননালি** (œsophagus) বলা হয়। এই অন্ননালি উপরিকথিত পর্দা ভেদ করত আমাশয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই **আমাশয়** (stomach), বিভন্ন **অন্ত্রসমূহ** (intestines), **যকৃৎ** (liver), **প্লীহা** (spleen), **অগ্ন্যাশয়** (pancreas) **বৃক্ক** (kidney), **মুত্রাশয়** (urinary bladder) এবং **জননেন্দ্রিয়সমূহ** (reproductive organs) এই গহ্বরের মধ্যে স্ব স্ব ক্রিয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত আছে। এই উদর-গহ্বরের সীমা—সম্মুখে কতিপয় দৃঢ় পেশী ও ত্বক, পশ্চাতে মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ, উপরে মধ্যচ্ছদা এবং নিম্নে **বস্তিপ্রদেশ** (pelvic region)। বক্ষোগহ্বরের সহিত উদর-গহ্বরের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতির সহিত বক্ষোগহ্বর ও উদর-গহ্বরের গতি পরিলক্ষিত হয়।

হস্ত ও পদ—মানবদেহকে একটি সুদৃঢ় বৃক্ষস্বরূপ কল্পনা করিলে, হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে উহার ডালপালা বা শাখা বলিয়া মনে হইবে। হস্ত বলিতে সাধারণত আমরা যাহা বুঝি তাহাকে **বাহু** বলা হয়। এই বাহু তিন অংশে বিভক্ত, যথা **প্রগণ্ড** (upper arm), **প্রকোষ্ঠ** (fore arm) ও **হস্ত** (hand)। দেহকাণ্ড হইতে বাহুর যে অংশ কনুই পর্যন্ত বিস্তৃত তাহাকে প্রগণ্ড বলে। এই অংশে একখানি দৃঢ় অস্থি আছে। প্রগণ্ডের শেষ হইতে হস্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অংশকে প্রকোষ্ঠ বলে। এই অংশে দুইখানি অস্থি আছে। ইহার শেষেই হস্ত এবং এই হস্তে সাতাইশখানি

অস্থি আছে। এই সাতাইশখানি অস্থি **মণিবন্ধ** (carpals), **করভাস্থি** (metacarpals) ও **অঙ্গুলাস্থি** (phalanges) নামক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই সব অস্থিখণ্ডগুলি এমন সুন্দরভাবে সাজান রহিয়াছে যে, মানুষ অনায়াসেই বিভিন্ন অঙ্গুলি বা হস্তের পরিচালনা করিতে পারে।

হস্তের ন্যায় পদেরও তিনটি ভাগ আছে, যথা—**উরু** (thigh), **জঙ্ঘা** (shank) ও **চরণ** (foot)। উরুতে একটি অস্থি, জঙ্ঘাতে দুইটি ও চরণে ছাব্বিশটি অস্থি আছে। চরণের ছাব্বিশটি অস্থি তিন ভাগে বিভক্ত, যথা **চরণসন্ধ্যস্থি** (tarsal), **পদতলাস্থি** (metatarsal) ও **অঙ্গুলাস্থি** (phalanges)। এই সকল অস্থির সহিত বড় ছোট বহু পেশী এমন সুচারুরূপে সংলগ্ন আছে যে, মানুষ ইচ্ছানুযায়ী এই সকল পেশী দ্বারা এই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচালনা করিতে পারে।

প্রশ্নমালা

(১) মানবদেহ বলিতে কি বুঝ? ইহার গঠনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।

(২) মস্তকের গঠন ও ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

(৩) মেরুদণ্ডের গঠনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।

(৪) খাদ্যগ্রহণের কালে মুখগহ্বরের কোন্ কোন্ বিশেষ যন্ত্র কিরূপে কার্য করে? বিষম-লাগার হেতু কি?

(৫) বক্ষোগহ্বর ও উদরগহ্বরে কোন্ কোন্ বিশেষ যন্ত্র অবস্থিত?

(৬) মানবদেহকে সুদৃঢ় বৃক্ষস্বরূপ কল্পনা করা হয় কেন? বিশদ-ভাবে ইহার আলোচনা কর।

মানবদেহের সূক্ষ্ম গঠন

জীবমাত্রেরই মূল উপাদান **সূক্ষ্ম কোষ** (cell)। এই সূক্ষ্ম কোষ সমষ্টিভূত হইয়া জীবের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করে। প্রতি কোষে **প্রোটোপ্লাজম** (protoplasm) নামক এক প্রকার জীবনীশক্তিসম্পন্ন পদার্থ আছে। ইহার মধ্যে **নিউক্লিয়স** (nucleus) নামক একটি ঘন পদার্থ থাকে। এই নিউক্লিয়স ও কোষ আপনা হইতেই ভাগ হইতে থাকে এবং এইরূপে একটি কোষ হইতে বহু কোষের সৃষ্টি হয়। এই কোষসমূহ একত্রিত হইয়া পৃথক পৃথক্ রকমের **তন্তু** (tissue) তৈয়ার করে। এই সকল তন্তু হইতেই আমাদের দেহের যাবতীয় যন্ত্রাদি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নির্মিত হয়। পূর্ণাবয়ব মানবের দেহে সাধারণত চারি শ্রেণীর তন্তু দেখা যায় ; যথা—**আচ্ছাদক তন্তু** (epithelial tissue), **সংযোজক তন্তু** (connective tissue), **পেশীতন্তু** (muscular tissue) এবং **বার্তাবহ তন্তু** (nervous tissue)।

আচ্ছাদক তন্তু (enithelial tissue)—দেহের অনাবৃত স্থান সমূহের উপর এবং গহ্বরবিশিষ্ট যন্ত্রাদির ভিতরের গাত্রে এই প্রকার তন্তু পর্দার ন্যায় লাগিয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ গাত্রচর্মের উপরাংশ নির্দেশ করা যাইতে পারে।

সংযোজক তন্তু (connective tissue)—এই তন্তুর নাম হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা দেহের বিভিন্ন অংশে থাকিয়া বিভিন্ন যন্ত্রাদিকে অথবা যন্ত্রাদির বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করিয়া রাখে। ইহার বিশেষ

প্রয়োজনীয়তা আছে। অবস্থানবিশেষে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে।

পেশীতন্তু (muscular tissue)—এই তন্তু প্রয়োজনানুসারে সঙ্কুচিত হইতে পারে। এই সঙ্কোচন-ক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্য কোনও কোনও তন্তুর মানবের ইচ্ছার অনুমোদন দরকার এবং কতকগুলির সঙ্কোচন আপনাআপনিই ঘটিত হয়। দেহের সর্বত্রই বিভিন্ন পেশী, অস্থির সহিত সংলগ্ন থাকে। হস্তপদাদি সঞ্চালন, পরিভ্রমণ, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া, আরও বহুবিধ সঞ্চালন ক্রিয়া পেশী দ্বারা সম্পন্ন হয়।

বার্তাবহ তন্তু (nervous tissue)—মানবদেহের সমস্ত অনুভূতি এই তন্তুর সহায়তায় ঘটিয়া থাকে। ইহা দ্বারা জীবদেহের যাবতীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। **মস্তিষ্কই** ইহার কেন্দ্রস্থল এবং এই প্রকার তন্তু দ্বারাই মস্তিষ্ক নির্মিত। মস্তিষ্ক হইতে দেহের বিভিন্ন যন্ত্রে এবং অন্যান্য অবয়বে, অথবা এই সকল যন্ত্র বা অবয়ব হইতে মস্তিষ্কে, সর্বপ্রকার অনুভূতি এই প্রকার তন্তুর সাহায্যেই সংগঠিত হয়।

রক্ত (blood)—রক্তই মানবদেহের শ্রেষ্ঠ উপাদান। দেহের সর্বত্রই ইহা বিভিন্ন নালি বা নাড়ীর (vessels) সাহায্যে প্রধাবিত হয়। ইহা তরল এবং উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ বস্তু। প্রতি তন্তুর মধ্যে ইহা ধাবিত হইয়া উহার পুষ্টিসাধন করে এবং তথা হইতে দূষিত পদার্থ টানিয়া দেহের বাহিরে ফেলিয়া দিতে সাহায্য করে। রক্ত পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহাতে প্রধানত **রক্তরস** (plasma), **শ্বেত কণিকা** (white blood corpuscles) ও **লোহিত কণিকা** (red blood corpuscles) নামক কয়েকটি পদার্থ বিদ্যমান। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত যখন দেহের মধ্যে ধাবিত হয়, তখন তাহা তরল থাকে, কিন্তু এই রক্ত কোনও প্রকারে দেহের বাহিরে পড়িলে জমাট বাঁধিয়া যায়। এইজন্যই দেখা যায় যে, রক্তপাত হইলে সেই স্থানে অল্প সময়ে রক্ত জমাট

বাঁধিয়া উঠে। এই প্রকার জমাট রক্তে শ্বেত ও লোহিত রক্তকণিকাগুলি পিণ্ডের ন্যায় দলা পাকাইয়া থাকে এবং তাহা হইতে এক প্রকার তরল রস নির্গত হয়। এই তরল রসের বর্ণ ঈষৎ লোহিত। এই তরল রসকে **রক্তমণ্ড** (serum) বলা হয়।

রক্তমণ্ড রক্তরসেরই অংশবিশেষ। রক্ত জমাট বাঁধিলে, উহার রক্ত-রস হইতে সরু সূতার ন্যায় **ফাইব্রিন** নামক একটি পদার্থ বাহির হয়। এই ফাইব্রিন ও রক্তকণিকাগুলি মিলিত হইয়া জমাট বাঁধে এবং তাহা হইতে রক্তমণ্ড নির্গত হয়। দেহের মধ্যে রক্ত যখন ধাবিত হয়, তখন উপরিকথিত ফাইব্রিন, ফাইব্রিনোজেন অবস্থায় থাকে। কিন্তু রক্তপাতের সময় ইহা যখন দেহের বাহিরে নিপতিত হয়, তখনই ইহা সরু সূতার ন্যায় ফাইব্রিনে পরিণত হইয়া যায়। এই ফাইব্রিনের সূতাগুলি জালের ন্যায় সন্নিবিষ্ট থাকে এবং সেই জালের ফাঁকে ফাঁকে রক্তকণিকাগুলি আবদ্ধ থাকে। সুতরাং এই ফাইব্রিন ও রক্তকণিকাগুলি একত্র মিলিত হইয়া জমাট রক্তের সৃষ্টি করে। এই জমাট রক্ত তখন ক্রমশ সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং তাহার মধ্য হইতে এক প্রকার রস বাহির হয়। ইহার রঙ ঈষৎ লোহিত। রক্তমণ্ড (serum) ইহাকেই বলা হয়।

রক্তরস (plasma—ইহার রঙ হরিদ্রাভ। ইহাতে জল, লবণ, অ্যালবুমেন (albumen) ও ফাইব্রিনোজেন থাকে। ১০০০ ভাগ রক্তরসে উক্ত পদার্থসমূহ নিম্নলিখিত হারে থাকে :—

জল	... ...	৯০২.৯০ ভাগ
প্রোটিন	(১) ফাইব্রিনোজেন	৪.০৫ ভাগ
	(২) অ্যালবুমেন ইং	৭৮.৮৪ ভাগ
অন্যান্য পদার্থ (বসা সহ)		৫.৬৬ ভাগ
লবণ	... ...	৮.৫৫ ভাগ

লোহিত কণিকা (red blood corpuscles)—ইহারা গোলাকার এবং মধ্যস্থানে চাপা। ইহাদের আয়তন $\frac{১}{৩০,০০০}$ ইঞ্চি। ইহাদের মধ্যে লোহিত রঙ বিশিষ্ট হিমোগ্লোবিন (hæmoglobin) থাকায় ইহারা

লোহিত রক্তকণিকা

শ্বেত রক্তকণিকা

লাল দেখায়। এই হিমোগ্লোবিনের সহিত অক্সিজেন দেহস্থ বিভিন্ন কোষে পরিবেশিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উক্ত কোষসকল হইতে হিমোগ্লোবিনের সহিত মিলিত হইয়া ফুসফুসে নীত হয়। লোহিত কণিকা প্রধানত অস্থির মধ্যস্থিত **লোহিত মজ্জা** (red marrow) হইতেই তৈয়ারি হয়। প্লীহার মধ্যেও ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

শ্বেত কণিকা (white blood corpuscles)—ইহাদের কোনও প্রকার রঙ নাই। ইহারা লোহিত কণিকা অপেক্ষা অনেক বড়। রক্তের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা লোহিত কণিকা অপেক্ষা অনেক কম। প্রতি ৫০০ হইতে ৬০০ লোহিত কণিকার সহিত ১টি করিয়া শ্বেত কণিকা থাকে। রক্তের মধ্যস্থিত দূষিত পদার্থ বিনষ্ট করিবার শক্তি এই

শ্বেত কণিকার আছে। রোগ বা অন্য যে কোনও হেতুতে দেহের পরিবর্তন ঘটিলে, ইহাদের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এই তথ্য রোগনিরূপণ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করে। অস্থির মধ্যস্থিত **লোহিত মজ্জা** (red marrow), **লসিকা গ্রন্থি** (lymph glands), **টনসিল** (tonsil) প্রভৃতি হইতেই প্রাপ্ত বয়সে শ্বেত কণিকা তৈয়ারি হয়।

রক্তবহা নাড়ী (blood vessel) - রক্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পর, যে সকল নালির মধ্য দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। যে সকল নাড়ীর মধ্য দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয় তাহাদিগকে **রক্তবহা নাড়ী** বলে। আকৃতি ও কার্যের বিভিন্নতা হিসাবে ইহাদিগকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :—

(১) **শিরা** (vein)—শিরা দেহের বিভিন্ন স্থান হইতে রক্ত **হৃদয়ের** দিকে লইয়া যায়। একটি শিরা দেহের নিম্ন এবং একটি শিরা দেহের উপরের অংশ হইতে অপরিষ্কার রক্ত হৃদয়ে লইয়া যায়।
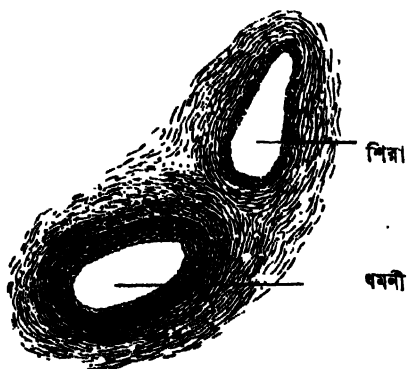
ইহা ছাড়া ফুসফুস হইতে চারিটি বৃহৎ শিরা এবং হৃৎপিণ্ডের পেশীর মধ্য হইতে কতিপয় শিরা হৃদয়ে রক্ত লইয়া যায়। শিরার গাত্র

পাতলা এবং ইহার ভিতরে মাঝে মাঝে **কপাটিকা** (valve) আছে। এই কপাটিকা থাকিবার জন্য ইহার মধ্যে প্রবাহিত রক্ত এক দিকেই যাইতে পারে, বিপরীত দিকে যাইতে পারে না। মৃত্যুর পরে দেখা যায় যে, শিরার উভয় গাত্র জুড়িয়া গিয়াছে; কারণ শিরার স্থিতিস্থাপক শক্তি নাই।

(২) **ধমনী** (artery)—শিরাদ্বারা দেহের বিভিন্নস্থান হইতে আনীত অপরিষ্কার রক্ত ফুসফুসের সহায়তায় পরিষ্কৃত হইয়া হৃদয়ে আইসে। ধমনী সেই পরিষ্কৃত রক্ত দেহের বিভিন্নস্থানে সরবরাহ করে। একটি দৃঢ় ও বৃহৎ ধমনী হৃদয় হইতে এই রক্ত বাহিরে লইয়া যায় এবং ইহার গাত্র হইতে বহু শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়া দেহের বিভিন্ন কোষে বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে। ধমনীর গাত্র শিরার গাত্র অপেক্ষা মোটা ও দৃঢ় এবং ইহার স্থিতিস্থাপক শক্তি আছে।

(৩) **কৈশিক নাড়ী** (capillary)—শিরা ও ধমনী কৈশিক নাড়ী দ্বারা সংযুক্ত। ধমনী ও শিরার সূক্ষ্মতম অংশ যেখানে শেষ হইয়াছে, তথায় এই কৈশিক নাড়ীর জাল বিস্তৃত। এই কৈশিক নাড়ী অতীব সূক্ষ্ম ও উহার দেহ অতি পাতলা। রক্তের জলীয় অংশ এবং অন্যান্য কণিকা কৈশিক নাড়ীর ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া তন্তুর (tissue) মধ্যে প্রবেশ করে।

অস্থি (Bone)

অস্থির অর্ধেকাংশ জলীয় পদার্থ। অস্থির কঠিন পদার্থের মধ্যে অজৈব পদার্থের অংশ শতকরা ৬৭ ভাগ এবং জৈব পদার্থের অংশ ৩৩ ভাগ। অজৈব পদার্থের প্রধান অংশ **ক্যালসিয়ম ফসফেট**

(calcium phosphate); ইহা ছাড়া **ক্যালসিয়ম কার্বনেট** (calcium carbonate), **ক্যালসিয়ম ফ্লুওরাইড** (calcium fluoride) ও **ম্যাগনেসিয়ম ফসফেট**ও (magnesium phosphate) অল্পমাত্রায় আছে; জৈব অংশে প্রধানত **কোলাজেন** (collagen) নামক পদার্থ থাকে।

এই অজৈব এবং জৈব পদার্থসমূহ এমন ঘনিষ্টভাবে মিশিয়া থাকে যে, বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে ইহাদিগকে পৃথক করা যায় না। প্রাপ্তবয়স্কদের অপেক্ষা শিশুদিগের অস্থিতে অধিকতর মাত্রায় জৈব পদার্থ থাকে। সাধারণত অস্থিতে আমরা দুই প্রকার তন্তু (tissue) দেখিতে পাই—একটি দৃঢ় ও ঘনীভূত তন্তু, যাহা উপরে থাকে, এবং আর একটি নরম তন্তু, যাহা ভিতরে থাকে। এই নরম তন্তুকে **ম্যারো** বা **মজ্জা** (marrow) বলা হয়। এই ম্যারো দ্বিবিধ—লোহিত ও হরিতাভ। এতদ্ভিন্ন অস্থির গাত্রের সহিত সংলগ্ন এক প্রকার পর্দা আছে—যাহাকে **পেরিয়ষ্টিয়াম** (periosteum) বলে। এই পর্দা ভেদ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নাড়ীসকল অস্থির মধ্যে প্রবেশ করে এবং অস্থির কোষসমূহে রক্ত সরবরাহ করে। শৈশবে অস্থির ভিন্ন ভিন্ন অংশ নরম থাকে। ক্রমশ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই সকল অংশ দৃঢ় হইয়া উঠে।

আমাদের দেহে সর্বসমেত দুই শতেরও অধিক অস্থি আছে। আকারের প্রভেদে ইহাদিগকে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা :—

(১) **লম্বা অস্থি** (long bones)—ইহারা হস্তপদাদির কাঠামো তৈয়ার করিয়া থাকে।

(২) **ছোট অস্থি** (short bones)—এই সকল অস্থি হস্ত ও পদের অঙ্গুলি এবং অন্যান্য অংশে পরপর জুড়িয়া থাকে এবং তাহাদের পারস্পরিক পরিচালনায় সহায়তা করে।

(৩) **চ্যাপ্টা অস্থি** (flat bones)—ইহারা মাথার খুলি, বক্ষো-গহ্বর ও উদরগহ্বরের প্রাচীর রচনা করিয়া থাকে।

(৪) **অসমগঠন অস্থি** (irregular bones)—ইহা হস্ত ও পদে থাকে।

ইহা ছাড়া অস্থির সহিত অনেক স্থানে সংলগ্ন **তরুণাস্থি** (cartilage) আছে।

দন্ত অস্থির ন্যায় শক্ত। জন্মিবার কিছুকাল পরে প্রথমত যে দাঁত উঠে, তাহাকে দুধে দাঁত বলা হয়। ইহা প্রতি পাটিতে ১০টি করিয়া থাকে। ইহা পড়িয়া যাইবার পর যে দৃঢ় দাঁত উঠে, তাহাকে স্থায়ী দাঁত বলা হয়। স্থায়ী দাঁতের সংখ্যা প্রতি পাটিতে ১৬টি। প্রতি স্থায়ী দন্তকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, **মস্তক** (crown), **গ্রীবা** (neck) এবং **মূল** (root)। একটি দাঁতকে লম্বালম্বিভাবে চিরিয়া ফেলিলে দেখা যায় যে, উহার উপাদান একটি দৃঢ় পদার্থ। এই দৃঢ় পদার্থকে **ডেনটিন** (dentine) বা **আইভরি** (ivory) বলা হয়। ইহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গহ্বর থাকে। এই গহ্বরে আলগাভাবে সংযোজক তন্তু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নাড়ী, বিভিন্ন আকৃতির বহু কোষ এবং কতিপয় সূক্ষ্ম নার্ভ থাকে। এই রক্তবহা নাড়ী এবং নার্ভ দন্তের মূলে একটি ক্ষুদ্র গর্ত দিয়া দন্তের মধ্যে প্রবেশ করে। দন্তের যে অংশ মাঢ়ীর বাহিরে থাকে, উহার উপরাংশ এক প্রকার দৃঢ় চকচকে পদার্থ দিয়া ঢাকা ; এই পদার্থের নাম **এনামেল** (enamel)। মাঢ়ীর ভিতরে দন্তের যে মূল থাকে, উহা অস্থিতন্তু দ্বারা নির্মিত প্রাচীর দিয়া ঢাকা থাকে। উহাকে **সিমেণ্ট** (cement) বলে। এই এনামেল ও সিমেণ্ট দন্তের গ্রীবায় পরস্পর মিশিয়া গিয়াছে।

পেশী (Muscle)

পেশীকে আমরা সাধারণ কথায় মাংস বলিয়াই জানি। পেশী বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লম্বা সূতার ন্যায় তন্তু দ্বারা গঠিত। দেহে যে সকল পেশীতন্তু আছে, তাহাদের আকৃতি একই প্রকার নহে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, কতকগুলি পেশীতন্তু **ডোরাকাটা** অর্থাৎ চিহ্নিত (striated)। এই প্রকার ডোরাকাটা পেশীতন্তুর মধ্যে যে সকল নার্ভ যায়, তাহারা **মেডালেটেড** (medullated)। ডোরাকাটা পেশীতন্তু অধিকাংশই অস্থির সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংলগ্ন। কতকগুলি পেশী সাধারণত ডোরাকাটা নহে অর্থাৎ অচিহ্নিত এবং উহাদের মধ্যস্থিত নার্ভ **নন-মেডালেটেড** (non-medullated)।

অচিহ্নিত পেশীর মধ্যে ডোরাকাটা পেশীর ন্যায় খুব স্পষ্ট দাগ না থাকিলেও, ইহার মধ্যস্থিত কোষের ভিতর অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লম্বা দাগ দৃষ্ট হয়। মূত্রাশয়, পৌষ্টিক নালি প্রভৃতি যন্ত্রে এই প্রকার পেশী দেখা যায়।

ডোরাকাটা পেশীর মধ্যে সূত্রের ন্যায় বহু পদার্থ আছে। ইহাদিগকে পেশীকোষ বলে। ঐ পেশীকোষের প্রস্থভাগে সাদা ও কাল দাগ দেখা যায় (পর পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। যে অংশ সাদা, তন্মধ্যে একটি বিন্দু দ্বারা গঠিত রেখা দৃষ্ট হয়; উহার নাম **ডোবির রেখা** (Dobie's line)।

অচিহ্নিত-পেশী

পেশীর পরিচালনাতেই আমাদের জীবনীশক্তি পরিলক্ষিত হয়। হস্তপদাদি সঞ্চালন, হৃদয়ের স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য, মলমূত্রত্যাগ প্রভৃতি সর্ববিধ দৈহিক ক্রিয়া, পেশীই করিয়া

থাকে। পেশীতন্তুর ক্রিয়ার বিভিন্নতা হিসাবে পেশীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—(১) **আয়ত্ত** (voluntary) এবং (২) **অনায়ত্ত** (involuntary)। আয়ত্ত পেশী সাধারণত অস্থির গাত্রে লাগিয়া থাকে এবং আমাদের ইচ্ছানুযায়ী সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। দেহের অধিকাংশ পরিচালনা ইহার দ্বারা সম্পাদিত হয়। অনায়ত্ত পেশী দেহের কতিপয় যন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া আমাদের অজ্ঞাতেই কার্য করে। হৃদয়, রক্তবহা নাড়ী, অন্ত্র, জরায়ু, মূত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্রাদিতে এই প্রকার অনায়ত্ত পেশী থাকে। ইহারা আমাদের ইচ্ছার অধীন নহে।

সাধারণত আয়ত্ত পেশী ডোরাকাটা এবং অনায়ত্ত পেশী ডোরাকাটা নহে। কিন্তু **হৃদয়ের মধ্যস্থিত পেশী** (striped involuntary muscle fibre) অনায়ত্ত হইলেও ডোরাকাটা। পেশীকোষসমূহ পরস্পর শাখা দ্বারা সংযুক্ত। এই সকল কোষ সাধারণ ডোরাকাটা পেশীর কোষ অপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং উহাদের মধ্যস্থলে একটি করিয়া **নিউক্লিয়স** আছে
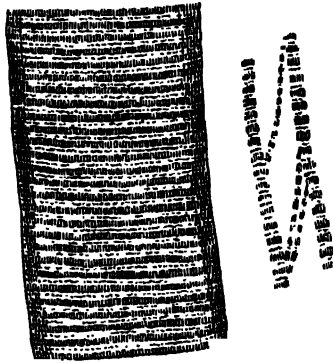
চিহ্নিত ডোরাকাটা পেশী

মেদ (fat)

মানবদেহের প্রায় সর্বত্রই অল্প-বিস্তর **মেদ** আছে। ইহা এক প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ—ইহার অন্য নাম চর্বি। চক্ষুর পাতা, পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষ, মাথার খুলির মধ্যস্থিত গহ্বর প্রভৃতি কতিপয় স্থানে

মেদ নাই। ইহা চর্মের নিম্নে ও মাংসপেশীর উপরে সাদা তৈলাক্ত পদার্থের আকারে থাকে। মেদের ক্রিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) দেহের উত্তাপ রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে মেদ বিদগ্ধ হইয়া রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। উপবাস করিবার সময় মেদের এই ক্রিয়া বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। উপবাসের সময় প্রথমে দেহের মধ্যে সঞ্চিত **শর্করা** এবং তারপর সঞ্চিত **মেদ** খরচ হইয়া থাকে। সুতরাং দৈহিক উত্তাপ রক্ষা করিবার জন্য দেহে কিছু মেদ থাকা আবশ্যক।

(২) মেদ চর্মের নিম্নে থাকে বলিয়া, দেহের অভ্যন্তরস্থ উত্তাপ অতিমাত্রায় বাহিরে যাইতে পারে না ; কারণ, পদার্থ-বিদ্যা হইতে আমরা জানি যে, মেদ উত্তাপের **পরিবাহী** (conductor) নহে।

(৩) দেহের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে সকল স্থান শূন্য থাকে, সেই সকল স্থানে মেদ অবস্থান করিয়া সৌষ্ঠব বজায় রাখে এবং নার্ভ, ধমনী প্রভৃতি অতীব প্রয়োজনীয় অঙ্গাদিকে রক্ষা করে। উদাহরণ স্বরূপ চক্ষুকোটর, করপল্লব ও পদের নিম্নদেশ বলা যাইতে পারে।

(৪) মেদ দেহকে নরম রাখিয়া উহার লাবণ্য বৃদ্ধি করে এবং দৈহিক কর্মশক্তিও বজায় রাখে।

নার্ভতন্ত্র (nervous system)

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি চালাইবার ও শাসনে রাখিবার জন্য এক প্রভু আছেন। এই প্রভুর নাম **নার্ভতন্ত্র**। নার্ভতন্ত্রকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ; যথা—**কেন্দ্রীয়** (central nervous system) এবং **অকেন্দ্রীয়** (peripheral nervous system)। **মস্তিষ্ক** (brain) ও **মেরুরজ্জু** (spinal cord) প্রথম শ্রেণী এবং **অন্তর্বাহী** (afferent) এবং **বহির্বাহী** (efferent) নার্ভ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। মস্তিষ্কই আমাদের জীবনী-শক্তির কেন্দ্রস্থল ; আমাদের দেহ এবং মনের প্রত্যেক

গতিবিধি, অনুভূতি, প্রচেষ্টা এবং অন্যান্য কার্য এই তন্ত্র দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। নার্ভশ্রেণী মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু হইতে উদ্ভূত হইয়া বিভিন্ন যন্ত্রাদিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

অতএব এই সকল নার্ভের কেন্দ্রস্থান মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু। যেমন শোণিত-প্রণালীর কেন্দ্র হৃৎপিণ্ড, সেইরূপ নার্ভরজ্জুর কেন্দ্র মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু। সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্র, নার্ভ দ্বারা কেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত। সমস্ত নার্ভ টেলিগ্রাফের তারের ন্যায় কেন্দ্র হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিতে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি হইতে কেন্দ্রে, সংবাদ বহনাবহন করে। এই সকল নার্ভ দ্বারা নার্ভতন্ত্রসকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রাদিকে আপন বশে বা শাসনে রাখে। এইরূপে দেহের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও যন্ত্র, সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলায় সদাসর্বদা আপন আপন নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকে।

নার্ভতন্ত্রের কার্য ব্যবস্থার দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। তোমার সম্মুখে সুপক্ক ব্যঞ্জনাদি আসিয়া উপস্থিত হইল। চক্ষুর অন্তর্বাহী নার্ভ অমনি সেই সংবাদ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে উপস্থিত করিল। উক্ত নার্ভতন্ত্র সংবাদ পাইবামাত্র বহির্বাহী নার্ভ দ্বারা সেই সংবাদ বাহুর পেশীতে পাঠাইল। বাহুর পেশী সেই সংবাদ পাইয়া আকুঞ্চিত হইল এবং সেই কারণেই বাহু আহার্য লইয়া মুখে তুলিল। আহার্য পাকস্থলীতে উপস্থিত হইলেই, অমনি পাকস্থলীর নার্ভগুলি সেই সংবাদ কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিল। কেন্দ্রও সেই সংবাদ পাইয়া, অন্য নার্ভ দ্বারা, পাকস্থলীর গ্রন্থি-সমূহকে আজ্ঞা করিল, "তোমরা পরিপাচক-রসের নিঃসরণ কর।" তখন পরিপাচক রস নিঃসৃত হওয়ায়, আহার্য তাহার সাহায্যে দ্রবীভূত ও পরিপাকপ্রাপ্ত হইল এবং শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইল।

তোমার গালে মশা কামড়াইতেছে; গালের অন্তর্বাহী নার্ভ এই সংবাদ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে পাঠাইয়া দিল। উক্ত কেন্দ্র সেই সংবাদ পাইয়া, বহির্বাহী নার্ভ দ্বারা, তোমার হাতের পেশীতে তাহা পাঠাইয়া

দিল। পেশী তদনুসারে আকুঞ্চিত হইয়া, হাতকে গালের দিকে তুলিল। তখন, তোমার হাতের চাপড়ে মশা মরিল।

মস্তিষ্ক ইচ্ছা ও বুদ্ধির স্থান। তোমার অর্থাৎ তোমার মস্তিষ্কের ইচ্ছা হইল, তুমি হাত মুঠা করিবে। মস্তিষ্কের ইচ্ছা অনুসারে সেই উত্তেজনা, নার্ভ দ্বারা হস্তের পেশীতে উপস্থিত হইয়া, হাতের পেশীদিগকে আকুঞ্চিত করিল; তাহাতে তোমাকে হাত মুঠা করিতে হইল। নার্ভতন্ত্রের শাসনশক্তির এইরূপ শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারা যায়।

ত্বক (Skin)

শরীরের বাহিরের আবরণকে ত্বক বলে। ইহার দুইটি স্তর, একটি বাহিরের স্তর বা **উপচর্ম** (epidermis), আর একটি ভিতরের স্তর বা **চর্ম** (dermis)। উপচর্ম কতিপয় পর্দার ন্যায় তন্তু দ্বারা গঠিত। সর্বাপেক্ষা উপরের পর্দা ঘন আচ্ছাদক তন্তু দ্বারা নির্মিত। চর্ম এক প্রকার ঘনীভূত তন্তু দ্বারা তৈয়ারি। নীচের স্তরে এই সকল তন্তু আল্‌গাভাবে থাকে এবং ইহার মধ্যে নার্ভ, ধমনী, শিরা, ঘর্ম ও স্বেদ নির্গমের গ্রন্থি, লোম ও লোম খাড়া করিবার জন্য মাংসপেশী আছে।

ত্বক বুঝিতে হইলে ইহার সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট লোমকূপ, কেশ, স্বেদ নির্গমের গ্রন্থি ও নখ সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। লোমকূপ বলিতে আমরা ত্বকের অন্তঃস্থিত অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রন্ধ্রকেই বুঝি। এই লোমকূপগুলিকে আমাদের দেহের ময়লা বাহির করিবার নর্দমা বলা যায়। দিবারাত্রি দেহের বহু দূষিত পদার্থ ঘর্মাকারে এই লোমকূপ বাহিয়া বাহির হইতেছে। ঘর্ম-নির্গম একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য। প্রত্যহ আধ সেরেরও অধিক ঘর্ম আমাদের দেহ হইতে নির্গত হয়। কোনও কারণে ঘাম বন্ধ হইলে,

ঐ দূষিত পদার্থ দেহে জমিয়া নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে। সুতরাং লোমকূপ অপরিষ্কার থাকিয়া যাহাতে ঘর্ম-নির্গম বন্ধ না হয়, তদ্বিষয়ে আমাদের যত্নবান হওয়া দরকার।

কেশ (hair)—চর্মের (dermis) ভিতরে ছোট ছোট কোটর আছে এবং এই সকল কোটরে এক একটি কেশ অবস্থিত। এই কোটরে নার্ভ, ধমনী প্রভৃতি প্রবিষ্ট হইয়া কেশের পুষ্টিসাধন করে।

স্বেদ বা ঘর্মনির্গমের গ্রন্থি (sweat gland)—এই প্রকার গ্রন্থি দেহের প্রায় সর্বত্রই প্রচুর সংখ্যায় অবস্থিত; তবে যে সকল স্থানে চুল নাই, যথা হাত এবং পায়ের তলা, তথায় ইহাদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। প্রত্যেক গ্রন্থিতে একটি কুণ্ডলীর ন্যায় গঠন চর্মের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত এবং একটি নালার সাহায্যে ইহা উপচর্মের ভিতর দিয়া বাহিরের সহিত সংযুক্ত। এই সকল গ্রন্থির ক্রিয়াতেই স্বেদনির্গম হয়।

নখ (nails)—অঙ্গুলির প্রান্তস্থিত দৃঢ় পদার্থকে নখ বলে। উপচর্ম ঘনীভূত হইয়াই ইহার সৃষ্টি হয়। অঙ্গুলির যে অংশের উপর নখ অবস্থিত, উহাকে **নখের শয্যা** (nail-bed) বলা যায়। নখের অগ্রভাগে কোন নার্ভ না থাকার জন্য নখ কাটিবার সময় কোন বেদনা অনুভূত হয় না।

ত্বকের কার্য নানাবিধ। এ সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক :—

১। **দেহের আচ্ছাদন**—দেহের অভ্যন্তরস্থিত বিভিন্ন যন্ত্রাদিকে বাহিরের কোনও প্রকার আঘাত হইতে রক্ষা করা ত্বকের এক কার্য; ইহার আর এক কার্য সংজ্ঞা-বহন করা।

২। **দৈহিক উত্তাপের সমতা রক্ষণ**—আভ্যন্তরিক উত্তাপের সহিত ত্বকের উত্তাপের অনুভূতির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ত্বকের উত্তাপ কোনও কারণে বৃদ্ধি পাইলেই, দৈহিক উত্তাপ বৃদ্ধি পায় না; যেমন গরম জলে স্নান করিলে অথবা মদ্য-মিশ্রিত ঔষধ সেবন করিলে, ত্বকের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলেও, দৈহিক উত্তাপ বরং হ্রাসই পায়।

ত্বকের এই প্রকার শক্তি আছে বলিয়াই, ইহা দৈহিক উত্তাপের সমতা রক্ষণে সমর্থ।

৩। **শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া**—ত্বকের সহায়তায় অতি সামান্য মাত্রায় শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ত্বক বেশি মোটা হইলে ইহা খুবই কম হয়। মানবদেহে ফুসফুস দ্বারা যতখানি কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়, তাহার ১৫০ বা ২০০ ভাগের এক ভাগ ত্বকের মধ্য দিয়া নির্গত হইয়া থাকে।

৪। **পদার্থ গ্রহণ** (absorption)—স্নেহজাতীয় পদার্থ দেহে মাখিলে, তাহা ত্বক দিয়া দেহে প্রবেশ করে।

৫। **স্বেদ-নির্গম**—স্বেদের সহিত দেহের মল নিষ্কাশিত হয়। এই স্বেদনির্গম উপযুক্ত মাত্রায় হইলে ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল থাকে।

৬। **স্পর্শ, চাপ, তাপ ও বেদনার অনুভূতি**—ত্বকের মধ্যস্থিত নার্ভের সহায়তায় এই সকল অনুভূতি ঘটিয়া থাকে।

প্রশ্নমালা

(১) মানবদেহে কয় প্রকার তন্তু পাওয়া যায়? বার্তাবহ তন্তুর ক্রিয়া কি?
(২) রক্ত পরীক্ষা করিলে উহার মধ্যে কোন্ কোন্ বস্তু পরিলক্ষিত হয়?
(৩) রক্ত কিরূপে জমাট বাঁধে?
(৪) শ্বেতকণিকার কার্য কি?
(৪) রক্তবহানালির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।
(৬) মানবদেহে কয় প্রকার অস্থি পাওয়া যায়? অস্থির রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।
(৭) আয়ত্ত ও অনায়ত্ত পেশীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর।
(৮) দেহের পক্ষে মেদের প্রয়োজনীয়তা কি?
(৯) নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।
(১০) ত্বকের কার্য কি?

চতুর্থ অধ্যায়

শোণিত-সঞ্চালন-তন্ত্র (circulatory system)

এই তন্ত্র বলিতে আমরা দেহের রক্তসঞ্চালন করিবার যন্ত্রাদি ও তাহাদের ক্রিয়াই বুঝি। এই যন্ত্রাদির মধ্যে প্রধান হৃৎপিণ্ড। এই হৃৎপিণ্ড একটি পম্পের ন্যায় যন্ত্র; ইহা বক্ষোগহ্বরে ফুসফুসদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। শোণিত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া ধমনী, কৈশিকা, শিরা প্রভৃতির ভিতর দিয়া ঘুরিয়া পুনরায়
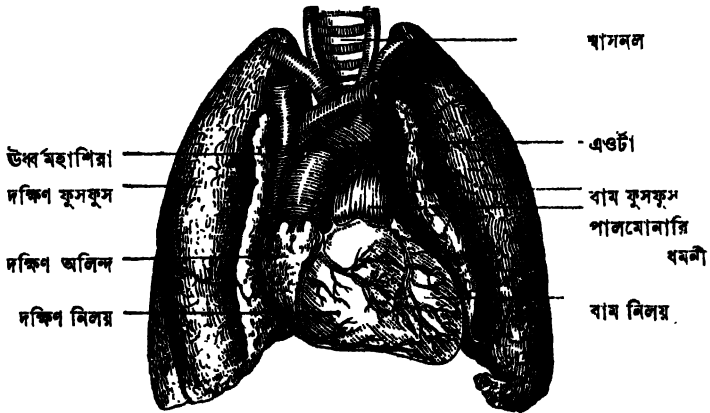
হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের পারস্পরিক অবস্থান

হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। এইরূপে সমস্ত দেহ ঘুরিয়া আসিতে রক্তের অর্ধ মিনিটের বেশি সময় লাগে না। আমাদের দেহের সর্বত্র অবিরাম রক্তস্রোত চলিতেছে। শরীরের সমস্ত অংশই ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রক্ত নিত্য নূতন উপাদান আনিয়া এই সকল ক্ষয় পূরণ করিয়া থাকে।

আমরা সাধারণত যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি, রক্ত তাহা হইতেই ক্ষয়-পূরণের উপাদান সংগ্রহ করে। সুতরাং ভক্ষিত খাদ্য ও পরিপাকযন্ত্রের সহিত রক্তের অতি নিকট সম্বন্ধ। এতদ্ভিন্ন শ্বাসক্রিয়ার সহিতও ইহার নিগূঢ় সম্পর্ক রহিয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া দ্বারাই রক্ত পরিশোধিত হয়। এখন আমরা শোণিত সঞ্চালন-তন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন যন্ত্রাদি একে একে আলোচনা করিব।

হৃদয় শোণিত-সঞ্চালন-তন্ত্রের কেন্দ্রীয় বৃহৎ পাম্প। কারণ, ইহা পাম্প করিয়া সর্বাঙ্গে রক্ত সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহা বক্ষোগহ্বরের
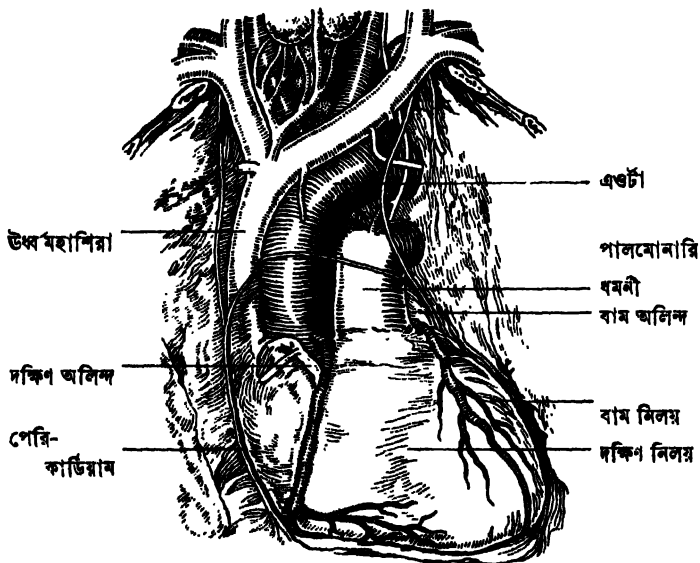
হৃৎপিণ্ড ও তৎসংলগ্ন রক্তবহা নাড়ীসমূহ

ডান ও বাম ফুসফুসের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ইহা একটি থলিয়ার ন্যায় যন্ত্রের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। এই থলিয়ার নাম

পেরিকার্ডিয়াল স্যাক (pericardial sac)। উক্ত থলিয়া আবার দুইটি পর্দা দ্বারা নির্মিত। একটি পর্দা হৃদয়ের সহিত সংলগ্ন থাকে, অপরটি তাহার বাহিরে। এই দুই পর্দার মধ্যবর্তী স্থানে এক প্রকার রস থাকে। থলিয়াটি এই প্রকার অবস্থায় থাকিবার দরুণ, হৃদয় প্রয়োজনানুসারে স্ফীত ও কুঞ্চিত হইতে পারে। হৃদয়ের আয়তন প্রায় একটি হাতের মুষ্টির সমান। ইহা দৃঢ় মাংসপেশী দ্বারা নির্মিত একটি ফাঁপা যন্ত্র। ইহার ভিতরটা দেখিতে একটি দুইতলা বাড়ী বলিয়া মনে হয়—উপরে দুইটি ঘর, নীচে দুইটি ঘর। উপরের দুইটি ঘরের নাম **অলিন্দ** (auricle) এবং নীচের দুইটি ঘরের নাম **নিলয়** (ventricle)। অলিন্দ দুইটি আয়তনে ছোট এবং উহাদের প্রাচীর পাতলা। নিলয় দুইটি আয়তনে বড় এবং তাহাদের প্রাচীর মোটা। অলিন্দ দুইটির মাঝে ও নিলয় দুইটির মাঝে সুদৃঢ় প্রাচীর আছে—সেই প্রাচীরে কোনও দরজা নাই। কিন্তু ডান অলিন্দ ও ডান নিলয়ের মাঝে দরজা আছে এবং বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মাঝেও দরজা আছে। এই দুই দরজা এমনভাবে সন্নিবেশিত যে, অলিন্দ রক্তে পূর্ণ হইবামাত্র দরজা খুলিয়া যায় এবং রক্ত নিলয়ে আসিয়া পড়ে, নিলয় হইতে অলিন্দে প্রবেশ করিতে পারে না। এই দুই দ্বারে এরূপ **কপাটিকার** (valve) ব্যবস্থা আছে যে, উপরিকথিত রক্ত চলাচল সহজেই ঘটিয়া থাকে।

দক্ষিণ অলিন্দে (right auricle) দেহের সর্বস্থান হইতে অপরিশুদ্ধ রক্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। এই রক্ত **উর্ধ্ব মহাশিরা** (vena cava superior) ও **নিম্ন মহাশিরা** (vena cava inferior) নামক দুইটি মহাশিরা দ্বারা প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই উভয় মহাশিরা দক্ষিণ অলিন্দে আসিয়া মিশিয়াছে। নিম্ন মহাশিরার মুখে ছোট কপাটিকা আছে; উহার নাম **ইউস্টেকিয়ান** (eustachian) কপাটিকা। উর্ধ্ব মহাশিরার মুখে কোনও কপাটিকা নাই। অলিন্দ হইতে নিলয়ে

যাইবার পথকে **এট্রিয়োভেনট্রিকুলার** ছিদ্র বলে। এই ছিদ্রে **ট্রাইকাসপিড** কপাটিকা (tricuspid valve) নামক তিন পাল্লাযুক্ত কপাটিকা আছে। **করোনারি সাইনস** (coronary sinus) নামক
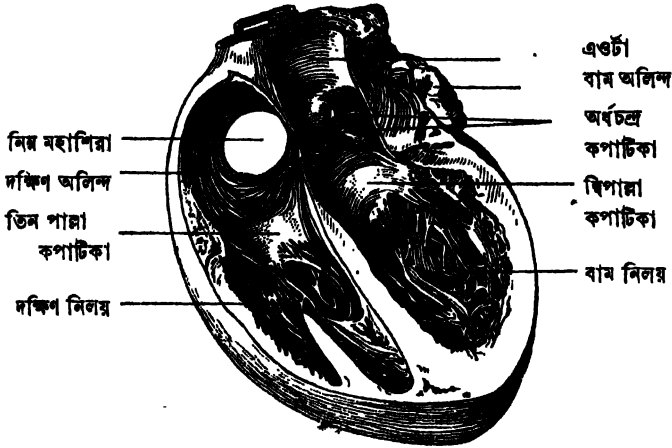
হৃৎপিণ্ডের ভিতরের আকৃতি

আর একটি সাইনস বা ছিদ্র-পথ আছে। এই পথ দিয়া হৃদ্‌যন্ত্রের দূষিত রক্ত পরিশোধনের জন্য দক্ষিণ অলিন্দে যায়। ইহার মুখেও **থিবেসিয়াস** (thebesius valve) নামক একটি কপাটিকা সংলগ্ন আছে।

দক্ষিণ বা ডান নিলয়ের (right ventricle) মধ্যে দুইটি ছিদ্র-পথ আছে। একটি দক্ষিণ অলিন্দ হইতে নামিবার পথ; ইহার মুখ তিন পাল্লা কপাটিকা দ্বারা ঢাকা। অপর ছিদ্রপথ ফুসফুসের ধমনীর (pulmonary artery) মধ্যে গিয়াছে; ইহার মুখে যে কপাটিকা আছে উহার নাম **অর্ধচন্দ্র কপাটিকা** (semilunar valve)।

দুই ফুসফুস হইতে দুইটি করিয়া মোট চারিটি **ফুসফুসীয় শিরা** (pulmonary veins) বাম অলিন্দে (left auricle) আসিয়া প্রবেশ

করিয়াছে এবং ইহাদের মুখে কোনও কপাটিকা নাই। এই বাম অলিন্দ বাম নিলয়ের সহিত একটি ছিদ্র দ্বারা সংযুক্ত। এই ছিদ্রপথে **দ্বিপাল্লা কপাটিকা** (bicuspid valve) বিদ্যমান।

বাম অলিন্দের মধ্যে দুইটি ছিদ্র আছে। একটি দ্বারা বাম অলিন্দ হইতে **বাম নিলয়ে** (left ventricle) যাওয়া যায়। এই পথে দ্বিপাল্লা কপাটিকা (biscuspid valve) আছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আর একটি ছিদ্র **এওর্টা** (aorta) নামক মহাধমনীর সহিত সংযুক্ত। পরিশোধিত রক্ত এই মহাধমনীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে। এই ছিদ্রে **অর্ধচন্দ্রাকৃতি** (semilunar) কপাটিকা আছে।

হৃদয় স্পন্দনের নিয়ম—হৃদয়-স্পন্দনই জীবনের লক্ষণ। মাতৃগর্ভে মানুষ যখন মাত্র চারিমাসের ভ্রূণ অবস্থায় থাকে, তখন হইতেই হৃদয়ের স্পন্দন আরম্ভ হয়। হৃদয়ের স্পন্দন বলিতে আমরা বুকের ধুকধুকুনিই বুঝি। বুকের উপর বাম দিকে কান রাখিয়া শুনিলে বেশ বুঝা যায় যে, প্রথমত একটা দীর্ঘ দুই মাত্রা ধুকধুকুনি শব্দ, তারপর হ্রস্ব এক মাত্রা ধুকধুকুনি শব্দ, তারপর একটা ফাঁক অর্থাৎ ধুকধুকুনি বন্ধ থাকে। ইহার পরেই আবার ধুকধুকুনি শব্দ আরম্ভ হয়। এই ধুকধুকুনি শব্দ ক্রমাগত চলিতে থাকে। সাধারণত মিনিটে ৭২ বার এই প্রকার স্পন্দন হয়। ভয়, রাগ বা অন্য কোনও প্রকার মানসিক চাঞ্চল্য ঘটিলে, এই স্পন্দন দ্রুততর হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, হৃৎপিণ্ড একটি পম্পের ন্যায় কার্য করে। ইহা ধমনীতে, শিরায়, কৈশিকে কৈশিকে রক্তস্রোত চালাইতেছে। হৃদয়ের পেশী আপনা হইতে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় এবং ইহার ফলেই উহার স্পন্দন ঘটিয়া থাকে। প্রথম ধুকধুকুনি শব্দটি হৃৎপিণ্ডের পেশীর সঙ্কোচন এবং অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবর্তী কপাটিকা সমূহের অকস্মাৎ বন্ধ হইবার ফলে ঘটিয়া থাকে এবং দ্বিতীয় ধুকধুকুনি শব্দটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাসমূহে সহসা টান পড়িবার জন্য হয়।

রক্তপ্রবাহ তত্ত্ব—আমাদের সমগ্র দেহের দূষিত রক্ত, দুই মহা-শিরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ অলিন্দে উপস্থিত হয়। এই অলিন্দ এইরূপে দূষিত রক্তে ভরিয়া উঠিবামাত্র সঙ্কুচিত হয়। এই সঙ্কোচনের ফলে, ঐ রক্ত দক্ষিণ নিলয়ে প্রবেশ করে। দক্ষিণ নিলয় রক্তে ভরিয়া উঠিলেই, ঐ নিলয় আপনা হইতে সঙ্কুচিত হয়। এই সময়ে অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবর্তী তিনপাল্লা কপাটিকাও বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং নিলয়ের মধ্যস্থিত রক্ত **পালমোনারি ছিদ্রপথ** দিয়া **পালমোনারি ধমনীর** মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেই পথে প্রবাহিত হইয়া ফুসফুসে চলিয়া যায়। অন্যদিকে ফুসফুসে অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া যে রক্ত বিশুদ্ধ হয়, উহা বাম অলিন্দে চলিয়া আসে। এই অলিন্দ রক্তে পূর্ণ হইবামাত্র সঙ্কুচিত হয় এবং তাহার ফলে অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবর্তী দ্বিপাল্লা কপাটিকা খুলিয়া যায়। রক্ত তখন নীচে বাম নিলয়ে নামিয়া আসে। এই নিলয় রক্তে পূর্ণ হইবামাত্র সঙ্কুচিত হয় এবং উপরের দ্বিপাল্লা কপাটিকাও বন্ধ হইয়া যায়। নিলয়ের মধ্যস্থিত রক্ত তখন অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকার মধ্য দিয়া মহাধমনীর (aorta) মধ্যে প্রবেশ করে এবং ক্রমে ইহার শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়া সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়।

বিশুদ্ধ রক্ত মহাধমনীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই, উহার অসংখ্য শাখা প্রশাখার ভিতর ধাবিত হয় এবং ক্রমে তাহাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে কৈশিকাবলীতে গিয়া উপস্থিত হয়। এই কৈশিকাবলীর আবরণ এত সূক্ষ্ম যে, উহার ভিতর দিয়া রক্ত সহজে চলাচল করিতে পারে। ধমনী হইতে অক্সিজেন-মিশ্রিত বিশুদ্ধ রক্ত কৈশিকাতে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে পেশীতন্তুসমূহের পুষ্টিসাধন ও ক্ষয়পূরণ করে। এই কার্যের ফলে রক্ত দূষিত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় রক্তের মধ্যস্থিত অক্সিজেন পেশীতন্তুসমূহে রহিয়া যায় এবং তাহার পরিবর্তে কার্বন ডাই-

অক্সাইড রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। এই দূষিত রক্ত কৈশিকা হইতে শিরায় প্রবেশ করে। পরে ইহা বৃহত্তর শিরায় এবং সর্বশেষে 'ভিনা কেভা' (vena cava) নামক দুইটি বৃহত্তম শিরার মধ্য দিয়া, হৃদয়ের দক্ষিণ অলিন্দে যায়। এই রক্তপ্রবাহকে **বৃহত্তর সঞ্চালন প্রণালী** কহে।

পূর্বেই বলিয়াছি দূষিত রক্ত পরিশোধনার্থ, দক্ষিণ বা ডান নিলয় হইতে পালমোনারি ধমনীর মধ্য দিয়া ফুসফুসে প্রবাহিত হয়। এই ধমনী হৃদয় হইতে বাহির হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং এই দুইটি ভাগ ফুসফুসের দুই অংশে প্রবিষ্ট হয় ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর শাখায় বিভক্ত হইয়া কৈশিকায় পরিণত হয়। কৈশিকার পাতলা আবরণের ভিতর দিয়া বায়ুকোষস্থ (air cells) অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং দূষিত রক্ত পরিশোধিত করে। এইরূপে পরিশোধিত রক্ত প্রথমত পালমোনারি শিরা সমূহের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং পরে হৃদয়ের বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। প্রত্যেক ফুসফুস হইতে দুইটি করিয়া পালমোনারি শিরা বাম অলিন্দে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই রক্তপ্রবাহকে **ক্ষুদ্রতর রক্ত সঞ্চালন প্রণালী** বলে।

এতদ্ভিন্ন **পোর্টাল রক্ত সঞ্চালন** নামক আর এক প্রকার রক্ত-প্রবাহ আছে। ইহাকে বৃহত্তর রক্ত সঞ্চালনেরই শাখা বলা যায়। মহাধমনীর শাখা-প্রশাখা আমাশয়, অন্ত্র, অগ্ন্যাশয় (pancreas) এবং প্লীহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে বিশুদ্ধ রক্ত পরিবেশন করে এবং এই রক্ত পরে পোর্টাল নামক এক বৃহৎ শিরার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া যকৃতে (liver) প্রবেশ করে। এই পোর্টাল শিরা যকৃতে প্রবেশ করত বহু শাখা-প্রশাখায় এবং অবশেষে কৈশিকায় বিভক্ত হয় এবং এইরূপে যকৃৎকে আবশ্যকমত সার পদার্থ পরিবেশন করিয়া যকৃতের মধ্যস্থিত দূষিত পদার্থ নিম্ন মহাশিরায় লইয়া যায়।

উপরে যে সকল রক্তপ্রবাহের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ছাড়া হৃদয়ের মাংসপেশীর মধ্যে একটি **আভ্যন্তরীণ রক্ত সঞ্চালন প্রণালী** (coronary circulation) রহিয়াছে। হৃদয়ের বাম নিলয় হইতে বিন্দু বিন্দু বিশুদ্ধ রক্ত একটি সূক্ষ্ম পথ ধরিয়া দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। এই ক্ষুদ্র রক্তপ্রবাহকে **করোনারি রক্ত সঞ্চালন প্রণালী** কহে।

প্রশ্নমালা

(১) হৃদয়কে একটি পম্পের সহিত তুলনা করা হয় কেন?

(২) হৃদয়ের মধ্যে কয়টি ঘর আছে? উহাদের পৃথক্ পৃথক্ কার্য বর্ণনা কর।

(৩) হৃদয়ে ধুকধুকুনি শব্দ হয় কেন? এ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

(৪) দূষিত রক্ত কোথা হইতে আইসে? ইহা কিরূপে দেহের মধ্যে পরিশোধিত হয়?

পঞ্চম অধ্যায়

শ্বাসতন্ত্র (Respiratory System)

শ্বাসক্রিয়া বলিতে আমরা শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ, এই উভয় কার্য বুঝি। শ্বাসগ্রহণের অর্থ অক্সিজেন গ্রহণ এবং শ্বাসত্যাগের অর্থ কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ। এই অক্সিজেন বিনা আমরা বাঁচিতে পারি না। বায়ুই ইহার ভাণ্ডার। যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে এই শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয় তাহাদের সংখ্যা প্রধানত পাঁচটি—(১) নাসাপথ (nares), (২) ফেরিংক্স (pharynx), (৩) শ্বাসনল (trachea ও bronchii), (৪) ফুসফুস (lungs) ও (৫) মধ্যচ্ছদা (diaphragm)।

(১) **নাসাপথ** (nares)—নাসারন্ধ্র হইতে ফেরিংক্স পর্যন্ত বিস্তৃত ত্রিকোণ গহ্বরকে নাসাপথ বলে। নাসারন্ধ্রের সম্মুখে দুইটি এবং পশ্চাতে মুখবিবরের মধ্যে দুইটি দ্বার আছে। ফেরিংক্সের মধ্যে যেখানে শ্বাসনালি ও খাদ্যনালি আরম্ভ হইয়াছে, সেইখানেই নাসাপথ আসিয়া শেষ হইয়াছে। সাধারণত আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি, উহা প্রথমত নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে এবং পরে নাসাপথের মধ্যে আঁকা বাঁকা পথ বাহিয়া ফুসফুসে যায়। বায়ুকে এই আঁকা বাঁকা পথ দিয়া বহিতে হয় বলিয়া, ইহা গরম হয় এবং ইহার মধ্যস্থিত ধূলিকণাসমূহ নাসারন্ধ্রের লোমে আটকাইয়া যায়। এই সকল কারণে যে বায়ু ফুসফুসে প্রবেশ করে, উহা খুব ঠাণ্ডা নহে এবং ঐ বায়ুর মধ্যে বিশেষ ধূলিকণাও থাকে না।

(২) **ফেরিংক্স** (pharynx)—শ্বাসনালি ও খাদ্যনালি যেখানে মিশিয়াছে, উক্ত স্থানকে ফেরিংক্স বলে। ইহার দুই পাশে দুইটি ছোট গ্রন্থি আছে, উহার নাম **তালুগ্রন্থি** (tonsil)। ফেরিংক্সের উপরে যে মাংসপিণ্ড ঝুলিয়া আছে, উহাকে **আলজিব** (uvula) বলে।

(৩) **শ্বাসনালি** (trachea)—ইহাকে মোটামুটিভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগকে **স্বরযন্ত্র** (larynx) বলে। এই যন্ত্রের ক্রিয়ায় আমরা কথা বলা, গান গাওয়া, বক্তৃতা দেওয়া প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকি। এই যন্ত্রের ছিদ্রের উপর **অধিজিহ্বা** (epiglottis) নামক একটি ঢাকনা থাকে ; খাদ্যগ্রহণের সময় এই ঢাকনা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে কোনও প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলেই সহসা বিষম লাগিয়া দম বন্ধ হইতে পারে। দ্বিতীয় অংশকে **ট্রাকিয়া** বলে এবং এই ট্রাকিয়া আরও নীচে গিয়া দক্ষিণ ও বাম **ব্রঙ্কাই** (bronchi) নামক দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ট্রাকিয়া ও ব্রঙ্কাইশাখা সম্পূর্ণরূপে ফাঁপা। ইহাদের সম্মুখ ভাগ অর্ধাঙ্গুরী আকারের তরুণাস্থি দ্বারা নির্মিত। পশ্চাৎভাগে কোনও অস্থি নাই এবং তজ্জন্য উক্ত অংশ নরম।

(৪) **ফুসফুস** (lungs)—শ্বাসযন্ত্রের মধ্যে ফুসফুসই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। ইহার মধ্যেই দূষিত রক্ত পরিশোধিত হইয়া থাকে। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত; এই দুই ভাগ বুকের দুই পার্শ্বে এক একটি করিয়া অবস্থিত। ফুসফুসের উপর প্লুরা নামক এক প্রকার পাতলা আবরণ থাকে। দক্ষিণ ফুসফুসের তিনটি খণ্ড এবং বাম ফুসফুসের দুইটি খণ্ড। প্রতি খণ্ড বহু বায়ুকোষের সমষ্টি দ্বারা গঠিত। ফুসফুস স্পঞ্জের ন্যায় ফাঁপা। বায়ুকোষগুলির গাত্র অত্যন্ত পাতলা এবং তাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য কৈশিকা নাড়ী রহিয়াছে। এই স্থানে বায়ুকোষ রক্ত হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কৈশিকা নাড়ীর মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রদান করে।

(৫) **মধ্যচ্ছদা** (diaphragm)—ইহা বুক ও পেটের মধ্যবর্তী স্থানে মাংসপেশী নির্মিত এক পর্দা।

শ্বাসকার্যের বৈশিষ্ট্য

(১) **শ্বাসগ্রহণ** (inspiration)—শ্বাসগ্রহণের সময় মধ্যচ্ছদা সঙ্কুচিত হইয়া নীচে নামিয়া পড়ে। পঞ্জরের পেশীগুলিও সঙ্কুচিত হয় বলিয়া **উরঃফলক** (sternum) সম্মুখের দিকে উঠিয়া পড়ে; এই দুই কার্যের ফলে বক্ষোগহ্বরের আয়তন বাড়ে। এই আয়তনের বৃদ্ধি হইবার ফলে, ফুসফুসের মধ্যস্থিত বায়ুর চাপ হ্রাস পায়। তখন বাহিরের বায়ু নাসাপথ বহিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং ইহার ফলে, বাহিরের ও ভিতরের বায়ুর চাপের সমতা রক্ষিত হয়। এই চাপ সমান হইয়া গেলেই, বাহির হইতে ফুসফুসে বায়ুর প্রবেশ বন্ধ হইয়া যায়।

(২) **শ্বাসত্যাগ** (expiration)—শ্বাসগ্রহণের সময় মধ্যচ্ছদা ও পঞ্জরের পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই উক্ত পেশীগুলি প্রসারিত

হইয়া পড়ে। ইহার ফলে, বক্ষোগহ্বরের আয়তন ছোট হয় এবং ফুসফুসের মধ্যস্থিত বায়ু মুখ ও নাক দিয়া দ্রুত বাহির হইয়া যায়। এই ক্রিয়াকেই শ্বাসত্যাগ বলা হয়।

(৩) **অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর পারস্পরিক সম্বন্ধ**—আমরা জানি ফুসফুসের বায়ুকোষগুলির আবরণ অত্যন্ত পাতলা। ঐ কোষসমূহে অসংখ্য কৈশিক নাড়ী থাকায়, বাহির হইতে আগত অক্সিজেন-মিশ্রিত বায়ু বায়ুকোষে প্রবিষ্ট হইলে, উক্ত কোষসমূহ বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং দূষিত রক্ত দ্বারা আনীত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস কোষসমূহের মধ্যে প্রবেশ করে।

(৪) **নার্ভের কার্য** (nervous mechanism)—পূর্বেই বলিয়াছি যে, অধিকাংশ পেশী মস্তিষ্কের সাহায্য ব্যতিরেকে কার্য করিতে পারে না। শ্বাসযন্ত্রের পেশীগুলিও মস্তিষ্কের সাহায্যসাপেক্ষ। কার্বন ডাই-অক্সাইড রক্তে অধিক মাত্রায় জমিলেই, মস্তিষ্ক উহার সংবাদ পায় এবং ইহারই ফলে শ্বাসকার্যের পেশীগুলি সঙ্কুচিত হয়।

প্রশ্নমালা

(১) শ্বাসক্রিয়া কাহাকে বলে? কোন্ কোন্ যন্ত্রের সাহায্যে শ্বাসকার্য সম্পন্ন হয়? উহাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

(২) ফুসফুসের মধ্যে রক্ত কিরূপে পরিশোধিত হয়?

(৩) শ্বাসকার্যের বৈশিষ্ট্য কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়

পচন বা পরিপাক তন্ত্র (Digestive System)

মুখ হইতে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত নালিকে **পৌষ্টিক নালি** (alimentary canal) বলে। ইহা দেহকাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। এই দীর্ঘ নালিতেই আমাদের পরিপাকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ইহার যে অংশ উদরে অবস্থিত, তাহারই উপরের ভাগ আমাশয় (stomach), আর নীচের ভাগ ক্ষুদ্রান্ত্র (duodenum) ও বৃহদন্ত্র (large intestines)। ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত যকৃৎ, পিত্তকোষ, প্লীহা ও অগ্ন্যাশয় (pancreas) সংযুক্ত। আহার্য-পদার্থ মুখে প্রবেশ করিলে দন্ত ও জিহ্বার সাহায্যে খণ্ডিত ও পিষ্ট হইয়া পিণ্ডাকারে পরিণত হয়।

আমাদের মুখগহ্বরে **প্যারটিড** (parotid), **সব-ম্যাক্সিলারি** (submaxillary) ও **সব-লিঙ্গুয়াল** (sublingual) নামক তিন জোড়া গ্রন্থি আছে। এই সকল গ্রন্থি হইতে রস বাহির হইয়া খাদ্যদ্রব্যকে সহজ-পাচ্য করে। প্যারটিড গ্রন্থির পাতলা রস শুষ্ক খাদ্যকে নরম করে, সব-ম্যাক্সিলারির আঠাল রস খাদ্যদ্রব্যকে পিচ্ছিল করে এবং সব-লিঙ্গুয়ালের রসের মধ্যে **টায়ালিন** (ptyalin) নামক এক প্রকার জারক পদার্থ আছে। এই টায়ালিন শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে চিনিতে পরিণত করে।

মুখগহ্বরে সুচর্বিত ও লালামিশ্রিত খাদ্য অধিজিহ্বার উপর দিয়া ইসোফেগস (œsophagus) নামক অন্ননালিতে প্রবেশ করে। ইহা নয় ইঞ্চি লম্বা এবং শ্বাসনালির পশ্চাতে অবস্থিত। ইহার ভিতর দিয়া খাদ্যদ্রব্য আমাশয়ে যায়। ইহা উদরগহ্বরের উপরিভাগের বাম

অংশে মধ্যচ্ছদার নিম্নে অবস্থিত। ভিস্তির মশকের ন্যায় ইহার আকৃতি। ইহার মধ্যে কোনও খাদ্যদ্রব্য না থাকিলে, ইহা চ্যাপ্টা অবস্থায় পড়িয়া থাকে এবং খাদ্য প্রবেশ করিলেই ইহা ফুলিয়া উঠে। ইহার দুইটি দ্বার আছে—একটি ইসোফেগসের দিকে এবং আর একটি অন্ত্রের দিকে। আমাশয়কে তিন অংশে ভাগ করা যায়, যথা (১) আগমদ্বার (cardiac end), (২) আমাশয় স্কন্ধ (fundus) ও (৩) নিগমদ্বার (pyloric end)।

খাদ্যদ্রব্য আমাশয়ে ঢুকিবামাত্র উহার মধ্যে এক প্রকার পাচক-রস নির্গত হয়। উহাকে **আমাশয় রস** (gastric juice) বলে এবং এই রসে প্রধানত পেপসিন ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড থাকে। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে বিশ্লেষণ করত সহজপাচ্য করাই এই রসের প্রধান কার্য। খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে যে সকল রোগ-বীজাণু আমাশয়ে আসিয়া পড়ে, তাহারা অম্লরসের সংস্পর্শে ধ্বংস হয়।

খাদ্যদ্রব্য যখন আমাশয়রসের সহিত মিশিয়া হজম হইতে থাকে, তখন আমাশয়ের নিগমদ্বার ও অন্ত্রের সংযোগস্থলস্থ একটি দৃঢ় পেশী মাঝে মাঝে খুলিয়া যায় এবং তাহার ফলে খাদ্যদ্রব্য অর্ধপক্ক অবস্থায় **ক্ষুদ্রান্ত্রে** (duodenum) প্রবেশ লাভ করে। খাদ্যদ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিলেই, ইহার গাত্রস্থ পেশীগুলি একবার সঙ্কুচিত ও একবার প্রসারিত হইতে থাকে। এই সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে, খাদ্যদ্রব্য পাচকরসের সহিত মিলিত হইয়া, অন্ত্রের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সূক্ষ্ম কণায় পরিণত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে সকল **শোষক-যন্ত্র** (villus) আছে, তাহাদের সহায়তায় জীর্ণ খাদ্য অন্ত্রের মধ্যে এবং ক্রমে কৈশিকা নালীসমূহের মধ্যে শোষিত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রে তিন প্রকার রস নির্গত হয়। প্রথমত, যকৃৎ হইতে নিঃসৃত **পিত্তরস** (bile)। এই পিত্তরস স্নেহজাতীয় পদার্থকে জীর্ণ করে এবং

শোষণকার্যে সহায়তা করিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, অগ্ন্যাশয় নামক যন্ত্র হইতে নির্গত **অগ্ন্যাশয় রস** (pancreatic juice)। ইহার মধ্যে **শ্বেতসারপদার্থ জারক, স্নেহপদার্থ জারক** এবং **প্রোটিনপদার্থ জারক** নামক তিন প্রকার জারক রস আছে। এই তিন প্রকার জারক রস যথাক্রমে শ্বেতসার, স্নেহ ও প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে পাচ্য করে। তৃতীয়ত, **আন্ত্রিক রস** (succus entericus)। এই রস অজীর্ণ প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে সহজপাচ্য করে; এবং ইহা অগ্ন্যাশয় রসের সহিত মিশিয়া ইক্ষুচিনিকে গ্লুকোসনামক পদার্থে পরিণত করে। এইরূপে আমাদের যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য পরিপাকযন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় পতিত হয় এবং তাহাদের মধ্য হইতে প্রকৃত সার পদার্থ শরীরে শোষিত হয়। খাদ্যের মধ্যস্থিত জলীয় অংশ বৃহদন্ত্রে শোষিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ মল হইয়া পায়ুর ভিতর দিয়া বাহির হয়।

প্রশ্নমালা

(১) খাদ্য চর্বণের সময় মুখগহ্বরে কোন্ কোন্ গ্রন্থি ক্রিয়া করে এবং উহার প্রয়োজনীয়তা কি?

(২) আমাশয়ের আকৃতি কিরূপ? উহার মধ্যে কোন্ কোন্ জারক রস নির্গত হয় এবং উহাদের কার্য কি?

(৩) অন্ত্র কয় প্রকার এবং উহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ জারক রস নির্গত হয়?

(৪) পিত্তরস ও অগ্ন্যাশয় রসের উৎপত্তি স্থান কোথায় এবং উহাদের কার্য কি?

(৫) আন্ত্রিক রসের উপযোগিতা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

সপ্তম অধ্যায়

খাদ্যের উপাদান

মানবদেহের এই বিরাট গঠনের মূল উৎস খাদ্য। দেহে যত প্রকার তন্তু আছে, গৃহীত খাদ্য হইতেই তাহাদের পুষ্টি হইয়া থাকে। খাদ্যদ্রব্য এরূপ হওয়া দরকার যে, আমরা তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাকে রক্তের সহিত মিশাইতে পারি। খাদ্য, পরিপাক যন্ত্রে প্রবিষ্ট হইলেই বহুরূপে পরিবর্তিত হয় এবং পরে রক্তের মধ্যে পরিচালিত হইয়া, দেহের বিভিন্ন তন্তুকে প্রয়োজনানুসারে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে। এই পরিবর্তন ক্রিয়াকেই পরিপাক ক্রিয়া বলা হয়।

খাদ্যদ্রব্যকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

১। কার্বোহাইড্রেট বা শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় পদার্থ।

২। প্রোটিন পদার্থ।

৩। স্নেহজাতীয় পদার্থ।

৪। লবণজাতীয় পদার্থ।

৫। জল।

৬। ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ (vitamin)।

১। **কার্বোহাইড্রেট** (carbohydrate)—রাসায়নিকগণের মতে শ্বেতসার ও শর্করা উভয়ই 'কার্বোহাইড্রেট'-এর অন্তর্ভুক্ত। শ্বেতসার বলিতে ময়দা, চাউল, বার্লি, আলু প্রভৃতি পদার্থ বুঝিতে হইবে।

আমরা যত প্রকার কার্বোহাইড্রেট খাইয়া থাকি, তাহারা শেষ পর্যন্ত দ্রাক্ষাচিনিতে (grape-sugar) পরিণত হইয়া রক্তস্রোতে মিশিয়া যায়।

এই চিনি রক্তে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমত যকৃতে যায় এবং পরে তথা হইতে দেহের বিভিন্ন তন্তুতে গমন করত তাহাদিগকে পরিপুষ্ট করে। দেহের প্রয়োজনের অতিরিক্ত চিনিটুকু যকৃতের মধ্যেই থাকে। যকৃতের মধ্যে এক প্রকার জারক রস আছে। এই জারক রস অতিরিক্ত চিনিকে পরিবর্তিত করিয়া যকৃতের কোষমধ্যে রাখিয়া যায়। উপবাস ও অন্য কোনও কারণে রক্তে চিনির অভাব ঘটিলে, এই যকৃতের মধ্যে রক্ষিত চিনির ব্যবহার হয়। রক্তে উহার মাত্রার একটি মাপ আছে। ইহার বেশি কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। রক্তে চিনির মাত্রা হ্রাস পাইলে দেহে কর্মশক্তি থাকে না, আবার অধিক হইলে মূত্রে চিনির আবির্ভাব হয়। তাহার ফলে, দেহ ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

২। **প্রোটিন** (protein)—প্রোটিন বলিতে আমরা সাধারণত মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি আমিষ পদার্থকেই বুঝি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ডাল প্রভৃতি অনেক উদ্ভিজ্জ পদার্থেও যথেষ্ট মাত্রায় প্রোটিন পাওয়া যায়। শেষোক্ত প্রোটিনকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন বলে। দুধের ছানা, পনির প্রভৃতি দ্রব্যেও প্রোটিন আছে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ইহা বিশেষ আবশ্যক। এই প্রোটিন আমাশয়ে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, ইহার উপর এক প্রকার জারক রস ক্রিয়া করে, পরে ক্ষুদ্রান্ত্রে গেলেও ইহার উপর অন্য জারক রসের ক্রিয়া হইয়া থাকে। এইরূপে প্রোটিন শেষ পর্যন্ত অ্যামিনো এসিড (ammino acid) নামক পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং সেই অবস্থায় রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। খাদ্যবিৎগণ বলেন যে, মানবদেহের পক্ষে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন অপেক্ষা প্রাণীজ প্রোটিনই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ প্রোটিন হইতে দেহের উপ-যোগী সমুদয় প্রোটিন আহরণ করিতে হইলে অধিক মাত্রায় উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে পরিপাক যন্ত্রের অসুস্থতা হইবার সম্ভাবনা। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের দিনে ১০০ গ্রাম (৯ তোলা)

প্রোটিন গ্রহণ করা আবশ্যক এবং তন্মধ্যে একতৃতীয়াংশ প্রাণীজ প্রোটিন হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রোটিন দেহের কোষমধ্যস্থ প্রোটোপ্লাজমকে পুষ্ট করে। সুতরাং বালকবালিকার দেহগঠনের পক্ষে ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ইহার সেবনে মাংসপেশী দৃঢ় এবং শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

৩। **স্নেহজাতীয় পদার্থ** (fats)—ঘৃত, মাখন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণীজ চর্বি, বাদাম, নারিকেল, সরিষা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তৈল, স্নেহ-জাতীয় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। ইহাও দেহের পক্ষে অত্যাবশ্যক পদার্থ। দেহে এই জাতীয় পদার্থের মাত্রা বেশি কম হওয়া উচিত নহে। শরীরে চর্বি সঞ্চিত থাকিলে, হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিতে পারে না। দীর্ঘ উপবাসের সময়ে এই চর্বির ব্যবহার ঘটিয়া থাকে। চর্বি মূত্রযন্ত্র এবং অন্যান্য কয়েকটি প্রধান প্রধান যন্ত্রকে আবৃত রাখিয়া, উহাদিগকে রক্ষা করে। প্রোটিন বা শর্করা হইতেও এই প্রকার স্নেহপদার্থ জন্মিতে পারে। স্নেহ পদার্থ দেহে তাপ উৎপাদন করিয়া থাকে।

৪। **লবণ** (salt)—বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে আমরা বহুবিধ লবণ খাইয়া থাকি। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সোডিয়ম ক্লোরাইড অর্থাৎ সাধারণ নুনই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শোণিতের ইহা একটি অপরিহার্য অংশ। ইহার অভাব ঘটিলে, রক্ত পাতলা হইয়া যায় এবং তাহার ফলে দেহও শীর্ণ হইয়া পড়ে। *এইজন্য* কলেরা প্রভৃতি রোগে রোগীকে সবল করিবার *জন্য*, রক্তে নুনজল সঞ্চারণ করা হয়। সুতরাং পর্যাপ্ত মাত্রায় লবণ ভক্ষণ করা বিধেয়।

৫। **জল** (water)—জল বিনা মানুষ বাঁচিতে পারে না। দেহের মধ্যস্থিত প্রতিকোষের জীবনীশক্তি জলের উপর নির্ভর করে। শোণিত-রূপে ইহা দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশকে বিধৌত করিতেছে এবং দেহের বহু দূষিত পদার্থকে মূত্র ও ঘর্মের সহিত প্রতিনিয়ত নিঃসারিত করিতেছে।

৬। **ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ** (vitamin)—ভাইটামিন সম্বন্ধে আজকাল অনেক আলোচনা শোনা যায়, কিন্তু আমাদের অনেকেরই এ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নাই। বর্তমান যুগে বহু গবেষক এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মত এই যে, কার্বো-হাইড্রেট, প্রোটিন, স্নেহজাতীয় পদার্থ প্রভৃতি অতিরিক্ত পরিশুদ্ধ অবস্থায় সেবন করিলে, দেহের পুষ্টিসাধন বাধাপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় সেবন করিলে উহা হয় না। এতদ্ভিন্ন খাদ্যদ্রব্য বাসি হইলেও উহা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। কলে-ছাঁটা সাদা চাউল, ভূষিহীন সাদা ময়দা, বাসি পচা শাক-সব্জী, শুষ্ক খড়ভোজী ও অন্ধকার গৃহে পালিত গাভীর দুগ্ধ প্রভৃতি খাদ্যের পুষ্টিকর শক্তি কম। এই প্রকার খাদ্যের উপর বহুদিন নির্ভর করিয়া থাকিলে, নানাবিধ রোগ জন্মায়। এই সকল স্বাভাবিক খাদ্যের মধ্যে এমন কোনও পদার্থ আছে যাহার অভাব ঘটিলে নানা রোগের সৃষ্টি হয়। সেই পদার্থকেই ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ বলে।

ভাইটামিনদিগকে A, B, C এবং D শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে।

(১) **ভাইটামিন "এ"** (A)—এই ভাইটামিন চর্বিতে দ্রবনীয়। দুধের মাখনে, ডিমের পীতাংশে, কড, হ্যালিবট প্রভৃতি মৎস্যের যকৃতের তৈলে, গবাদি তৃণভোজী পশুর যকৃতে, টাটকা শাকসব্জীতে, বাঁধাকপি, লেটুস, পালঙ প্রভৃতি শাকে, পাকা বিলাতি বেগুন, পাকা আম প্রভৃতি ফলে, গাজরে এবং টাটকা পাকা লঙ্কায় এই ভাইটামিন অধিক মাত্রায় বর্তমান। এতদ্ভিন্ন শোনা যায় যে, আমাদের দেশের টাঁই, ভেটকী, চিতল, মিরগেল, রোহিত, ইলিশ প্রভৃতি মৎসের যকৃতের তৈলেও ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা চর্বি বৃদ্ধি করে এবং পুষ্টি সাধনে সহায়তা করে।

(২) **ভাইটামিন "বি"** (B)—এই ভাইটামিন জলে দ্রবনীয়।

মোটা আছাঁটা চাউল, ভুষি, গম, দুগ্ধ, মৎস, ডাল, শাকসব্জীতে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। দেহে ইহার অভাব ঘটিলে **বেরিবেরি** রোগ হয়। ইহা নার্ভকে সতেজ ও পরিপুষ্ট করিতে সমর্থ।

(৩) **ভাইটামিন "সি"** (C)—ইহা জলে দ্রবনীয়। কমলালেবু, পাতিলেবু, আপেল, আম, আনারস, আঙ্গুর, বিলাতি বেগুন (টোমাটো) প্রভৃতি ফলে এবং পাকা লঙ্কা, গোল আলু, পেঁপে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, টাটকা শাকসব্জী, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ প্রভৃতিতে ইহা পাওয়া যায়। দেহের মধ্যে ইহার অভাব ঘটিলে, **স্কার্ভি** নামক চর্মরোগ হইয়া থাকে। ইহা সেবনে দেহে শোণিত বৃদ্ধি হয়।

(৪) **ভাইটামিন "ডি"** (D)—ইহা চর্বিতে দ্রবনীয়। কডলিভার তৈলে ও হ্যালিবট-লিভার তৈলে, ইহা অধিক পরিমাণে আছে। ইহা ছাড়া ডিমের পীতাংশে, গুগলিতে ও মাখনের মধ্যেও ইহা পাওয়া যায়। মাছ, মাংস, তরিতরকারীর মধ্যেও ইহা কিছু কিছু থাকে। হাড়ের মধ্যস্থিত মজ্জার ভিতরে ইহা প্রচুর পরিমাণে বর্তমান।

যত প্রকার খাদ্য আমাদের দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। কিন্তু এই সকল খাদ্যের একটা পরিমাণ ও হিসাব আমাদের জানা দরকার। ঠিক দেহের পক্ষে কোন্ প্রকার খাদ্য কতটা পরিমাণ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা অবশ্যই জানিতে হইবে। শ্বেতসার ও শর্করার যেমন উপযোগিতা আছে, ঘৃত ও মাংসাদিও সেইরূপ আবশ্যক। তবে এই সকল খাদ্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখা দরকার। খাদ্যদ্রব্য যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থাতেই গ্রহণ করা কর্তব্য ; নতুবা খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব হয়।

আমাদের খাদ্যদ্রব্য সহজপাচ্য হওয়া আবশ্যক। খাদ্য যাহাতে অনায়াসে দেহের রক্তের সহিত মিশিয়া ক্রমশ রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি নির্মাণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। যে সকল খাদ্যে

অতিরিক্ত তৈল, ঘৃত বা মশলা মিশ্রিত করা হয়, তাহা হজম করিতে পরিপাক যন্ত্রকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। ইহার ফলে, পরিপাক যন্ত্র অচিরেই রোগগ্রস্থ হইয়া পড়ে। অনেকে হয়ত কেবল মুখরোচক খাদ্যই পছন্দ করেন। মুখরোচক খাদ্য না খাইলে অবশ্য মুখের মধ্যে লালাক্ষরণে বাধা উপস্থিত হয়। কিন্তু এই রোচকতার একটা সীমা থাকা দরকার। খাদ্যদ্রব্যে তীব্র গন্ধ ও স্বাদ থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে।

বর্তমান সভ্যযুগে আমরা কেবল পরিষ্কার খাদ্যই গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, খাদ্যদ্রব্য খুব শুভ্রবর্ণের হইলেই উপাদেয় হয় না। শুভ্রবর্ণ পালিশ করা চাউলের ভাত দেখিতে সুন্দর হইতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে সারাংশের একান্তই অভাব। শ্বেতবর্ণ ময়দা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে। আলু, পটল প্রভৃতি তরকারীর খোসায় অনেক পুষ্টিকর দ্রব্য থাকে। কিন্তু আমরা ঐ খোসা বাদ দিয়া ভিতরের শাঁসটা খাইতেই ভালবাসি।

কাঁচা ফলমূল খাইবার প্রথা খুবই ভাল। কাঁচা মূলা, কাঁচা পেঁয়াজ ইত্যাদি মুড়ির সঙ্গে খাওয়া যায়। ইহাতে দেহের পুষ্টিসাধন হয়। ছোলা, মুগ প্রভৃতি ভিজাইয়া খাওয়া যাইতে পারে। এই সকল দ্রব্য রন্ধন করিলে, অনেকাংশে নষ্ট হইয়া যায়। টাটকা শাক আর একটি উপাদেয় খাদ্য। ইহা নিয়মিতভাবে খাইলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় না।

যত প্রকার স্বাভাবিক খাদ্য আছে, তাহাদের মধ্যে দুগ্ধই সর্বাপেক্ষা উপকারী। প্রোটিন, শর্করা, শ্বেতসার, মাখন, লবণ ও জল ইহার মধ্যে উপযুক্ত মাত্রায় আছে। সুতরাং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হইলে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ পান করা যাইতে পারে।

কেবল পুষ্টিকর খাদ্য সেবন করিলেই দেহের পুষ্টি সাধিত হয় না। প্রত্যহ নিয়মিতভাবে খানিকটা কায়িক পরিশ্রম না করিলে, দেহের অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গে অক্সিজেন সরবরাহ হয় না। অক্সিজেনের অভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীঘ্রই জীর্ণ ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং ভুক্ত দ্রব্য যাহাতে অনায়াসে দেহের রক্তের সহিত মিশিয়া দেহকে পরিপুষ্ট করে, তজ্জন্য নিয়মিত ব্যায়াম বা অঙ্গচালনা করা আবশ্যক।

প্রশ্নমালা

(১) খাদ্যদ্রব্যকে কয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে?

(২) কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থের স্ব স্ব উৎস কোন্ কোন্ খাদ্যে আছে?

(৩) দেহের পক্ষে প্রোটিনের উপযোগিতা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

(৪) ভাইটামিন বলিতে কি বুঝ?

(৫) আমাদের খাদ্যে কয় প্রকার ভাইটামিন পাওয়া যায়? তাহাদের স্ব স্ব উপযোগিতা কি?

(৬) বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যের পারস্পরিক সম্বন্ধ বর্ণনা কর।

দ্বিতীয় ভাগ

পদার্থ-বিদ্যা।

রসায়ন-বিদ্যা।

জ্যোতির্বিদ্যা।

ভূ-বিদ্যা।

বিজ্ঞান-আলোচনা

পদার্থ-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

সূচনা (Introduction)

আমরা আমাদের চতুর্দিকে শুধু বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীই দেখিতে পাই না, আরও অনেক ব্যাপার আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়। শান্ত, নিশ্চল বৃক্ষশ্রেণী; প্রবহমান বাতাস আসিয়া উহাদের ডালপালা চঞ্চল করিয়া দেয়। হঠাৎ দমকা হাওয়ায় ধূলিকণা, ইট পাটকেল প্রভৃতি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। পৃথিবীর আকর্ষণে বৃন্তচ্যুত ফল মাটিতে পড়ে। আবার ঐ আকর্ষণই উপেক্ষা করিয়া এরোপ্লেন আকাশপথে ঘণ্টায় শত শত মাইল অতিক্রম করিয়া যায়। জলের অতল তলে সাবমেরিন জাহাজ যাতায়াত করে। সূর্যের আলোকে রাত্রির অন্ধকার কাটে, আর সেই আলোকই চতুর্দিকের দ্রব্যসামগ্রীর সহিত আমাদের পরিচয় ঘটায়। উনুনের আগুনের তাপে কেতলীর জল ফোটে। কাঁসার পাত্র মেঝেতে পড়ে, আর ঝন্ ঝন্ শব্দ উহার পতনের খবর আমাদের জানাইয়া দেয়। মধুর, কর্কশ, উগ্র, করুণ কত বিচিত্র শব্দে

চারিদিক মুখরিত। আকাশে হয় মেঘে মেঘে ঘর্ষণ, আর তার সঙ্গে সশব্দে খেলিয়া যায় বিদ্যুতের ঝিলিক। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে। বিদ্যুতের চুম্বক ধর্ম আছে। আমরা যে আবেষ্টনীর ভিতর বাঁচিয়া আছি উহা কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রী দ্বারাই শুধু গঠিত নয়; এই যে গতি, আলো, উত্তাপ, বিদ্যুৎ, চুম্বক ও শব্দ প্রভৃতির কথা বলা হইল উহাদের প্রভাবও ঐ আবেষ্টনীর উপর রহিয়াছে অনেক। দ্রব্যসামগ্রী মাত্রকে পদার্থ বলা হয়। আর গতি, আলো, উত্তাপ প্রভৃতি এক একটি শক্তি বিশেষ। পদার্থ এবং শক্তির সমবেত ক্রিয়ার ফলে যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিতেছে। ইহাদের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। পদার্থকে আশ্রয় করিয়া শক্তির বিকাশ হয়; আবার শক্তি-রহিত পদার্থের অস্তিত্বও কল্পনার বাহিরে। শক্তি ও পদার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে যে বিভিন্ন ব্যাপার ঘটে উহাদের পিছনে রহিয়াছে এক একটি নির্দিষ্ট নিয়ম। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় যাহা এখন ঘটিল তাহা সকল সময় ঠিক ঠিক ঐ অবস্থায় নিশ্চয়ই ঘটিবে—ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম (Law of Nature)। প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির বিশদ বর্ণনা দেওয়া এবং ঐ সকল ঘটনার বিচার ও অনুশীলন দ্বারা অজ্ঞাত প্রাকৃতিক সত্য বা নিয়ম আবিষ্কার করাই পদার্থ-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞানের মত পদার্থ-বিদ্যার অনুশীলনও পর্যবেক্ষণ (Observation), পরীক্ষা (Experiment), প্রমাণ (Verification) এবং যুক্তি-বিচার (Reasoning) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।

পদার্থ ও শক্তি (Matter and Energy)

পদার্থ স্থান অধিকার করিয়া থাকে, উহার ওজন আছে। দর্শন, স্পর্শন, গন্ধ ও স্বাদ গ্রহণ দ্বারা আমরা বাহিরের সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। পদার্থের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে। পদার্থের প্রকৃত সংজ্ঞা বুঝিতে হইলে ঐ সাধারণ ধর্মগুলির সহিত আমাদের

পরিচয় হওয়া চাই। শক্তি কোন বস্তু নয়। আলো, উত্তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তি চোখে দেখা যায় না। তবে উহাদের প্রভাবে পদার্থের যে পরিবর্তন ঘটে তাহা হইতেই ঐ সমস্ত শক্তির ক্রিয়াশীলতা ও অস্তিত্ব আমরা অনুভব করিয়া থাকি।

পদার্থের তিন অবস্থা (Three States of matter)

আমরা যে সকল পদার্থের সহিত পরিচিত উহারা হয় লোহা, কাঠ, ইট প্রভৃতির মত কঠিন ; নয় জল, তেল, দুধ প্রভৃতির ন্যায় তরল, নতুবা বায়ুর মত গ্যাসীয়। সুতরাং সমস্ত পদার্থ তিনটির যে কোন একটি অবস্থায় থাকিতে পারে। ইহাদিগকে যথাক্রমে কঠিন (Solid), তরল (Liquid) এবং বায়বীয় বা গ্যাসীয় (Gaseous) বলা হয়। মাটি, চিনি, বরফ, কাঠ ইত্যাদি কঠিন পদার্থ। জল, তেল, পারদ, গ্লিসারিন, মধু প্রভৃতি তরল পদার্থ। বায়ু, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন—এইগুলি গ্যাসীয় পদার্থ। একই বস্তুকে আবার অনেক ক্ষেত্রে তিন অবস্থায়ই দেখা যায়। বরফ, জল, বাষ্প ইহারা একই উপাদানে গঠিত, শুধু বিভিন্ন অবস্থা। বরফ তাপে গলিয়া জল হয়, ঐ জল ফুটাইলে বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্প ঠাণ্ডা করিলে জল হয়। ঐ জলই খুব ঠাণ্ডা করিলে আবার বরফ হইয়া দাঁড়ায়। শীতকালে নারিকেল তেল, ঘি প্রভৃতি জমিয়া কঠিন হয়। গরম করিলে উহারা গলিয়া আবার তরল অবস্থা লাভ করে।

পদার্থের গঠন (Structure of matter)

একটি পদার্থকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাগ করিতে থাকিলে এমন অবস্থায় পৌছান যায় যখন ঐ পদার্থের গুণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহাকে আর ভাগ করা যায় না। পদার্থের এই ক্ষুদ্রতম অংশের নাম অণু

(Molecule)। কোন পদার্থের গুণ ও ধর্ম উহার অণুতেও বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক পদার্থের আবার নিজ নিজ গুণ অনুযায়ী অণু আছে। লোহার অণু আর তামার অণু এক নয়। জলের অণু চিনির অণু হইতে ভিন্ন। জলের অণুতে জলের ধর্ম, চিনির অণুতে চিনির ধর্ম থাকিয়া যাইবে।

বৈজ্ঞানিক জন্ ড্যাল্‌টন্ অণুর চেয়েও ক্ষুদ্রতর অংশের পরিকল্পনা করেন। ইহার নাম পরমাণু (Atom)। পরমাণু একা থাকিতে পারে না। সাধারণত দুইটি, তিনটি বা ততোধিক পরমাণু মিলিত হইয়া একটি অণুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং আমরা অণুকে পদার্থ মাত্রের ক্ষুদ্রতম অংশ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। এই ক্ষুদ্রতম অংশগুলি চোখে দেখা দূরের কথা, শক্তিশালী অণুবীক্ষণের কাছেও ধরা পড়ে না। সূচের ডগায় যে জল লাগিয়া থাকে উহাতে লক্ষ লক্ষ জলের অণু বিদ্যমান আছে।

জন্ ড্যাল্‌টন্

আপাতদৃষ্টিতে পদার্থমাত্র নিরেট বলিয়া মনে হয়, অর্থাৎ উহার প্রতি অংশটুকু যেন অপর অংশের সঙ্গে গায় গায় লাগিয়া আছে। প্রকৃতপক্ষে তাহা ঠিক নয়। আমরা দেখিয়াছি, পদার্থমাত্রই অসংখ্য অণুর সমবায়ে গঠিত। এই অণুগুলি কিন্তু পরস্পর সংলগ্ন নহে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম ব্যবধান আছে, ঐ ব্যবধানের নাম আণবিক ব্যবধান। আণবিক ব্যবধান এত অল্প, যে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু আণবিক ব্যবধানের প্রমাণ পাওয়া কঠিন নয়।

একটি গ্লাস জলে কানায় কানায় ভর্তি কর। উহার মধ্যে মিছরির ক্ষুদ্র একটি ডেলা ছাড়িয়া দিলে, জল গ্লাস উপ্‌ছিয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু মিছরির গুঁড়া একটু একটু করিয়া ছাড়িয়া দিলে অনেকটা মিছরি জলে গলান যায়, কিন্তু গ্লাস হইতে জল একটুও উপ্‌ছিয়া পড়ে না। ইহার কারণ বুঝিতে হইলে পদার্থের আণবিক ব্যবধানের অস্তিত্ব মানিয়া লইতেই হইবে। গুঁড়া মিছরি জলে দেওয়ামাত্র গলিয়া আণবিক অংশে পরিণত হয়, এবং ঐ অণুগুলি জলের আণবিক ব্যবধানের জায়গা জুড়িয়া থাকে, উহাদের জন্য অতিরিক্ত জায়গার দরকার হয় না, কাজেই জল গ্লাস হইতে পড়িয়া যায় না। কিন্তু মিছরির ডেলা জলে দেওয়া মাত্র সবটা একবারে গলিয়া আণবিক অংশে পরিণত হইতে পারে না, কাজেই উহার জায়গা করার জন্য জল পড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়।

এখন প্রশ্ন হইল, পদার্থের মধ্যে অণুগুলি কিভাবে থাকে। বস্তুত, অণুগুলি কখনও স্থির হইয়া থাকে না। আণবিক ব্যবধান থাকার জন্য অণুগুলি সচল অর্থাৎ উহারা পদার্থের মধ্যে চলিয়া বেড়ায়। কিন্তু প্রত্যেকটি অণু আবার প্রত্যেকটি অণুকে আকর্ষণ করিয়া কাছে আনিতে চায়। অতএব আমরা দেখিতেছি, পদার্থের গঠন তিনটি ব্যাপার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—(১) অণুগুলির পরস্পর ব্যবধান অর্থাৎ আণবিক ব্যবধান মাত্রা, (২) অণুগুলির পরস্পর আকর্ষণ অথবা আণবিক আকর্ষণ মাত্রা, এবং (৩) আণবিক গতির মাত্রা।

পদার্থের তিন অবস্থা ধারণের কারণ

কঠিন পদার্থের ভিতর অণুগুলির পরস্পর আকর্ষণ খুব বেশি, আণবিক গতিমাত্রা এবং আণবিক ব্যবধানও খুব কম। কাজেই অণুগুলি কাছাকাছি জমাট বাঁধিয়া থাকে, পদার্থটিও কঠিন অবস্থা লাভ করে। তরল পদার্থে আণবিক আকর্ষণ কম কিন্তু আণবিক ব্যবধান ও

গতিমাত্রা বেশি বলিয়া উহার অণুগুলি অপেক্ষাকৃত আল্‌গা অবস্থায় থাকে এবং পৃথিবীর আকর্ষণের জন্য নীচের দিকে গড়াইয়া যায়। এই কারণে তরল পদার্থকে কোন কঠিন জিনিষ যেমন, ধূলা বা মাটির মত স্তূপ করিয়া রাখা যায় না, উহাদের রাখিবার জন্য পাত্রের প্রয়োজন হয়। পাত্রের মধ্যে রাখিলেও উহার উপরিভাগ আপনা হইতে সমতল হইয়া ভূবক্ষের সমান্তরাল হইয়া দাঁড়ায়। গ্যাসীয় পদার্থে আণবিক আকর্ষণ অত্যল্প, আর আণবিক ব্যবধান ও গতিমাত্রা থাকে খুব বেশি। কাজেই উহার অণুগুলি খুব স্বাধীনভাবে চলিয়া বেড়ায় এবং চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। গ্যাসীয় পদার্থ রাখিতে হইলে খোলা পাত্র চলে না, আবদ্ধ পাত্রের দরকার হয়।

কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিতে থাকিলে উহার আণবিক গতিমাত্রা ও ব্যবধান খুব বাড়িয়া যায়, আণবিক আকর্ষণ উহাদের জমাট রাখিতে পারে না, কাজেই পদার্থটি তরল অবস্থা লাভ করে। তেমনি তরল পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে আণবিক ব্যবধানের বৃদ্ধি এবং আণবিক গতিমাত্রার বিশেষ প্রাবল্য হয়, ফলে উহা গ্যাসের অবস্থা লাভ করিয়া থাকে।

বরফ তাপে গলিয়া জল হয়, জল উত্তপ্ত করিলে বাষ্পে পরিণত হয়, ইহার কারণ এখন বুঝিতে পারিলে। সীসা, লোহা, সোনা, পিতল প্রভৃতি অনেক কঠিন বস্তু অধিক তাপে গলিয়া তরল হয়। অনেক কঠিন বস্তু উত্তাপ পাইয়া একেবারেই গ্যাসীয় অবস্থা লাভ করিয়া থাকে, যেমন, কর্পূর, আইওডিন। তাপ প্রয়োগে যেমন আণবিক ব্যবধান ও গতিমাত্রার বৃদ্ধি হয়, তাপ কমাইলেও তেমনি উহাদের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। এইজন্য খুব ঠাণ্ডা করিলে গ্যাসীয় পদার্থ তরল অবস্থা এবং তরল পদার্থ কঠিন অবস্থা লাভ করিয়া থাকে। বায়ু চোখে দেখা যায় না। কিন্তু বায়ুকে তরল অবস্থায় আনা সম্ভব হইয়াছে।

পদার্থের কতিপয় সাধারণ গুণ

(General Properties of matter)

সমস্ত পদার্থের কতকগুলি সাধারণ গুণ আছে। যথা—(১) গুরুত্ব (Mass), (২) ওজন (Weight), (৩) ব্যাপকতা (Extensibility), (৪) ছিদ্রত্ব (Porosity) এবং (৫) স্থিতি-স্থাপকতা (Elasticity)।

কোন পদার্থের মধ্যে যতটুকু বস্তু আছে তাহাকে উহার বস্তু-পরিমাণ অথবা গুরুত্ব বলা হয়। পদার্থের ওজন গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। এখন প্রশ্ন হইল পদার্থের ওজন বলিতে কি বুঝায়?

কোন জিনিষ অধৃত অবস্থায় শূন্যে রাখিলে উহা মাটিতে পড়িয়া যায়। কলম, দোয়াত, বাক্স টেবিলের উপর আছে বলিয়া উহারা পড়িয়া যায় না। কিন্তু শূন্যে রাখিয়া ছাড়িয়া দিলে উহারা মাটিতে পড়িয়া যাইবে। নীচের দিকে এমনি পড়িয়া যাওয়ার দৃষ্টান্ত আমরা সর্বদাই দেখিতেছি। গাছ হইতে ফল পড়িতেছে, মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়ে, টেবিলের উপর হইতে বইখানা নীচে পড়িয়া গেল, দালান হইতে ইট খসিয়া পড়িল। এই সমস্ত নির্জীব পদার্থ কিরূপে আপনা-আপনি পড়িয়া যায়?

বস্তুতঃপক্ষে এই বিশ্বচরাচরে সমস্ত জিনিষ পরস্পরকে অদৃশ্যভাবে আকর্ষণ করিতেছে। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী, পাহাড়, গাছ, তোমাদের কলম, বই, ইহাদের প্রত্যেকটি অন্য প্রত্যেকটিকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ শক্তি প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু ইহার প্রভাব আমরা সর্বদা অনুভব করি। পৃথিবী ও উহার উপরস্থ সমস্ত পদার্থের মধ্যে এই আকর্ষণ বিশেষ প্রবল। এই আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষ (Gravitation) নামে পরিচিত। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক্ নিউটন্ ইহার আবিষ্কারক

যে জিনিষের গুরুত্ব যত বেশি উহার আকর্ষণ শক্তিও তত বেশি। পৃথিবীর গুরুত্ব উহার উপরস্থ সমস্ত জিনিষের গুরুত্ব অপেক্ষা অনেক গুণ

বেশি। কাজেই বস্তুমাত্র পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে বিশেষ জোর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। আমরা যাহাকে পদার্থের ওজন বলি তাহার কারণ হইল এই আকর্ষণ শক্তি। কোন পদার্থের ওজন আর গুরুত্ব এক কথা নয়। পদার্থটি যতটা জোরে নীচের দিকে আকৃষ্ট হয়, উহাই হইল পদার্থটির ওজন। কোন বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণের মাত্রা আবার পৃথিবী হইতে বস্তুটির দূরত্বের উপর নির্ভর করে। ভূবক্ষের যত নিকটে বস্তুটি থাকিবে তত বেশি জোরে উহা পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইবে। অর্থাৎ বস্তুটির ওজনও তত বেশি হইবে। সমুদ্রের তীরে কোন পদার্থের যাহা ওজন, তার চেয়ে অনেক কম হয় পাহাড়ের উপরে। পৃথিবীর কেন্দ্রে কোন পদার্থ লওয়া সম্ভব হইলে সেখানে উহার কোনও ওজন থাকে না। কিন্তু পদার্থটির গুরুত্ব সর্বত্রই এক। অতএব দেখা গেল জিনিষের গুরুত্ব ঠিক থাকিলেও স্থানভেদে উহার ওজন ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে।
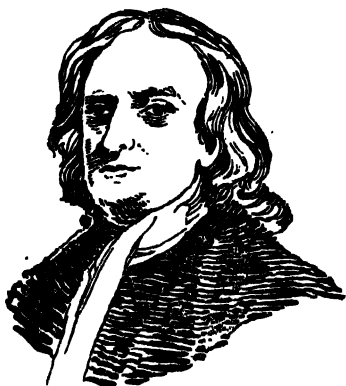
স্যার আইজাক্ নিউটন্

পদার্থমাত্রই স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সেইজন্য একই স্থানে এক সময় একাধিক বস্তু থাকিতে পারে না। পদার্থের এই ধর্মের নাম ব্যাপকতা।

অনেক পদার্থে অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য ছিদ্র বর্তমান। মাটিতে জল পড়িলে; উহা সছিদ্র বলিয়া জল শুষিয়া লয়। একটা কাঠের মধ্যে পেরেক বসাইলে কাঠ স্থানচ্যুত হইয়া যায়। বেলেমাটির তৈয়ারি কুঁজার গায়ে ছিদ্র থাকায় ভিতর হইতে জল চুয়াইয়া আসে।

ব্লটিং কাগজে লিখিবার কাগজ অপেক্ষা বেশি ছিদ্র আছে বলিয়া উহারা কালি শোষণ করে। আণবিক ব্যবধান থাকার জন্য সমস্ত পদার্থকেই কম-বেশি সছিদ্র বলা যাইতে পারে। এই কারণে একই পাত্রে বিভিন্ন বায়বীয় কিম্বা তরল পদার্থ মিশিয়া অথবা বিভিন্ন কঠিন পদার্থ তরল পদার্থে দ্রবীভূত হইয়াও থাকিতে পারে।

স্থিতিস্থাপকতা পদার্থের আর একটি বিশেষ ধর্ম। তরল পদার্থে এই গুণ তেমন নাই বলিলেই চলে। একটি চারি ইঞ্চি সরু রবারকে টানিলে উহা দৈর্ঘ্যে বাড়ে ; ছাড়িয়া দিলে আবার পূর্বের চারি ইঞ্চিতে দাঁড়ায়। ঘড়ির কুণ্ডলী-পাকান স্প্রিং টানিয়া ধরিলে সোজা হয়, আবার ছাড়িয়া দেওয়ামাত্র পূর্বাবস্থা লাভ করে। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ু চাপে সংকুচিত হওয়ায় উহার আয়তন কমে। চাপ সরাইলেই বায়ু আবার পূর্বের আয়তন ফিরিয়া পায়। অতএব দেখা যায় কতকগুলি পদার্থের উপর শক্তি প্রয়োগ করিলে উহাদের দৈর্ঘ্য বা আয়তন পরিবর্তিত হয়, ঐ শক্তি অপসৃত হইলে উহারা আবার পূর্বের দৈর্ঘ্য বা আয়তন লাভ করে। পদার্থের এই ধর্মের নাম স্থিতিস্থাপকতা। শক্তি খুব বেশি পরিমাণে প্রযুক্ত হইলে অনেক ক্ষেত্রেই আকারের পরিবর্তন স্থায়ী হয়, শক্তির অপসরণে পূর্বায়তন ফিরিয়া আসে না। কাজেই স্থিতিস্থাপকতার নির্দিষ্ট সীমা আছে।

প্রশ্নমালা

(১) পদার্থের তিন অবস্থার কারণ কি ?

(২) পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ কি ? আণবিক ব্যবধানের অস্তিত্ব কিরূপে প্রমাণ করিতে পার ?

(৩) পদার্থের ওজন ও গুরুত্বের প্রভেদ বুঝাও।

(৪) স্থিতিস্থাপকতা কাহাকে বলে ? উদাহরণ দ্বারা বুঝাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বায়ু ও উহার প্রাকৃতিক ধর্ম

(Air and its Physical Properties)

গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে বায়ুর সঙ্গেই আমরা সব চেয়ে বেশি পরিচিত। সমস্ত পৃথিবীর চতুর্দিক বায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভূপৃষ্ঠের প্রায় দেড়শত মাইল ঊর্ধ্ব অবধি বায়ু বিস্তৃত আছে এবং ক্রমে কমিতে কমিতে মহাশূন্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

বায়ু চোখে দেখা যায় না, কিন্তু ছোট বড় অনেক প্রাকৃতিক ব্যাপার ইহার অস্তিত্ব জানাইয়া দেয়। ঝড় ঝাপ্টায় গাছের ডাল পালার ভয়ানক আলোড়ন হয়; নদী, পুষ্করিণীর জলে তরঙ্গ উঠে—এ সমস্তই প্রবহমান বায়ুর কীর্তি। বায়ুর একেবারে শান্ত অবস্থায় আমাদের হাত বা একখানা পাখা ইতস্ততঃ নাড়িলে চাড়িলে বায়ুর অস্তিত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে যে সকল জায়গা বা পাত্র খালি মনে হয় উহারা প্রকৃতপক্ষে বায়ুপূর্ণ থাকে। বাটির তলায় কিছু জল আছে, উপরটা ফাঁকা—মনে হয় ওখানে কিছুই নাই। বাক্সের মধ্যে বই আছে, অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী আছে, বাকি জায়গাটা মনে হয় খালি। কিন্তু এরূপ মনে হওয়া ঠিক নয়। বাটির উপরকার অংশে আছে বায়ু; বাক্সের ভিতরের শূন্য স্থানগুলিও সব বায়ুতে পরিপূর্ণ। একটি খালি বোতল বা ঘটির মুখ উঁচু করিয়া জলে ডুবানো হইল। অমনি দেখা যায় বোতল বা ঘটির ভিতরে অদৃশ্যভাবে যে বায়ু ছিল, উহা বুদ্বুদ রচনা করিয়া সশব্দে বাহির হইয়া যাইতেছে।

বায়ুর স্বাদ নাই, বর্ণ নাই। ইহার কোন গন্ধ নাই। চঞ্চল ও বিচরণশীল বায়ুই অন্যান্য জিনিষের গন্ধ চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেয়, আমাদের নাকের কাছে বহিয়া আনে। বায়ু স্বচ্ছ পদার্থ। উহার মধ্য দিয়া সব জিনিষ দেখা যায়। কুয়াসা, কয়লার ধুঁয়া, উড্ডীয়মান ধূলিকণা অনেক সময় বায়ুর স্বচ্ছতা নষ্ট করিয়া দেয়। কুয়াসা, ধুঁয়া প্রভৃতি দূর হইলেই বায়ুর ঐ স্বচ্ছতা ফিরিয়া আইসে।

বায়ু যেমন সংকোচনশীল, তেমনি প্রসারণশীল। চাপ তুলিয়া লইলে আয়তনের যে বৃদ্ধি উহাই প্রসারণ, আবার চাপ প্রয়োগ দ্বারা আয়তনের হ্রাসপ্রাপ্তির নাম সংকোচন। এই দুইটি বিশিষ্ট গুণের জন্য অল্প একটু বায়ু যেমন খুব কম জায়গায় রাখা যায়, তেমনি ঐ অল্প পরিমাণ বায়ুই প্রকাণ্ড বড় আবদ্ধ পাত্রের মধ্যে ভর্তি করিয়া রাখা সম্ভব। একটি সাধারণ পরীক্ষার আলোচনা করা যাউক।

একটি খালি কলসীর মুখ উপুড় করিয়া জলের মধ্যে ডুবাইয়া হাত দিয়া চাপিয়া ধরিলে হাতের উপর একটা চাপ অনুভূত হয়। কলসীর উপর হইতে হাত তুলিয়া লইলে দেখা যায়, উহা উপরের দিকে একটু লাফাইয়া উঠিয়া আবার পূর্বাবস্থায় আসিয়া স্থির হইল। এরূপ হয় কেন? জলের ভিতর কলসীটি উপুড় করা অবস্থায় উহার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ু আটক পড়ে। তারপরে কলসীটি চাপিয়া ধরাতে ভিতরকার আবদ্ধ বায়ু জলের চাপে সংকুচিত হয় এবং তজ্জন্য কলসীর মধ্যে কিছু জল প্রবেশ করে। ঐ সংকুচিত বায়ু কলসীর তলদেশে একটা চাপ দেয়, উহাই গিয়া হাতে লাগে। কিন্তু কলসীর উপরকার চাপ তুলিয়া লওয়ামাত্র উহা প্রসারিত হইয়া পূর্বায়তন লাভ করে। বায়ু হঠাৎ প্রসারিত হয় বলিয়া কলসীর তলায় একটা ধাক্কা দেয়, ফলে কলসীটি উপরের দিকে একটু লাফাইয়া উঠে।

বায়ু এবং গ্যাসীয় পদার্থমাত্রই স্থিতিস্থাপক। উপরে কলসীর পরীক্ষা

দ্বারা বায়ুর স্থিতিস্থাপকতার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। একটু বিচার করিলেই দেখা যায় যে বায়ুর স্থিতিস্থাপক ধর্মের সহিত উহার সংকোচন-শীলতা ও প্রসারণশীলতা গুণ দুইটির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। বায়ু স্থিতিস্থাপক বলিয়া ফুটবল, টেনিসবল প্রভৃতির আকার এক ভাবে থাকে। শত পিটুনী ও আঘাতেও উহাদের আকার স্থায়ীভাবে বদলায় না। বায়ু শব্দের বাহন। বায়ুতে শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে, আমাদের কানে আসে। তাই আমরা কথা শুনি, গান শুনি, আরও কত বিচিত্র শব্দের সহিত পরিচিত হই। যেখানে বায়ুশূন্য, একেবারে ফাঁকা সেখানে কিছুই কর্ণগোচর হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, স্থিতিস্থাপক ধর্মের জন্যই বায়ু শব্দ বহন করার ক্ষমতা লাভ করিয়াছে।

বায়ুর ওজন আছে। অল্পপরিমাণ বায়ু এত হালকা যে উহার ওজন ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু খুব বেশি পরিমাণ বায়ুর ওজন মোটেই তুচ্ছ করা চলে না। ভূপৃষ্ঠের উপর এক ঘন ফুট বায়ুর ওজন মাত্র তিন তোলা। আবার বিশ ফুট উচ্চ, বিশ ফুট দীর্ঘ এবং দশ ফুট প্রস্থ এরূপ জায়গায় প্রায় চারি মণ ওজনের বায়ু থাকিতে পারে। বায়ুর যে ওজন আছে, নীচের পরীক্ষা তাহার প্রমাণ।

স্টপ কক্ বা পেঁচকল যুক্ত বড় একটি কাচের গোলক সংগ্রহ কর। বাতপাম্পের সাহায্যে গোলকটিকে বায়ুশূন্য কর। তারপর পেঁচকল দ্বারা উহার মুখ বন্ধ করিয়া সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে এই বায়ুশূন্য গোলকের ওজন লও। তুলাদণ্ডের ভারসাম্য অবস্থায় পেঁচকল ঘুরাইয়া গোলকের মুখ খুলিয়া দাও। দেখিবে, বাহিরের বায়ু সশব্দে গোলকের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, আর তুলাদণ্ডের যে পাল্লাটির উপর গোলক বসান ছিল উহা অতিরিক্ত ভারের জন্য নীচের দিকে নামিয়াছে, অর্থাৎ গোলকের ওজন বাড়িয়া গিয়াছে। অপর পাল্লায় উপযুক্ত ওজন চাপাইয়া বায়ুপূর্ণ

গোলকের ওজন লইলে দেখিবে এই ওজন পূর্বেকার বায়ুশূন্য গোলকের ওজনের চেয়ে বেশি। গোলকের নিজ ওজন অপরিবর্তনীয়; অতএব দ্বিতীয় বার ওজনের বৃদ্ধিটা গোলকে যে পরিমাণ বায়ু প্রবেশ করিয়াছে
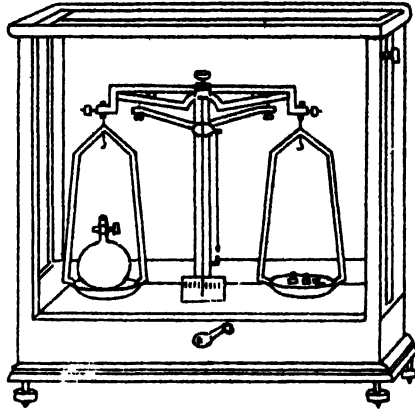
বায়ুর ওজন

উহারই ওজন বলিতে হইবে। অবশ্য এই ওজন এত কম যে খুব সূক্ষ্ম ও নির্ভুল তুলাদণ্ড দ্বারাই বাহির করা সম্ভব।

বায়ুর সচলতা একটি বিশেষ গুণ। এই গুণের জন্যই আমরা অনায়াসে ইহার মধ্য দিয়া বিচরণ করিয়া থাকি, কোন প্রকার বাধা পাই না।

বায়ুমণ্ডল ও উহার চাপ
(Atmosphere and its Pressure)

পৃথিবীর চতুর্দিকে যে জায়গা দখল করিয়া বায়ু আছে উহার নাম বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের আবার বিভিন্ন স্তর আছে। প্রত্যেক

নীচেকার স্তরের বায়ু স্বাভাবিক অবস্থায় উপরের অন্যান্য স্তরের বায়ু অপেক্ষা ভারি। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের বায়ু পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলিয়া ঐ বায়ু পৃথিবীকে আবেষ্টন করিয়া আছে। যাহার ওজন আছে তাহাই অন্য জিনিষের উপর চাপ দেয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায়, প্রতি বর্গ-ইঞ্চি জায়গার উপর বায়ুর চাপ প্রায় ৭½ সের।

বায়ু উর্ধ্বদিকে, নিম্নদিকে এবং পার্শ্বে অর্থাৎ সকল দিকেই চাপ দেয়। কিন্তু সব দিকে এই চাপ সমান বলিয়া বায়ুমণ্ডলের চাপ বাহিরে প্রকাশ পায় না। হাতের পাতা বিস্তৃত করিলে উহার উপর বায়ু প্রায় দুই মণ ওজনের নিম্নচাপ প্রয়োগ করে; আবার ঐ বায়ুই হাতের তলায় ঠিক সমান ওজনের উর্ধ্বচাপ দেয়। এই দুই চাপ পরস্পর সমান ও বিপরীত বলিয়া হাতে কোন চাপ অনুভূত হয় না। যে কোন পাত্র বা প্রকোষ্ঠের বায়ুর সহিত বাহিরের মুক্ত বায়ুর সংযোগ থাকিলেই উহাদের চাপ সমান হইবে। আবার বায়ুমণ্ডলের নির্দিষ্ট চাপে কোন পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ু থাকিতে পারে বা আবদ্ধ করা যায়। কোন প্রকারে পাত্রস্থ বায়ুর এই পরিমাণ কমানো বাড়ানো গেলে উহার চাপ বায়ুমণ্ডলের তুলনায় কম বা বেশি হইবে। একটি খোলা ছোট বোতলের মধ্যে খুবই অল্প বায়ু থাকে কিন্তু বাহিরের বায়ু যেমন সব দিক হইতে বোতলের গায়ে চাপ দেয়, ভিতরের অল্প বায়ুও সমান মাত্রায় সব দিক দিয়া বোতলের ভিতরকার দেওয়ালে চাপ প্রয়োগ করে। বোতলটি ছিপিবন্ধ করিলে তখনও ভিতরকার বায়ুর চাপ বাহিরের বায়ুর চাপের সমান থাকিয়া যায়। কাজেই বাহিরের বায়ুর চাপে বোতল ভাঙ্গিয়া যায় না। এইরূপ সর্বত্র বিপরীতমুখী সমান চাপ আমাদের অথবা অন্যান্য জিনিষের উপর পড়ে বলিয়া বায়ুমণ্ডলের চাপ অনুভব করা যায় না; কোন জিনিষের উপর ঐ চাপের প্রভাবও দেখা যায় না।

ম্যাগডেবর্গ্ অর্ধ-গোলকের পরীক্ষা
(Magdeburg's Hemisphere Experiment)

ধাতুনির্মিত দুইটি অর্ধ-গোলক পাত্র লইয়া পরীক্ষাটি করিতে হয়। অর্ধ-গোলক পাত্র দুইটি মুখে মুখে সংযুক্ত করিলে একটি গোলকের আকার লাভ করে এবং উহাদের সন্ধিস্থলে একটুও ফাঁক থাকে না। একটি অর্ধ-গোলক পাত্রের সঙ্গে শুধু কড়া লাগান আছে; অপরটির সঙ্গে পেঁচকলযুক্ত কড়া লাগান। পেচকলটি যে নলের সহিত যুক্ত উহার একদিক বাড়ানো এবং খোলা। উহার মধ্য দিয়া অর্ধ-গোলক
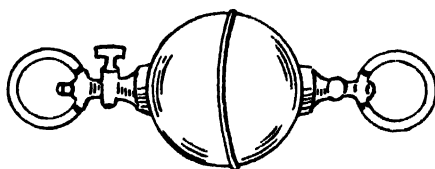
অর্ধ-গোলকের পরীক্ষা

পাত্র দুইটির যুক্তাবস্থায় উহাদের ভিতরকার বাতাস টানিয়া বাহির করা যাইতে পারে। পরীক্ষার প্রথমে অর্ধ-গোলক পাত্র দুইটি মুখে মুখে যুক্ত করিয়া দেখা যায় হাতের সামান্য টানে উহারা পৃথক হইয়া যায়। কিন্তু উহাদের যুক্তাবস্থায় ভিতরের সমস্ত বায়ু বাতপাম্পের সাহায্যে বাহির করিয়া পেঁচকল সাহায্যে খোলামুখ বন্ধ করিয়া দিলে ভিতরে বায়ুর কোন চাপ থাকে না। বাহিরের চারিদিকের চাপে উহারা দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইয়া পড়ে। ঐ অবস্থায় দুই জন শক্তিশালী মানুষও উহাদিগকে বিপরীত দিক হইতে টানিয়া পৃথক করিতে পারে না।

এই পরীক্ষাটি খুব পুরাতন। খুব জাঁকজমকের সহিত প্রথম সম্পন্ন হইয়াছিল ম্যাগডেবর্গ্ সহরে—জার্মান সম্রাটের সম্মুখে। অটো ভন্

গ্যারিকের নূতন উদ্ভাবিত বাত-পাম্প দ্বারা যুক্ত গোলকার্ধ পাত্র বায়ুশূন্য করা হয়। যখন দুইজন পালোয়ান দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন গোলকার্ধ পাত্র দুইটি পৃথক করিতে পারিল না, তখন দুইদিকের কড়ার সঙ্গে চারিটি করিয়া ঘোড়া জুড়িয়া দেওয়া হইল, কিন্তু উহাদের বিপরীতমুখী প্রবল টান

বায়ুর প্রবল চাপ

বায়ুর প্রবলতর চাপকে খর্ব করিতে পারিল না। তারপরে যেমনি ভিতরে বায়ু প্রবেশ করান হইল, অমনি একটি বালক আসিয়া অনায়াসে উহা খুলিয়া দিল। এই পরীক্ষায় অবশ্য দুইটি খুব মজবুত, দৃঢ় ধাতু-নির্মিত গোলকার্ধ পাত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বায়ুর নিম্নচাপ (Downward pressure)

দুই মুখখোলা একটি কাচপাত্র বাতপাম্পের প্লেটের উপর স্থাপন কর। প্লেট ও পাত্রের সন্ধিস্থলে ফাঁক থাকিলে, ভেসিলিন্ দ্বারা বন্ধ কর। এখন পাত্রের উপরের খোলামুখ পাতলা রবার দিয়া এমন ভাবে মুড়িয়া ফেল যেন উহা বেশ সমতল থাকে। তারপর পাম্প চালাইয়া ভিতরকার বায়ু যেমনি ক্রমে বাহির করিতে থাকিবে অমনি দেখিতে পাইবে রবার নীচের দিকে নামিতে নামিতে শেষটায় সশব্দে ফাটিয়া গেল। কেন এরূপ হয়? পাম্প চালাইবার পূর্বে রবারের উপরে ও নীচে বায়ুর যথাক্রমে নিম্ন ও উর্ধ্ব চাপ সমান ছিল বলিয়া রবার সমতল ছিল। কিন্তু কাচপাত্রটি বায়ুশূন্য করার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরকার বায়ুর

উধ্বর্চাপের পরিমাণ ক্রমে কমিতে থাকে। কিন্তু বাহিরের বায়ুর প্রবল নিম্নচাপ সমান মাত্রায়ই বরাবর রবারের উপর প্রযুক্ত হয়।
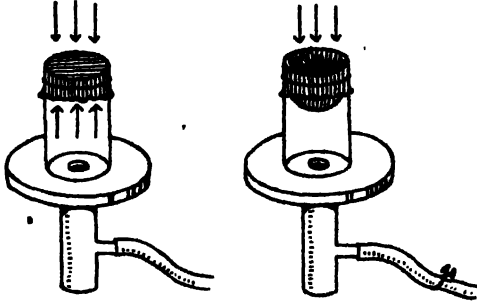
বায়ুর নিম্নচাপে রবার ফাটিয়া গেল

এই নিম্নচাপে রবারটি ক্রমে নামিয়া আসে এবং শেষে প্রসারণের টান সামলাইতে না পারিয়া ফাটিয়া যায়।

বায়ুর উধ্বর্চাপ (Upward pressure)

একটি কাচের গ্লাস জলে পরিপূর্ণ করিয়া এক খণ্ড কাগজ উহার মুখে এমন ভাবে চাপিয়া লাগাইয়া দাও যেন ভিতরে একটুও বাতাস প্রবেশ না করে। এইবার কাগজের উপর বাম হাতের চাপ রাখিয়া ডানহাত দ্বারা গ্লাসের তলদেশ ধরিয়া গ্লাসটি আস্তে আস্তে উপুড় কর এবং কাগজের তলা হইতে বাম হাত সাবধানে সরাইয়া লও। দেখ, ওজন থাকা সত্বেও গ্লাসের জল কাগজ ঠেলিয়া নীচে পড়িয়া যাইতেছে না ও গ্লাসের মুখে সংলগ্ন হালকা কাগজখানি জলের সমস্তটা ভিতরে আটকাইয়া রাখিয়াছে। বায়ুর
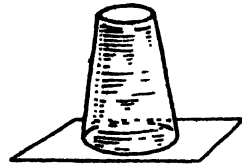
বায়ুর উধ্বর্চাপে কাগজ গ্লাসের মুখে লাগিয়া রহিল

উর্ধ্বচাপের জন্যই এরূপ হয়। উপুড় করা অবস্থায় গ্লাসের মধ্যে আছে শুধু জল। কাগজখানির একদিকে অর্থাৎ উপরে জলের নিম্নচাপ (পরে দ্রষ্টব্য) এবং অপর দিকে অর্থাৎ নীচে আছে বায়ুর উর্ধ্বচাপ। জলের নিম্নচাপের তুলনায় বায়ুর উর্ধ্বচাপ অনেক বেশি বলিয়া বায়ুর উর্ধ্বচাপে কাগজখানি মুখে লাগিয়া রহিল। পরীক্ষার প্রথমে কাগজ চাপিবার সময় যদি একটু বায়ুও গ্লাসের মধ্যে প্রবেশ করিত, তবে ঐ আবদ্ধ বায়ু কাগজের উপর একটা নিম্নচাপ দিত, আর ঐ নিম্নচাপ হইত বাহিরের বায়ুর উর্ধ্বচাপের সমান, কাজেই ঐ দুই চাপ পরস্পর কাটাকাটি করিত। ফলে জলের নিম্নচাপে কাগজখানি আপনা আপনি খসিয়া পড়িত।

বায়ুর সমস্তদিকে চাপ প্রয়োগ

একটি ফুটবল ব্লাডারে যখন পাম্প করিয়া বায়ু পূর্ণ করা হয়, তখন উহা সকলদিকে সমান পরিমাণ ফুলিয়া উঠে ও গোল হয়। বায়ু-মণ্ডলের চাপ কোন এক দিক হইতে ব্লাডারের উপর প্রযুক্ত হইলে, ব্লাডারের সেই দিকের অংশ কম ফুলিয়া উঠিত। ব্লাডার কিন্তু সকল দিকেই সমান ভাবে ফুলিয়া উঠে। কাজেই বলিতে হয় সকল দিক হইতে বায়ুর সমান চাপ পড়ে বলিয়া উহা গোল হইয়া ফুলিয়া উঠে।

বায়ুমণ্ডলের চাপ ও চাপমান যন্ত্র
(Atmospheric pressure and Barometer)

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বায়ুমণ্ডলের চাপও বিভিন্ন। কোন জায়গায় বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ভর করে ঐ জায়গার বরাবর উর্ধ্বে যে বায়ুস্তম্ভ আছে তাহার দৈর্ঘ্যের উপরে। দৈর্ঘ্য বেশি হইলে চাপও বেশি হইয়া থাকে। এইজন্য সমুদ্রতটের নিকটে এই চাপের পরিমাণ যত, পাহাড়ের

চূড়ায় বায়ুমণ্ডলের চাপ তাহার চেয়ে অনেক কম। বায়ুমণ্ডলের চাপ বাহির করিবার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় উহার নাম চাপমান যন্ত্র বা ব্যারমিটার। এই যন্ত্রনির্মাণের মূল তথ্য খুব সহজেই বুঝিবে। একটি পাত্রে জল রাখিয়া উহার মধ্যে তুই-মুখ-খোলা একটি কাচনলের খানিকটা ডুবাইলে দেখা যায়, নলের ভিতরের ও বাহিরের জলের উপর বায়ুর চাপ সমান ভাবে পড়ে বলিয়া জল ভিতরে ও বাহিরে এক সমতলে থাকে। এখন যদি মুখ দিয়া চুষিয়া নলের ভিতরকার খানিকটা বায়ু বাহির করা হয়, তবে পাত্রের কতকটা জল নলে প্রবেশ করিবে, নল ও পাত্রের জলের উপরিভাগ এক সমতলে আর থাকিবে না। নলের ভিতরের সমস্ত বায়ু চুষিয়া লইলে, জল নলের ভিতর প্রবেশ করিয়া মুখ পর্যন্ত পৌঁছিবে। তখন নলে বায়ু না থাকায় বায়ুর কোন নিম্নচাপ নলের মধ্যস্থ জলের উপর পড়িবে না; অথচ নলের বাহিরের জলের উপর বায়ুর চাপ পূর্ববৎ থাকিয়া যায়। ফলে ইহার প্রবল চাপে পাত্রের জল নলের ভিতরে আসিতে বাধ্য হয়। খুব দীর্ঘ একটি নল লইয়া ঐরূপ বায়ুশূন্য করিলে, বাহিরের বায়ুর চাপে নলের মধ্যে জল প্রায় ৩৪ ফুট উঁচুতে উঠিতে পারে। অর্থাৎ ভূবকের উপর বায়ুমণ্ডলের যে চাপ পড়ে উহা ৩৪ ফুট জলস্তম্ভের ভার বহন করিতে সমর্থ। জলের পরিবর্তে কত দীর্ঘ পারদস্তম্ভের ভার বায়ুমণ্ডলের চাপ বহন করিতেছে, তাহা দেখিয়া বিভিন্ন স্থানের বায়ুমণ্ডলের চাপ

নলে জল উঠিল

বাহির করা হয়। আমরা যে সমস্ত চাপমান যন্ত্র বা ব্যারমিটার ব্যবহার করি উহাতে পারদই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নে একটি সরল চাপমান যন্ত্রের নির্মাণ প্রণালী বলা হইল।

সরল চাপমান যন্ত্র (Simple Barometer)

এক-মুখ-বন্ধ একটি লম্বা কাচনল (৩ ফুট দীর্ঘ) পারদে পরিপূর্ণ কর। পারদ ভর্তি করার সময় যেন একটুও বায়ু ভিতরে থাকিয়া না যায়। এখন পারদপূর্ণ নলের খোলা মুখটি ডানহাতের কোন অঙ্গুলি দিয়া বেশ জোরে চাপিয়া ধর এবং নলটি উপুড় করিয়া উক্ত মুখটি পারদপূর্ণ একটি পাত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া ডানহাত সরাইয়া লও। তারপর নলটি ঐ পাত্রের পারদের উপর লম্বভাবে দাঁড় করাইয়া কাঠের ক্ল্যাম্প দিয়া আটকাইয়া দাও। দেখ, খানিকটা পারদ নল হইতে নামিয়া আসিল এবং নলের মধ্যেও অনেক উঁচু অবধি একটি পারদস্তম্ভ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছে। স্কেল দিয়া মাপিলে দেখিবে, এই পাত্রের পারদের উপরিভাগ হইতে পারদস্তম্ভের উচ্চতা প্রায় ৩০ ইঞ্চি। অতএব জানা গেল, বায়ুমণ্ডলের চাপে প্রায় ৩০ ইঞ্চি উঁচু একটি পারদস্তম্ভ কোন বায়ুশূন্য কাচনলের মধ্যে দাঁড়াইতে পারে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের চাপ আর এই পারদস্তম্ভের ওজন সমান। কাচনলটির মুখের ক্ষেত্রফল যাহাই হউক না কেন, বায়ুর চাপে উহার মধ্যে প্রায় ৩০ ইঞ্চি পারদস্তম্ভ দাঁড়াইবেই। বায়ুমণ্ডলের চাপ বাড়িলে
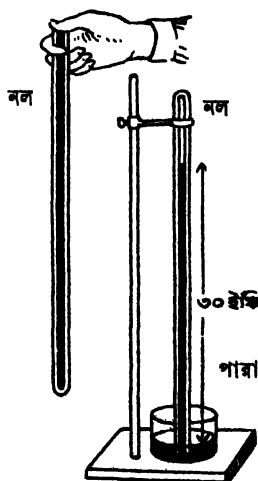
সরল চাপমান যন্ত্র

ঐ পাত্রের খানিকটা পারদ কাচনলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পারদস্তম্ভের দৈর্ঘ্য বাড়াইয়া দেয়, আবার চাপ কমিলে কাচনলের ভিতরকার পারদ খানিকটা ঐ পাত্রে নামিয়া আসিয়া ঐ পারদস্তম্ভের দৈর্ঘ্য কমাইয়া দেয়। কাজেই পারদস্তম্ভের দৈর্ঘ্য দ্বারাই আমরা বায়ুমণ্ডলের চাপ সাধারণত প্রকাশ করিয়া থাকি। উপরে এই যে পারদপূর্ণ কাচনলটির কথা বলা হইল, ইহা চাপমান যন্ত্র নামে পরিচিত। কাচনলের উপরিভাগে যে ফাঁকা জায়গা দেখা যায়, উহাতে একটুও বায়ু নাই। ঐ শূন্য স্থানটিকে টরিসেলিয় ভ্যাকুয়াম (Torricellian Vacuum) বলা হয়। কোন প্রকারে ঐ ফাঁকে বায়ু ঢুকিয়া গেলে যন্ত্রটি অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। তখন সাবধানে ঝাঁকানি দিয়া ঐ বায়ু বাহির করিয়া দিলে যন্ত্রটি আবার দোষমুক্ত হয়।

বায়ুমণ্ডলের চাপ বলিতে কোন জায়গার উপর উহার সমগ্র চাপ বুঝায় না, ঐ জায়গার প্রতি বর্গইঞ্চির উপর যে চাপ তাহাই বুঝায়। নলের ক্ষেত্রফল ১ বর্গইঞ্চি হইলে, ৩০ ইঞ্চি পারদস্তম্ভের আয়তন হইবে ৩০ ঘন ইঞ্চি। ৩০ ঘনইঞ্চি পারদের ওজন ১৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৭½ সের। অতএব, ভূপৃষ্ঠের প্রতি বর্গইঞ্চি স্থানের উপর বায়ুমণ্ডল ৭½ সের ওজনের সমান চাপ দিয়া থাকে। সমুদ্রতটে পরীক্ষা করিলে চাপের এই পরিমাণটি পাওয়া যায়। সমুদ্রতট হইতে যতই উঁচুতে যাওয়া যায়, ততই ইহার মাত্রা কমিতে থাকে। আমাদের শরীরের ক্ষেত্রফল গড়ে ২০০০ বর্গইঞ্চি ধরিলে, ৩৭৫ মণের বেশি চাপ বায়ু আমাদের উপর বিস্তার করে। অথচ আমরা ইহা কখনও অনুভব করি না। ইহার কারণ পূর্বে জানিয়াছ।

বায়ুমণ্ডলের চাপের সাহায্যে অনেক কাজ আমরা করিয়া থাকি। পিচকারীর ব্যবহার, ফাউণ্টেন পেনের কালি তোলার নলে কালি তোলা, সাইফন্-নলের সাহায্যে তরল পদার্থকে পাত্রান্তরিত করা, পাম্পের সাহায্যে জল তোলা প্রভৃতি সম্ভবপর হইয়াছে বায়ুমণ্ডলের

চাপের জন্য। চা, দুধ, জল প্রভৃতি আমরা অনেক সময় চুষিয়া পান করি—বায়ুর চাপ যে ঐ ব্যাপারে আমাদের সহায়ক তাহা আমাদের মনেই আসে না। বায়ুমণ্ডলের চাপের উপর নির্ভর করিয়া দমকলের কর্ম্মীরা বড় বড় নলের সাহায্যে খুব উঁচু বাড়ীতে জল উঠাইয়া আগুন নিবাইতে সমর্থ হয়। ভ্যাকুয়াম ব্রেক্ আর একটি উল্লেখযোগ্য যন্ত্র—বায়ুমণ্ডলের চাপের সাহায্য পাইয়াই ইহা ক্রিয়াশীল। চলন্ত রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, ট্রামগাড়ি ইত্যাদিকে এই ভ্যাকুয়াম ব্রেক্ দ্বারাই মুহূর্তে থামাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়।

চাপমান যন্ত্র দ্বারা বায়ুর চাপ যেমন জানা যায়, আবহাওয়ার অবস্থাও বোঝা যায়। ঝড় বৃষ্টির পূর্বে বায়ুর চাপ কমে, ফলে চাপ-মাণ যন্ত্রে কাচনলের পারদও নামিয়া আসে। চাপের বৃদ্ধি ভাল আবহাওয়ার সূচনা করে।

চাপমান যন্ত্রে পারদ ব্যবহারের সুবিধা অনেক। জল ব্যবহার করিলে ৩৪ ফুটেরও বড় কাচনল দরকার, পারদ ব্যবহার করিলে মাত্র ৩ ফুট কাচনল হইলেই চলে। কাচের মধ্য দিয়া পারদ সহজেই দেখা যায়। আবার অন্যান্য তরল পদার্থের মত ইহার সহজে কোন রাসায়নিক বা প্রাকৃতিক পরিবর্তনও ঘটে না।

প্রশ্নমালা

(১) বায়ুর সাধারণ ধর্ম কি কি? বায়ুর ওজন আছে পরীক্ষা দ্বারা বুঝাও।

(২) ম্যাগ্‌ডেবর্গ অর্ধগোলকের পরীক্ষা বর্ণনা কর।

(৩) বায়ু বিভিন্ন দিকে চাপ দেয় প্রমাণ কর। চাপমান যন্ত্র ও উহার ব্যবহার প্রণালী বর্ণনা কর। বায়ুর চাপ ৩০ ইঞ্চি বলিলে কি বুঝায়?

(৪) চাপমান যন্ত্রে পারদ ব্যবহৃত হয় কেন?

তৃতীয় অধ্যায়

জলের সাধারণ ধর্ম (Physical properties)

জল তরল পদার্থের খুব সহজ ও পরিচিত দৃষ্টান্ত। জল সাধারণত স্বচ্ছ, ইহা আলোর চলাচলে বাধা দেয় না। কিন্তু তড়িৎ ও তাপশক্তি ইহার মধ্য দিয়া সহজে পরিচালিত করা যায় না।

জল বায়ুর মত সচল। এইজন্য আমরা জলের মধ্যে চলিতে বিশেষ বাধা পাই না। জলের আর একটি বিশেষ ধর্ম হইল ইহা সর্বদা নিম্নদিকে গড়াইয়া চলে। মেজের কোথায়ও জল পড়িল, অমনি দেখা যায় উহা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে, আর গড়াইয়া নীচু দিকে যাইতেছে।

জল এবং তরল পদার্থের আর একটি স্বাভাবিক ধর্ম হইল উহাদের উপরিভাগ সমতল ও ভূসমান্তরাল (Horizontal) থাকে। গ্লাসের জল, কলসীর জল, চৌবাচ্চার জল এবং সাধারণ অবস্থায় সমস্ত জলাশয়ের জলের উপরিভাগ সমতল ও ভূসমান্তরাল। গ্লাস কাত করিলেও দেখা যায় উহার ভিতরকার জলের উপরিভাগ সমতল ও ভূসমান্তরালই রহিয়াছে। জলের আর একটি গুণ একটা পরীক্ষা দ্বারা বুঝান হইতেছে।
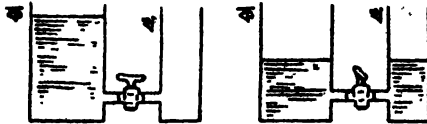
জল উঁচু হইতে নীচুতে নামিয়া দুই পাত্রে এক সমতলে রহিল

উপরের চিত্রে বড় "ক" পাত্রটি, ছোট "খ" পাত্রটির সঙ্গে পেঁচকল দ্বারা সংযুক্ত। পেঁচকল বন্ধ করিয়া বড় পাত্রটি জলে পূর্ণ করা হইল। এখন

পেঁচকল খোলামাত্র দেখা যাইবে, জল বড় পাত্র হইতে সংযোগ-নলের মধ্য দিয়া ছোট পাত্রে যাইতেছে এবং কিছুকাল পরেই দুই পাত্রের জলের উপরিভাগ এক সমতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। নল দ্বারা বা অন্যভাবে সংযুক্ত বিভিন্ন পাত্রের কোন একটিতে জল ঢালিলে প্রত্যেকটি পাত্রের জলের উপরিভাগ এক সমতলে থাকিবে। সমস্ত তরল পদার্থেরই এইরূপ হইয়া থাকে।

সহরে জল সরবরাহ (Water Supply)

উপরোক্ত জলের কয়েকটি ধর্মের উপর নির্ভর করিয়া সহরে প্রত্যেক বাড়ীতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা সম্ভবপর হইয়াছে। পদ্ধতিটি খুব

জল সরবরাহ
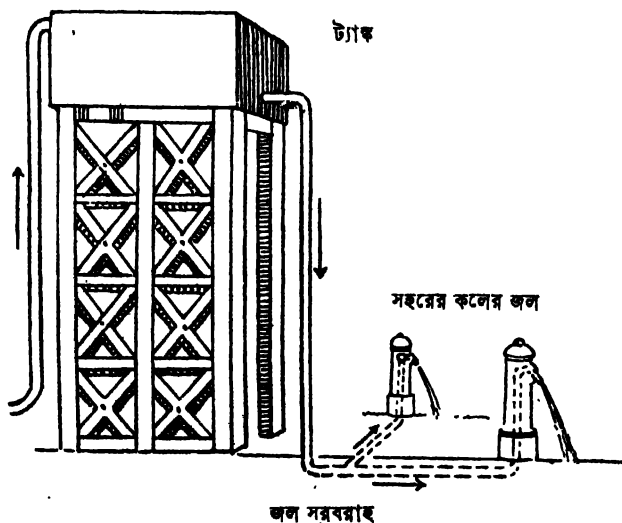
সহজ। কোন এক জায়গায় খুব উঁচুতে একটি সুবৃহৎ পাত্র বা ট্যাঙ্ক বসানো হয়। ট্যাঙ্কের উপরদিকে একটি মোটা নল এবং নীচের দিকে

আর একটি মোটা নল সংযুক্ত। উপরের নলটির মধ্য দিয়া যন্ত্রসাহায্যে ট্যাঙ্কটি জলপূর্ণ করা হয়। তলাকার মোটা নলটির সহিত অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত সরু নল বা পাইপ যোগ করা থাকে। উহাদের ভিতর দিয়াই জল নামিয়া আসিয়া সহরের বিভিন্ন বাড়ীতে বসান কলের মুখ দিয়া বাহির হয়।

জলের আয়তন চাপ দিয়া কমানো যায় না বলিলেই হয়। বায়ুর মত ইহা সংকোচনশীল নহে। একটি কাচের পিচকারী জলে ভর্তি করিয়া উহার মুখ বাম হাতের তলায় চাপিয়া বন্ধ কর। এখন ডান হাত দিয়া খুব জোরে ঢাকুনিযুক্ত হাতলটি ঠেলিতে থাক, শত জোর প্রয়োগেও হাতল ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করাইতে পারিবে না। শেষে হয়ত হাতল বাঁকিয়া যাইবে, কাচ ভাঙ্গিয়া যাইবে, অথচ জলের আয়তন একটুও কমিবে না।

জলের চাপ (Pressure of water)

জল বায়ুর মত উর্ধ্ব, নিম্ন ও পার্শ্ব সকল দিকেই চাপ দিতে পারে। এই চাপ আবার লম্বভাবে প্রযুক্ত হয়। জলপূর্ণ পাত্রের তলদেশে জলের যে চাপ পড়ে উহাকে নিম্নচাপ এবং পার্শ্বদেশে যে চাপ পড়ে তাহাকে পার্শ্বচাপ বলে। আবার, মনে কর একটি জলপূর্ণ কলসী দড়িতে বাঁধিয়া জলে ঝুলান হইল। জলে ঝুলাইবার আগে জলপূর্ণ কলসীর ওজন খুব বেশি বোধ হয়। কিন্তু কলসীর সহিত সংযুক্ত দড়িগাছি ধরিয়া কলসীকে জলে ঝুলাইয়া উপরদিকে টানিলে দেখা যায় জলপূর্ণ ভারি কলসীটা এখন কত হালকা এবং কত সহজেই ধরিয়া রাখা যায়। এখানে জলের উর্ধ্বচাপই কলসীটিকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দেয়, তাই উহাকে অত হালকা মনে হয়। অতএব কোন বস্তু জলে ডুবাইলে জলের চাপ সকল দিক হইতেই উহার উপর প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

জলের নিম্নচাপ (Downward pressure)

একটি কাচের গ্লাসে জল লইয়া হাতের চেটোর উপর রাখিলে হাতে গ্লাস ও জলের সমবেত ওজনের জন্য একটা নিম্নচাপ লাগে। জলের পরিমাণ ক্রমে বাড়াইলে হাতের উপর ক্রমে বেশি চাপ অনুভূত হয়। এ তো গেল হাতের উপর চাপের কথা। গ্লাসের ভিতরকার তলদেশে (ত) সমগ্র চাপ কতটা পড়ে? গ্লাসের তলদেশে এই সমগ্র নিম্নচাপ জলের পরিমাণ বা উহার আকৃতির তারতম্যের উপর নির্ভর করে না, উহা সম্পূর্ণরূপে তলদেশের ক্ষেত্রফল ও জলের গভীরতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

গ্লাস ও জলের সমগ্র নিম্নচাপ

তিনটি পাত্রের তলদেশে সমান চাপ পড়িতেছে

উপরের চিত্রে তিনটি পাত্রের তলাকার ক্ষেত্রফল এক এবং উহাদের প্রত্যেকটিতে জলের গভীরতা সমান। পাত্রগুলির আকার বিভিন্ন বলিয়া জলের পরিমাণও বিভিন্ন। দ্বিতীয় পাত্রে সবচেয়ে বেশি, তৃতীয় পাত্রে সবচেয়ে কম জল আছে। হাতের উপর রাখিলে দ্বিতীয় পাত্রটিই বেশি চাপ দিবে বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা

দেখা গিয়াছে, তিনটি পাত্রের তলদেশে (ভিতরকার) জলের একই পরিমাণ চাপ পড়িতেছে।

পাত্রের তলদেশের উপর যতখানি জল লম্বভাবে দাঁড়ায়, উহার ওজনই এই নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। কাজেই মধ্যম পাত্রের সমস্ত জল চাপ দিতেছে না। আবার তৃতীয় পাত্রে যতখানি জল তার চেয়ে অধিক জল নিম্নচাপ দিতেছে। চিত্রে লক্ষ্য কর, প্রথম পাত্রের তলায় 'কখগঘ', দ্বিতীয় পাত্রের তলায় 'পফবভ' এবং তৃতীয় পাত্রের তলায় 'চছজঝ' আয়তনের জল দাঁড়ায়। উহাদের আয়তন সমান বলিয়া জলের ওজনও সমান, কাজেই তলদেশে একই চাপ পড়িয়া থাকে।

জলের পার্শ্বচাপ (Lateral pressure)

নিম্নের চিত্রে একটি লম্বা টিনের পাত্র দেখ। উহার একপার্শ্বে বিভিন্ন উচ্চতায় চারিটি ছিদ্র আছে। ছিদ্রগুলি ছিপি দিয়া আঁটিয়া
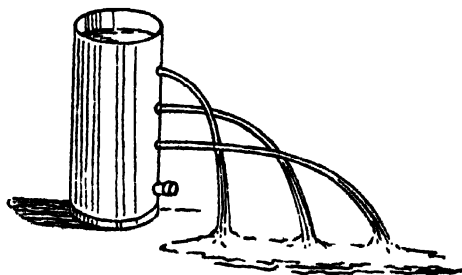
সর্বনিম্ন ছিদ্র দিয়া খুব বেগে জল পড়িতেছে

পাত্রটি জলে ভর্তি কর এবং উপরকার তিনটি ছিপি একে একে আলগা করিয়া দাও। দেখ, জলের পার্শ্বচাপে ছিপিগুলি ছিট্‌কাইয়া পড়িল এবং প্রত্যেকটি ছিদ্র দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আরও লক্ষ্য কর,

পাত্রের নীচেকার ছিদ্র হইতে ছিপি খুলিয়া দিলে জল যত জোরে ছিদ্র দিয়া বাহির হয় ও যতদূরে পড়ে, উপরের বা মাঝের ছিদ্র দিয়া জল তত বেগে বাহির হয় না বা তত দূরেও যায় না। উপরের ছিদ্র হইতে জল সব চেয়ে কম বেগে বাহির হয়। কাজেই জানা গেল, নিম্নচাপের ন্যায় পার্শ্বচাপের মাত্রাও জলের গভীরতার সঙ্গে বাড়ে কমে। সর্বনিম্ন ছিপিটি আঁটভাবে বন্ধ বলিয়া, বিশেষ চাপ থাকা সত্ত্বেও জল উহা ঠেলিয়া বাহির হইতে পারে না।

জলের উর্ধ্বচাপ (Upward pressure)

একটি খালি কলসী বা ঘটি সোজাভাবে জলে ডুবাইতে গেলে জল উহাকে উপরদিকে ঠেলিয়া দেয়, ইহা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা। জলের উর্ধ্বচাপ ঐ পাত্রের উপর পড়ে বলিয়া ঐরূপ হয়। জলের উর্ধ্বচাপও জলের গভীরতার উপর নির্ভর করে, আর জলপূর্ণ কোন পাত্রের ভিতরে কোন নির্দিষ্ট অবস্থানে জলের নিম্নচাপ ও উর্ধ্বচাপ পরস্পর সমান। এ বিষয়ের একটি ভাল পরীক্ষা আছে।
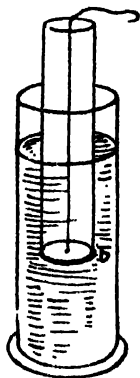
জলের উর্ধ্বচাপে চাকৃতি চোঙের মুখে লাগিয়া আছে

দুই মুখ খোলা একটি কাচের চোঙ (পাশের চিত্র) লও এবং ঐ চোঙের মুখ বেশ বন্ধ করিতে পারে এমন একখানা আংটাযুক্ত টিনের পাতলা চাকৃতি (চ) সংগ্রহ কর। আংটার সহিত খানিকটা সূতা বাঁধ। চোঙের তলাকার মুখ চাকৃতি দ্বারা ঢাকিয়া সূতাটি চোঙের ভিতর দিয়া টানিয়া এমনভাবে ধর যেন চোঙের নীচেকার মুখে চাকৃতিখানি সংলগ্ন থাকে। ঐ অবস্থায় চোঙটি একটি

বড় জলপূর্ণ কাচপাত্রের মধ্যে স্থাপন কর। এখন দেখ, সুতা ছাড়িয়া দেওয়াতেও চাক্তিখানি নীচে পড়িতেছে না। চোঙের ভিতর জল নাই। কাজেই বলিতে হয়, বাহিরের বড় পাত্রের জলের উর্দ্ধচাপই চাক্তিখানিকে চোঙের মুখে আঁটিয়া রাখিয়াছে। এইবার চোঙের ভিতর জল ঢালিতে থাক। দেখ, চোঙের ভিতরে ও বাহিরে যখন জলের উপরিভাগ এক সমতলে আসে, তখন চাক্তিখানি চোঙের মুখ হইতে খসিয়া পড়ে। ইহার কারণ সহজেই বুঝিতে পারিবে। জলের উর্দ্ধচাপ ও নিম্নচাপ সমান ও বিপরীতমুখী বলিয়া একে অন্যকে কাটাকাটি করে, ফলে চাক্তিখানি নিজের ভারে নিজে পড়িয়া যায়।

জলের প্লাবিতা ও আর্কিমিডিজের সূত্র

(Buoyancy and Archimedes Principle)

একটা ভারি খুঁটি জলে ডুবানো থাকিলে যে কেহ একলাই উহাকে অতি সহজে জলের মধ্য দিয়া টানিয়া লইতে পারে। কিন্তু খুঁটিটা ডাঙ্গায় তুলিলে উহাকে বহন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া দুই তিন জন লোকের পক্ষেও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। জলপূর্ণ কলসী বহন করিয়া চলিতে বেশ কষ্ট বোধ হয়; কিন্তু উহাকে শুধু দুইটি আঙ্গুলের সাহায্যে জলের ভিতরে নাড়া চাড়া করা সম্ভব। ইহাতে বুঝা যায় যে, বস্তুমাত্র জলে ডুবাইলে উহা অনেক হালকা হইয়া যায়। কতখানি এবং কি কারণে হালকা বোধ হয়, নীচের আলোচনা হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

তোমরা পূর্বে দেখিয়াছ, জল বা কোন তরল পদার্থের ভিতরকার কোন জায়গায় উহার চাপ উহার গভীরতার উপর নির্ভর করে, এবং

ঐ চাপ ঊর্ধ্বে, নিম্নে ও চতুষ্পার্শ্বে লম্বভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এখন একটি নূতন জিনিষ বুঝিতে চেষ্টা কর।

নীচের চিত্রে একখানা সমচতুষ্কোণ ধাতুখণ্ড জলে ডুবানো আছে। চতুর্দিক হইতে জলের চাপ লম্বভাবে উহার উপর পড়িতেছে। "প" পাশের উপর জলের চাপ, "ম" পাশের উপর জলের চাপের সমান। ইহারা বিপরীতমুখী বলিয়া কাটাকাটি হইয়া যায়। তেমনি "ব" ও "ভ" পাশের উপর জলের চাপ সমান ও বিপরীতমুখী বলিয়া উহারাও কাটাকাটি হইয়া যায়। কাজেই ধাতুখণ্ডখানি কোন পাশের দিকে সরিয়া যায় না। এখন বাকি রহিল ধাতুখণ্ডের উপরকার "উ" তলের উপর জলের নিম্নচাপ, আর নীচেকার "নি" তলের উপর জলের ঊর্ধ্বচাপ। ধাতুখণ্ডের "উ"-র গভীরতা "নি"-র গভীরতার চেয়ে কম। কাজেই জলের ঊর্ধ্বচাপ জলের নিম্নচাপের চেয়ে বেশি। ফলে নিম্ন-চাপের ক্রিয়া ও ঊর্ধ্বচাপের ক্রিয়া উভয়ের কাটাকাটির পরও জলের খানিকটা ঊর্ধ্বচাপ থাকিয়া যাইবে। জলের এই বাকি ঊর্ধ্বচাপের পরিমাণ বাহির করা যায়। ধাতুখণ্ডের "উ"-র উপর হইতে জলের সমতল অবধি যতখানি জল লম্বভাবে দাঁড়ায়, উহার ওজন নিম্নচাপের সমান। আচ্ছা এই ওজন ধর 'ক'। আবার ধাতুখণ্ডের "নি"-র উপর হইতে জলের সমতল পর্যন্ত যতখানি জল দাঁড়ায় উহার ওজন ঊর্ধ্বচাপের সমান। মনে কর এই ওজন হইল 'খ'। 'খ' হইতে 'ক' বাদ দিলে আমরা পাই ধাতুখণ্ড-খানি যতটুকু জল সরাইয়া দিতে পারে অর্থাৎ নিজ আয়তন পরিমিত জলের ওজন। এই ওজনই জলের বাকি ঊর্ধ্বচাপের সমান নয় কি? এইরূপে দেখা যায় কোন কঠিন জিনিষ জলে ডুবাইলে উহার নিজ আয়তন পরিমিত জল সরিয়া পড়ে এবং উহারই ওজনের
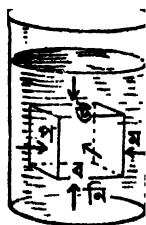
জলের প্লাবিতা

সমান জলের একটি উর্ধ্বচাপ জিনিষটিকে উপরে ভাসাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে। জলের এই বিশেষ ধর্মের নাম প্লাবিতা। অন্যান্য তরল পদার্থেরও প্লাবিতা ও উর্ধ্বচাপ আছে।

কোন পদার্থ জলে ডুবাইলে উহার ওজন কতখানি কমে, এখন তাহাও নির্ণয় করা সম্ভব। একটু আগেই জানিয়াছ, কোন কঠিন জিনিষ জলে নিমজ্জিত হইলে উহার নিজ আয়তন পরিমিত জল স্থানচ্যুত হয়। ঐ জলের ওজন অনুযায়ী যতটা শক্তি উহাকে উপরে ভাসাইতে চেষ্টা করে, পৃথিবীর আকর্ষণ জনিত নিম্নমুখী শক্তি ততখানি কমে। অর্থাৎ কোন জিনিষ জলে ডুবাইলে জিনিষটি যতখানি জল সরাইয়া দেয়, ঐ জিনিষের যত ওজন, জিনিষটি ঠিক ততখানি ওজন হারায়। আর্কিমিডিজ প্রথমে এই সত্যটি আবিষ্কার করেন বলিয়া ইহা আর্কিমিডিজের সূত্র নামে পরিচিত।

আর্কিমিডিজের সূত্র পরীক্ষা
(Verification of Archimedes Principle)

পর পৃষ্ঠার চিত্রের অনুরূপ একটি তুলাদণ্ড লও। উহার দুই বাহু প্রান্তের নীচে "চ", "ছ" দুইটি হুক আছে। "চ" হুক হইতে একটি ফাঁপা পিতলের চোঙ (প) ঝুলাও এবং পিতলের চোঙের নীচেকার আংটা (ব) হইতে আর একটি নীরেট লম্বা চোঙ (ফ) ঝুলাইয়া দাও। "ফ" চোঙটি "প" চোঙের মধ্যে ঠিক প্রবেশ করিতে পারে, অর্থাৎ "প" চোঙের ভিতর-কার আয়তন ঠিক "ফ" চোঙের আয়তনের সমান। একটি কাঠের সেতু (স) বাম পাল্লার উপর দিয়া বসাও যেন উহা পাল্লার কোথায়ও না ঠেকে। সেতুর উপর একটি খালি কাচপাত্র রাখ। "ফ" চোঙটি উহার মধ্যে আলগা ভাবে ঝুলিতে দাও। এখন অপর পাল্লায় ভার দিয়া তুলাদণ্ডের দুই দিক সুসমভারযুক্ত কর। তারপর কাচপাত্রের মধ্যে জল ঢাল, যেন "ফ" চোঙ

সবটা ডুবিয়া যায়। জলের ঊর্ধ্বচাপ "ফ" চোঙকে জলের উপরের দিকে ঠেলিবে, কাজেই উহার ওজন কমিয়া যাইবে। এইজন্য ডানদিকের পাল্লা নীচের দিকে নামিয়াছে দেখিবে। এখন ফাঁপা "প" চোঙে জল ঢাল। যখন উহা ঠিক ভর্তি হইবে, তখন দেখিবে তুলাদণ্ডের দুই পাল্লা সমভার-যুক্ত হইয়া ঝুলিতেছে। এখানে ফাঁপা চোঙের আয়তন নীরেট চোঙের
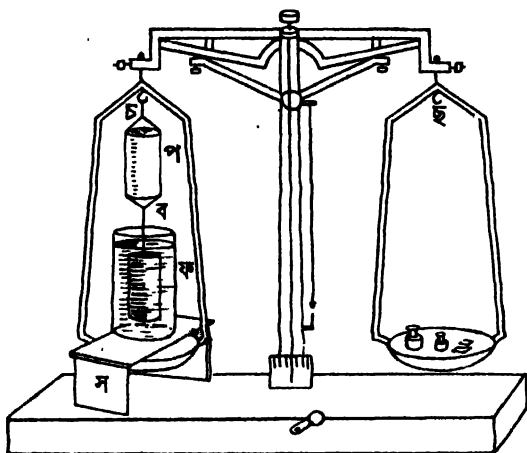
আর্কিমিডিজের সূত্র পরীক্ষা

আয়তনের সমান। অতএব প্রমাণ হইয়া গেল, জলে নিমজ্জিত অবস্থায় "ফ" চোঙের ওজন যতখানি কমে, "ফ" চোঙ দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন তাহার সমান।

আর একটি পরীক্ষা সহজে করিতে পার। একটি পাথর টুক্‌রা বাতাসে ওজন কর। এখন জলে নিমজ্জিত অবস্থায় উহার ওজন লও। তারপরে গা-নলযুক্ত (side tube) একটি জলপূর্ণ পাত্রে পাথরটি ফেলিয়া দিলে উহা দ্বারা স্থানচ্যুত সমায়তন জল গা-নল দিয়া বাহির হইয়া আসিলে, উহা একটি গ্লাসে সংগ্রহ করিয়া উহার ওজন বাহির কর। দেখ জলের

ভিতর পাথরখণ্ড ওজন করাতে ওজন যতটুকু কমিয়াছিল, সমায়তন জল স্থানচ্যুত হইয়া গ্লাসে যে জমিল, উহার ওজনও ঠিক একই।

বায়বীয় পদার্থের প্লাবিতা ও ঊর্ধ্বচাপ থাকায় উহাদের বেলায়ও আর্কিমিডিজের সূত্র খাটে। বায়ুতে একটি জিনিষের ওজন, বায়ুশূন্য স্থানে উহার ওজনের চেয়ে কম। নিজ আয়তন পরিমিত যতখানি বায়ু স্থানচ্যুত হয়, জিনিষটি সেই আয়তন পরিমিত বায়ুর সমান ওজন হারায়। কিন্তু স্থানচ্যুত বায়ুর ওজন জলের তুলনায় খুবই কম। এইজন্য জলের মত বাতাস তেমন ঊর্ধ্বচাপ দিয়া আমাদিগকে ভাসাইয়া রাখিতে পারে না।

পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity)

আপেক্ষিক গুরুত্ব বলিলে কোন বস্তু তাহার সমায়তন জলের চেয়ে কতগুণ ভারি তাহাই নির্দেশ করা হয়। জলের গুরুত্ব ১ ধরা হয়। পারদ জলের তুলনায় ১৩·৫ গুণ ভারি। অর্থাৎ ১ ঘন সেণ্টিমিটার জলের যত ওজন, ১ ঘন সেণ্টিমিটার পারদের ওজন তাহার ১৩·৫ গুণ। অতএব পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব হইল ১৩·৫। একই আয়তন বিশিষ্ট বিভিন্ন পদার্থের ওজনও বিভিন্ন। কাজেই প্রত্যেক পদার্থেরই নিজ নিজ আপেক্ষিক গুরুত্ব আছে। একটি কঠিন পদার্থের একবার বায়ুতে এবং একবার জলে ডুবাইয়া ওজন লওয়া হইল। মনে কর উহারা যথাক্রমে 'ক' ও 'খ'। 'ক' হইতে 'খ' বাদ দিলে পদার্থটির সমায়তন পরিমিত জলের ওজন পাইবে (আর্কিমিডিজের সূত্র)। ঐ জলের ওজন ধরা যাউক 'গ'। এখন 'ক'-কে 'গ' দ্বারা ভাগ করিলে পদার্থটির আপেক্ষিক গুরুত্ব বাহির হইবে। তরল পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব সহজেই জানা যায়। একটি দাগকাটা কাচপাত্রের নির্দিষ্ট কোন দাগ

অবধি আগে তরল পদার্থটি দ্বারা ও পরে জল দ্বারা ভর্তি করিয়া, উহাদের আলাদা ওজন লও। প্রথম ওজনকে দ্বিতীয় ওজন দিয়া ভাগ করিলেই, তরল পদার্থটির আপেক্ষিক গুরুত্ব পাইবে।

পদার্থের জলে ভাসিয়া থাকা (Floatation)

পূর্বে দেখিয়াছ; কোন কঠিন পদার্থ জলে ডুবাইলে উহার উপর বিপরীতমুখী দুইটি শক্তি ক্রিয়া করে। একটি ঐ পদার্থের নিজের ভার—যাহার জন্য বস্তুটি নীচের দিকে অর্থাৎ ডুবিয়া যাইতে চায়, আর একটি হইল জলের প্লাবিতার জন্য উধ্বর্চাপ—যাহার পরিমাণ পদার্থটির সমায়তন জলের ওজনের সমান। এই চাপ পদার্থটিকে উপরের দিকে ঠেলিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। জলে ডুবানো পদার্থটির নিজ ওজন উহার সম আয়তন জলের ওজনের চেয়ে বেশি হইলে, উহা ডুবিবে। কম হইলে পদার্থটি উধ্বর্চাপের জন্য উপরের দিকে উঠিবে। পদার্থটির ওজন ও উধ্বর্চাপের পরিমাণ সমান হইলে, উহা জলে ভাসিয়া থাকিবে।

অতএব, পদার্থ জলে ভাসিতে থাকিলে, উহা ঐ অবস্থায় যতখানি জল সরাইয়া দেয়, তাহার ওজন উহার নিজ ওজনের সমান। অপর কথায় বলিতে গেলে, যে কোন পদার্থের ভার যদি সম আয়তন জলের চেয়ে কম হয়, তবে উহা জলে ভাসমান রহিবে। জলের চেয়ে ভারি জিনিষকে জলে ভাসাইতে হইলে, উহার গঠন এমন করা চাই যে উহা দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ভার অপেক্ষা উহার নিজের ওজন কম হয়। এইজন্য একটি নিরেট লোহার বল জলে ডুবিয়া যায়, কিন্তু উহা পিটাইয়া কড়াই প্রস্তুত করিলে কড়াইটি জলে ভাসিয়া থাকে। লৌহ-নির্মিত বড় বড় জাহাজের ভিতরটা ফাঁপা বলিয়া, সমগ্র জাহাজের

ওজনের চেয়ে উহা দ্বারা স্থানচ্যুত জলের ওজন বাড়ানো হয়, সেইজন্য উহা ভাসিতে সমর্থ হয়।

প্রশ্নমালা

১। তরল পদার্থের সাধারণ ধর্ম কি? সহরে জল সরবরাহ কিরূপে করা হয়? জলের কোন্ ধর্মের উপর ইহা নির্ভর করে?

২। তরল পদার্থ বিভিন্ন দিকে চাপ দেয়, এ সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষা বর্ণনা কর।

৩। আর্কিমিডিজের নিয়ম কি? উহা কিরূপে প্রমাণ করিবে?

৪। জাহাজ জলে ভাসে কেন? কোন জিনিষের জলে ভাসিয়া থাকা বা ডোবা, কিসের উপর নির্ভর করে?

চতুর্থ অধ্যায়

তাপ (Heat)

অনুভব দ্বারা তাপশক্তি আমরা যেমন বুঝি, পদার্থের উপর ইহার নানা প্রভাব দেখিয়াও আমরা ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি। তাপ পদার্থমাত্রেরই আয়তন বাড়াইয়া দেয়। কোন পদার্থ হইতে তাপ হরণ করিয়া লইলে; উহার আয়তন কমিয়া যায়। কঠিন, তরল, বায়বীয় সমস্ত রকম জিনিষই তাপে প্রসারিত হয়। আবার পদার্থের যে তিন অবস্থা হয়, উহার জন্য তাপই দায়ী, এ বিষয় পূর্বে জানিয়াছ।

জলের উপর তাপের প্রভাব
(Effect of heat on water)

তাপে জল প্রসারিত হয় অর্থাৎ উহার আয়তন বাড়ে। জল এবং তরল পদার্থের অণুগুলি তেমন সঙ্ঘবদ্ধ নয় বলিয়া, তাপে প্রসারণ-শক্তি কঠিন পদার্থের চেয়ে জল ও তরল পদার্থের অনেক বেশি।

একটি কাচের ফ্লাস্কের (flask) গোলাকার অংশ (নীচের চিত্র দেখ) এবং উহার সরু নলের (ক) অবধি জল ভর্তি কর এবং ফ্লাস্কের তলায় তাপ দাও। দেখিবে যতই তাপ দিতেছ, ততই জল নলের মধ্য দিয়া ক্রমে উপরে উঠিতেছে। সুতরাং, তাপে জলের আয়তন বাড়ে; আর যত বেশি তাপ দেওয়া যায় আয়তনও তত বেশি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফ্লাস্কের তলায় তাপ দেওয়ার জন্য ফ্লাস্ক আগে গরম হইয়া আয়তনে বাড়ে, কাজেই জল প্রথমে একটু নীচে (ঘ) নামিয়া আসে; তারপর যেমনি তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জল গরম হয়, তখনি জলও ক্রমে নলের উপরে উঠিতে থাকে।
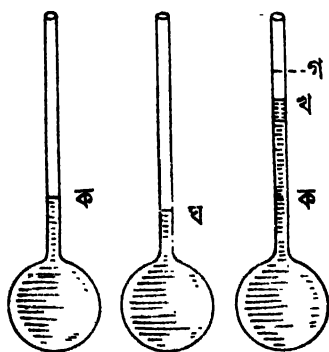
তাপে জলের প্রসারণ

তাপের জন্য ফ্লাস্কটিরও আয়তন বাড়ে সত্য, কিন্তু উহার চেয়ে জলের প্রসারণ বেশি বলিয়া জল নলের ভিতর অনেক উঁচুতে (খ) গিয়া দাঁড়ায়। উভয়ের প্রসারিত হওয়ার ক্ষমতা সমান হইলে, তাপ দিবার পরও জল একই জায়গায় থাকিত, উহাদের প্রত্যেকের আয়তন কিছু বড় হইত মাত্র। তাপে ফ্লাস্কের আয়তন না বাড়িলে, জল আরও উঁচুতে অর্থাৎ (খ) জায়গার পরিবর্তে (গ) জায়গায় উঠিত। তাপ দেওয়া

বন্ধ করিলে দেখিবে জল আস্তে আস্তে নামিয়া পূর্বের আয়তন লাভ করিবে। তাপ বেশি দিতে থাকিলে জল প্রসারিত হইয়া নলের মুখ দিয়া পড়িয়া যাইতেছে দেখিতে পাইবে।

অবস্থার পরিবর্তন (Change of state)

তাপে প্রথমত জলের আয়তন বাড়ে। তারপর ক্রমাগত তাপ পাইয়া ফুটিতে আরম্ভ করে। উনুনের উপর বসানো কেত্‌লীর জল উত্তপ্ত হইয়া ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয় এবং পাশের নল দিয়া বাহির হইয়া বাতাসে মিলিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে কেত্‌লীর জলও কমিতে থাকে। কেত্‌লীর নলের মুখের একটু দূরে যে সাদা ধোঁয়ার মত পদার্থ দেখা যায়, উহা জলের বাষ্প নহে। বাষ্প বায়ুর মতই অদৃশ্য। ফুটানো জল হইতে
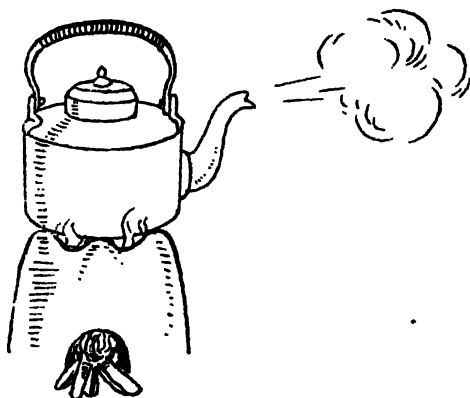
জল ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হইতেছে

বাষ্প বাহিরে আসিয়া অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসে। ফলে ঐ বাষ্প জমিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা তৈয়ারি করে। উহারাই সাদা ধোঁয়ার মত দেখায়। নলের মুখের কাছে শীতল পাত্র রাখিলে, উহার উপর

ঐ জলকণা জমিতে থাকে, নতুবা আবার বাতাসের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

কেবল ফুটন্ত জল হইতে বাষ্পের সৃষ্টি হয় না। খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ের উপরিভাগ হইতে সর্বদা সকল অবস্থায় জল কম, বেশি বাষ্পীভূত হইতেছে। এইজন্য গ্রীষ্মকালে ঐ সমস্ত জলাশয়ের জল অনেক কমিয়া যায়। ঘরের মেঝে জল দিয়া ধুইলে, খানিকক্ষণ বাদে মেঝে শুকাইয়া যায়। ভিজা জামা কাপড় টাঙাইয়া রাখিলে উহা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শুকাইয়া যায়। কাপড় বা মেঝে শুকানোর অর্থ হইল উহাদের সমস্ত জলের বাষ্পে পরিণত হইয়া যাওয়া। ইহা হইতে দেখা গেল, সর্বদা সকল অবস্থাতেই জল হইতে বাষ্পের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

জল যখন ফুটিতে থাকে, তখন উহার নির্দিষ্ট তাপমাত্রা হইল ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ (প্লরে দ্রষ্টব্য)। জল ফুটিতে আরম্ভ করিলে উহাকে যতই তাপ দেওয়া হউক না, যতক্ষণ এক ফোঁটা জল অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ উহার তাপমাত্রা ঐ ১০০° ডিগ্রীতেই থাকিবে। কোন পাত্রে করিয়া জল ফুটাইলে ঐ জলের সকল অংশ হইতেই বাষ্প খুব অধিক মাত্রায় উত্থিত হয়। কিন্তু জলাশয়ের বা কোন পাত্রের জল হইতে সাধারণত যে বাষ্প হয়, উহা শুধু জলের মুক্ত উপরকার অংশ হইতে অতি আস্তে আস্তে জন্মে। জলের উপরকার অংশ যত বিস্তৃত হয়, সাধারণ বাষ্পীভবন ক্রিয়াও তত তাড়াতাড়ি চলিতে থাকে। সাধারণ অবস্থায় কোন পাত্রের জল হইতে যখন বাষ্প উৎপন্ন হয়, তখন অবশিষ্ট জলের উত্তাপও কমিয়া যায়। যে পরিমাণ তাপ কমে, তাহা জলের অবস্থান্তর করিয়া বাষ্প ঘটাইবার জন্য দরকার হয়। সাধারণ বাষ্পীভবনের ফল আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। মাটির কলসীতে জল রাখিলে ঠাণ্ডা হয় কেন? মাটির কলসীর গায়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া

জল সর্বদাই বাহির হইয়া বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া বাষ্পীভূত হয়। এই যে অবিরাম বাষ্পীভবন চলিতে থাকে, এজন্য কলসের জলই তাপ প্রদান করে। এইরূপে তাপ হারাইয়া জল ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে। একই কারণে শরীরের ঘাম শুকাইতে থাকিলে শরীর ঠাণ্ডা লাগে। গরম দুধ বা কোন তরল বস্তু ঠাণ্ডা করার জন্য চওড়া পাত্রে ছড়াইয়া রাখা হয় কেন, এখন তাহা সহজেই বুঝিতে পার।

কেতলীতে জল ফুটাইলে যে বাষ্পের সৃষ্টি হয়, উহার জন্য ঢাকুনী সশব্দে উঠানামা করে ইহা লক্ষ্য করার জিনিষ। এক ঘন-ফুট জল একটি ছোট আবদ্ধ পাত্রে রাখিয়া উত্তপ্ত করিতে থাকিলে, প্রায় ১২০০ ঘন-ফুট বাষ্পের সৃষ্টি হয়। পাত্রটি যদি হালকা হয়, তবে এতখানি বাষ্পের প্রবল চাপে উহার ফাটিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। বাষ্পের এই ধর্মের জন্য ইহাকে শক্তি হিসাবে ব্যবহার করিয়াই বৈজ্ঞানিক জেম্‌স ওয়াট বাষ্পীয় এঞ্জিন আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন।

প্রশ্নমালা

(১) তাপে জলের প্রসারণ পরীক্ষা দ্বারা বুঝাও।

(২) কিরূপে বাষ্পের সৃষ্টি হয়? কেতলীর জল ফুটাইলে ধোঁয়ার মত যে বস্তু বাহির হয় উহা কি?

(৩) মাটির কলসীর জল ঠাণ্ডা হয় কেন? ঘাম শুকাইলে শরীর শীতল লাগে কেন? চওড়া পাত্রে গরম দুধ শীঘ্র ঠাণ্ডা হয় কেন?

পঞ্চম অধ্যায়

বায়ুর উপর তাপের প্রভাব ; বায়ু চলাচল
(Effect of heat on air ; Ventilation)

খুব সরু নলবিশিষ্ট একটি কাচের ফ্লাস্ক (নিম্নের চিত্র দেখ) লও এবং উহার সরু মুখে এক ফোঁটা লাল কালি প্রবেশ করাইয়া, উহাকে আস্তে আস্তে এমনভাবে নাড় যেন, ঐ কালির ফোঁটাটি ফ্লাস্কের গোলাকার অংশের ঠিক উপরে একটি লাল রেখার (ক) মত হইয়া দাঁড়ায়। এখন
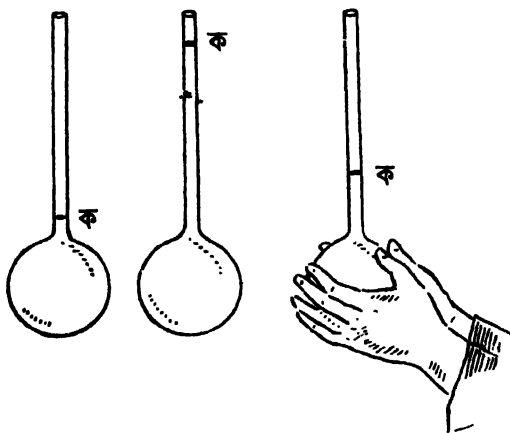
তাপে বায়ুর প্রসারণ

ফ্লাস্কের তলায় তাপ দাও। দেখিবে কালির রেখা দ্রুতবেগে উপরে উঠিতেছে। শুধু হাত দিয়া গোলাকার অংশটি চাপিয়া ধরিলে যতটুকু তাপ হয়, উহার জন্যও কালির রেখা বেশ উপরে উঠিবে। তাপের

জন্য ফ্লাস্কের ভিতরকার বায়ু আয়তনে বাড়ে এবং এই প্রসারিত বায়ুই কালির রেখা উপরে তুলিয়া দেয়। তাপ দেওয়া বন্ধ করিলে, ঠাণ্ডা পাইয়া বায়ুর আয়তন কমে, কালির রেখাও বাহিরের বায়ুর চাপে নীচে নামিয়া আসে।

তাপে বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি হয় ও সঙ্গে সঙ্গে উহা হালকা হইয়া পড়ে। উনুনে আগুন ধরাইলে উহার নিকটবর্তী বায়ু তপ্ত হইয়া হালকা হয়। এই হালকা বায়ু উপরের দিকে চলিয়া যায় এবং চারিপাশের ঠাণ্ডা ভারি বায়ু আসিয়া ঐ তপ্ত বায়ুর স্থান অধিকার করে। ফলে উনুনের কাছে একটি বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই বায়ুপ্রবাহের কথা আমরা বুঝিতে পারি উনুনের উপর ধোঁয়া হয় বলিয়া। এই ধোঁয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লার কণিকা ছাড়া আর কিছুই নহে। উনুনের উত্তাপে নিকটবর্তী বায়ুতে যে প্রবাহের সৃষ্টি হয়, উহা দ্বারা চালিত কয়লার কণাই ধূম হইয়া আমাদের কাছে দেখা দেয়।

সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ যখন ভূপৃষ্ঠ হইতে সমান তাপ পায় না, তখন উহাদের কোন অংশের বায়ু বেশি তাপে হালকা এবং অন্য কোন অংশের বায়ু কম তাপে ভারি থাকে। হালকা উত্তপ্ত বায়ু উপরে যায়, আর শীতল ভারি বায়ু উহার স্থান দখল করিবার জন্য ছুটিয়া আসে। ফলে বায়ুপ্রবাহ হইয়া থাকে। এই যে কোন সময় দক্ষিণা ফুরফুরে হাওয়া আমরা পাই, আবার কখন কখন প্রচণ্ড ঝড় বাতাস সাইক্লোন ঘূর্ণিবায়ুতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি, বায়ু এজন্য দায়ী নয়। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশে তাপের তারতম্যই ইহাদের মূল কারণ।

আমরা ঘরের কড়ির তলায় হাওয়া খেলার জন্য বড় বড় ছিদ্রপথ রাখিয়া থাকি। ঘরে মানুষের তাপে, প্রদীপের তাপে, ঘরের নীচেকার বায়ু গরম হয় এবং হালকা বলিয়া ঐ বায়ু উপরে উঠিয়া ছিদ্রপথ দিয়া

বাহির হইয়া যায়, আর বিশুদ্ধ ও নূতন শীতল বায়ু দরজার ভিতর দিয়া ঘরে প্রবেশ করে। এই শীতল বায়ু গরম হইয়া পূর্ববৎ ছিদ্রপথ দিয়া চলিয়া যায়, আবার শীতল বায়ু ঘরে প্রবেশ করে। কাজেই আমাদের ঘরের মধ্যেও বায়ুপ্রবাহ চলিয়া থাকে। বায়ু নিষ্কাসনের জন্য এই যে ছিদ্রপথ রাখা হয়, ইহার নাম ভেন্টিলেটর (ventilator)। ঘরের গরম বায়ুতে আমাদের প্রশ্বাস বায়ু মিশিয়া থাকে বলিয়া উহা দূষিত। ঐ দূষিত বায়ু বিতাড়ণের জন্যই বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা রাখা দরকার। নীচের দরজা জানালা বন্ধ করিলে, শুধু ভেন্টিলেটর দিয়া বায়ুপ্রবাহ ভাল চলিতে পারে না। ভেন্টিলেটরকে কর্মক্ষম করার জন্য অন্তত একটি দরজা খুলিয়া রাখা উচিত।

প্রশ্নমালা

(১) তাপে বায়ু প্রসারিত হয়, পরীক্ষা দ্বারা বুঝাও।

(২) উত্তাপে বায়ুপ্রবাহ কিরূপে জন্মে?

(৩) ভেন্টিলেটর সম্বন্ধে যাহা জান বল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কঠিন বস্তুর উপর তাপের প্রভাব

(Effect of heat on solid bodies)

তাপে কঠিন পদার্থের প্রসারণ হয় অর্থাৎ আয়তন বাড়ে। কিন্তু জল ও বায়ুর তুলনায় কঠিন পদার্থের প্রসারণ অনেক কম বলিয়া চোখে দেখা যায় না। পরীক্ষা দ্বারা এই প্রসারণ আমরা প্রমাণ করিতে পারি।

নীচের চিত্রে লোহার বলটি স্বাভাবিক অবস্থায় সহজেই আংটির ভিতর দিয়া গলিয়া (ক) যায়। কিন্তু যেই বলটি গরম করা হইল, তখনই
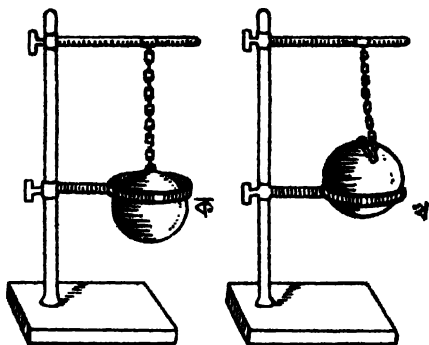
গরম বলটি (খ) আংটির ভিতর দিয়া গলিল না

দেখা যায় গরম বলটি (খ) আর আংটির ভিতর দিয়া গলিয়া যাইতেছে না। বলটির আয়তন বৃদ্ধির জন্যই যে এইরূপ হয় বলা নিষ্প্রয়োজন। বলটি ঠাণ্ডা হইলে উহা সংকুচিত হইয়া আবার পূর্ববৎ আংটির ভিতর দিয়া গলিয়া যাইবে।

আমরা প্রতিনিয়ত তাপে প্রসারণের পরিচয় পাইয়া থাকি। গরুর গাড়ীর চাকায় যে লোহার বেড় থাকে, উহা চাকার আয়তন অপেক্ষা খুব অল্প ছোট থাকে। বেড় ফিট করার সময়, তাপ দিয়া উহাকে খুব গরম করা হয়। উহাতে বেড়ের আয়তন বাড়ে এবং উহার মধ্যে চাকাটিকে সহজে প্রবেশ করানো যায়। তারপর ঠাণ্ডা হইলে বেড়ের আয়তন কমিয়া যায় এবং উহা বেশ আঁটভাবে চাকাখানির উপর লাগিয়া থাকে। কাচের বোতলের ছিপি আঁটিয়া গেলে বোতলের মুখ ঈষৎ গরম করিলেই, ছিপি আলগা হইয়া যায় তোমরা জান। ইহার কারণ এখন সহজেই বুঝিবে।

রেল লাইন পাতিবার সময় দুইখানা রেলের মাঝে একটু ফাঁক রাখা হয়। ঐরূপ ফাঁক না রাখিয়া যদি দুইখানি রেল পরস্পর সংলগ্ন করিয়া পাতা হইত, তাহা হইলে কি হইত দেখ। চাকার ঘর্ষণে রেল গরম হইয়া দৈর্ঘ্যে বাড়িয়া যায় এবং বাঁকিয়া বা ফুলিয়া উপরে উঠিত এবং ঐ অবস্থায় উহার উপর দিয়া ট্রেন চলিলে ট্রেনের স্থানচ্যুত হইয়া যাইবার খুব আশঙ্কা থাকিত। ফাঁক রাখা হয় বলিয়া তাপে প্রসারিত রেল ঐ ফাঁক দখল করিতে পারে, বাঁকিয়া যায় না।

কঠিন পদার্থ তাপে কেবল যে প্রসারিত হয় তাহা নহে। ধাতব পদার্থ আগুনের তাপে উত্তপ্ত হইয়া লাল হয়, উত্তাপ বাড়াইলে উহা ক্রমে শুভ্র বর্ণ ধারণ করে ও আলো বিকীরণ করিতে থাকে। উত্তাপ আরও বাড়াইলে শেষে ইহারা গলিয়া তরল অবস্থা লাভ করে। বিভিন্ন জিনিষ বিভিন্ন উষ্ণতায় গলে। মোম, জমানো ঘি বা নারিকেল তৈল প্রভৃতি পদার্থের উষ্ণতা অল্প মাত্রায় বৃদ্ধি করিলে উহারা গলিয়া যায়। কিন্তু লোহা, তামা ইত্যাদি পদার্থকে গলাইতে হইলে উহাদের উষ্ণতা খুব অধিক মাত্রায় বাড়ানো দরকার হইয়া থাকে।

দোলক ঘড়ি (Pendulum clock)

দেওয়ালে ঝুলানো বড় ঘড়ি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই, একটি গোলাকার দোলক (pendulum) টিক্ টিক্ শব্দ করিয়া দুলিতেছে। দোলকের দৈর্ঘ্যের উপর উহার দুলিবার সময় নির্ভর করে। দোলকের দৈর্ঘ্য বলিতে বুঝা যায়, দোলকের উপর প্রান্ত হইতে দোলকপিণ্ডের ভারকেন্দ্র অবধি। দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট থাকিলে প্রত্যেকবারের দোলন একই সময়ে নিষ্পন্ন হয়। দোলকের দুলিবার সময়ের সহিত ঘড়ির সময় ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। দুলিবার সময় কম বা বেশি হইলে ঘড়িও দ্রুত বা ধীর গতিতে চলিবে, কিন্তু ঘড়ি সর্বদা ঠিক সময় জ্ঞাপন করিবে ইহাই আমরা চাই।
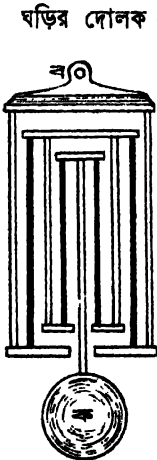
ঘড়ির দোলক ধাতুদ্বারা তৈয়ারি হয়। গ্রীষ্মকালে তাপের প্রভাবে উহার দৈর্ঘ্য বাড়ে এবং শীতকালে উহার দৈর্ঘ্য সংকোচনের জন্য কমিয়া যায়। এই কারণে গ্রীষ্মকালে ঘড়ি কিছু ধীর গতিতে (শ্লো—slow) এবং শীতকালে কিছু দ্রুত অর্থাৎ ফাষ্ট (fast) চলে। সাধারণ ঘড়িতে দোলকপিণ্ডটির নীচেকার স্ক্রু আবশ্যকমত ঘুরাইয়া ঐ দোলকপিণ্ডটিকে তুলিয়া বা নামাইয়া দিলে দোলকের দৈর্ঘ্য কমিয়া যায় বা বাড়ে এবং ঐ ভাবে দোলনের সময় অর্থাৎ ঘড়ির সময় নিয়মিত করা চলে। অনেক বড় ঘড়িতে এক প্রকার প্রতিবিহিত (compensated) দোলক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার উপর তাপের প্রভাব থাকিলেও ঐ দোলকের দৈর্ঘ্য সর্বদাই এক থাকে। এই দোলকে লোহা ও পিতল

প্রতিবিহিত দোলক

দুই প্রকারের ধাতু দ্বারা একটি কাটামো তৈয়ারি করা হয়। উহার মাঝখানে দোলকদণ্ড আছে। কাটামোর দুই প্রকারের দণ্ডগুলি এমনভাবে সাজানো যে উহার এক প্রকারের দণ্ডগুলি তাপে প্রসারিত হইয়া উপরে যতখানি উঠিতে চায়, অন্য প্রকারের দণ্ডগুলি প্রসারিত হইয়া ঠিক ততখানি নীচের দিকে নামিয়া আসিতে চায়। ফলে দাঁড়ায় এই, মাঝখানে দোলকপিণ্ডের ভারকেন্দ্র হইতে দোলকের বিলম্ববিন্দু পর্যন্ত যে ব্যবধান অর্থাৎ দোলকের দৈর্ঘ্য (কব) ঠিকই থাকিয়া যায়। কাজেই ইহার ব্যবহারে ঘড়ি নির্ভুল সময় জ্ঞাপন করিতে পারে।

প্রশ্নমালা

(১) তাপে কঠিন পদার্থের প্রসারণ হয় কেন, পরীক্ষা দ্বারা বুঝাও।
(২) প্রসারণের ফলের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।
(৩) ঘড়িতে প্রতিবিহিত দোলক ব্যবহৃত হয় কেন?

সপ্তম অধ্যায়

তাপ ও উষ্ণতা (Heat & Temperature)

তাপ ও উষ্ণতা একার্থ জ্ঞাপক নহে। একই পরিমাণ তাপ বিভিন্ন জিনিষের উষ্ণতা বিভিন্ন পরিমাণে বাড়াইতে পারে। একই জিনিষের উষ্ণতা দুই জনের কাছে দুই রকম বলিয়া বোধ হয়। যাহার দেহের তাপ কম তাহার কাছে জিনিষটি হয়ত বেশ গরম লাগিবে; কিন্তু যাহার তাপ বেশি তাহার নিকট উহাই ঠাণ্ডা বলিয়া অনুভূত হইবে। তোমার ডান হাত গরম জলে এবং বাম হাত বরফ মিশান ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখ। এখন উভয় হাত তুলিয়া সাধারণ জলে একই সময় ডুবাইলে দেখিবে, তোমার ডান হাত ঠাণ্ডা এবং বাম হাত গরম বোধ হইতেছে; অথচ সাধারণ জলের উষ্ণতা কিন্তু একই সময় দুই রকম হইতে পারে না। কাজেই দেখা যায় স্পর্শ দ্বারা সঠিকভাবে জিনিষের উষ্ণতা সকল সময় সকল অবস্থাতে জানা যায় না। উষ্ণতার পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় উহার নাম থার্মমিটার বা তাপমান যন্ত্র (thermometer)।

থার্মমিটার (Thermometer)

তাপে পদার্থের আয়তন বাড়ে, আর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সমানুপাতে ঐ আয়তনও বাড়িয়া যায়। উষ্ণতা কমিতে থাকিলে আবার ঠিক ঐ অনুপাতে পদার্থের সংকোচন অর্থাৎ আয়তনের হ্রাস পাইতে থাকে। তাপের এই ধর্মটির সাহায্য লইয়াই থার্মমিটার নির্মিত হইয়া থাকে। তরল পদার্থ অনেক কারণে সুবিধাজনক বলিয়া উহা

থার্মমিটার নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। তরল পদার্থের মধ্যে আবার পারদকে পছন্দ করা হয়, কেন না যে উষ্ণতায় জল ফোটে অথবা যে শৈত্যে উহা জমিয়া বরফ হয়, পারদ সেই উষ্ণতায় বা শৈত্যে তরল অবস্থাতেই থাকে।

থার্মমিটার যন্ত্রটি নির্মাণে সমান ছিদ্র বিশিষ্ট একটি সরু কাচনলের এক মুখ আগুনে গলাইয়া একটি খোলে পরিণত করিতে হয় এবং অপর মুখ প্রথমে খোলা থাকে। তারপর খোলটি এবং নলের খানিকটা পর পর ঠাণ্ডা ও গরম করিয়া পারদ দ্বারা ভর্তি করা হয়। এখন খোলটি বেশ উত্তপ্ত করিলে, পারদ প্রসারিত হইয়া উপরে উঠে এবং নলের ভিতরকার বায়ু সমস্ত তাড়াইয়া দেয়। এই অবস্থায় কাচনলের মুখ আগুনে গলাইয়া বন্ধ করিতে হয়। এখন যে যন্ত্রটি পাওয়া গেল, ইহার মধ্যে পারদই আছে, কোথাও এতটুকু বায়ু নাই। এই যন্ত্রটির উপর দুই ভাবে দাগ কাটিয়া দুই প্রকারের থার্মমিটার তৈয়ারি করা হয়। ইহার একটিকে সেন্টিগ্রেড (Centigrade) এবং অপরটিকে ফারেণহাইট (Fahrenheit) থার্মমিটার বলা হইয়া থাকে।

সেন্টিগ্রেড (স) ও ফারেণহাইট (ফ) থার্মমিটার
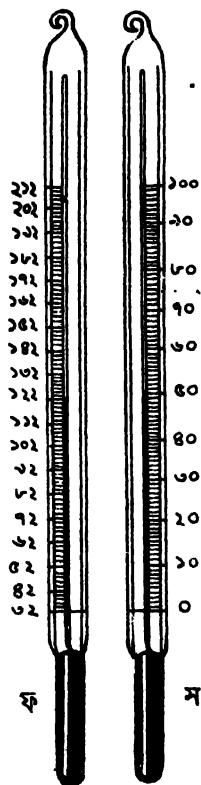
সেন্টিগ্রেড থার্মমিটার প্রস্তুত করিতে হইলে কি প্রক্রিয়ার দরকার হয় দেখ। প্রথমত পারদপূর্ণ খোলটি বরফের গুঁড়ার মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিয়া দেখিতে হইবে, পারদ নামিয়া আসিয়া কাচনলের কোন্ অংশে স্থির

হইয়া দাঁড়ায়। কাচনলের এই নির্দিষ্ট অংশটির উপর একটি দাগ কাটা হয়। এই দাগকে বলা হয় শূন্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড; কারণ বরফ শূন্য ডিগ্রীতে গলে বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। ইহাকে থার্মমিটারের নিম্ন স্থিরবিন্দু বা দ্রবনাঙ্কও বলা হয়। এইবার যন্ত্রটি ফুটন্ত জলের বাষ্পের মধ্যে রাখিয়া দেখিতে হয় পারদ তাপে প্রসারিত হইয়া কাচনলের মধ্য দিয়া উপরে উঠিয়া কোন্ জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। এই জায়গায় আবার কাচনলের উপর আর একটি দাগ কাটা হয়। এই দাগকে বলা হয় ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। কেন না ফুটন্ত জল ও উহার বাষ্পের উষ্ণতা ধরা হয় ১০০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। ইহাকে থার্মমিটারের উচ্চ স্থিরবিন্দু বা স্ফুটনাঙ্ক বলা হইয়া থাকে। এইভাবে থার্মমিটারের নিম্ন ও উচ্চ স্থিরবিন্দু পাওয়ার পরে ০° ডিগ্রী ও ১০০° ডিগ্রীর দূরত্ব সমান ১০০ ভাগে ভাগ করিয়া কাচনলের উপর দাগ কাটা হয়। প্রত্যেকটি ছোট অংশ এক ডিগ্রী ১° সেন্টিগ্রেড জ্ঞাপন করে। যন্ত্রে সাধারণত ১০° ডিগ্রী অন্তর অঙ্কচিহ্ন বসানো থাকে। কোন কোন যন্ত্রে ৫° ডিগ্রী অন্তরও অঙ্কচিহ্ন দেখা যায়।
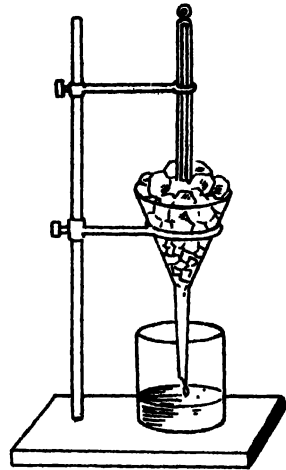
থার্মমিটারের দ্রবনাঙ্ক বাহির করা হইতেছে

ফারেণহাইট যন্ত্রে অন্যভাবে দাগ কাটা হয়। সেন্টিগ্রেডে যেখানে ০° ডিগ্রী ও ১০০° ডিগ্রী চিহ্নিত হয়, ফারেণহাইট নিয়মে সেখানে যথাক্রমে ৩২° এবং ২১২° ডিগ্রী ধরা হয় এবং দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী স্থান

সমান ১৮০ ভাগে ভাগ করিয়া বিভিন্ন ডিগ্রী পরিজ্ঞাপক অঙ্ক চিহ্নিত করিয়া রাখা হয়। প্রত্যেকটি ছোট ঘর ১° ডিগ্রী ফারেণহাইটের সমান। উপরের আলোচনা হইতে জানিলে, গলানো বরফের উষ্ণতা সেণ্টিগ্রেডে ০° শূন্য ডিগ্রী এবং ফারেণহাইটে ৩২° ডিগ্রী (৩২° ফাঃ)। তেমনি ফুটন্ত জলের ও উহার বাষ্পের উষ্ণতা যথাক্রমে ১০০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড (১০০° সেঃ) এবং ২১২° ডিগ্রী ফারেণহাইট (২১২° ফাঃ)।
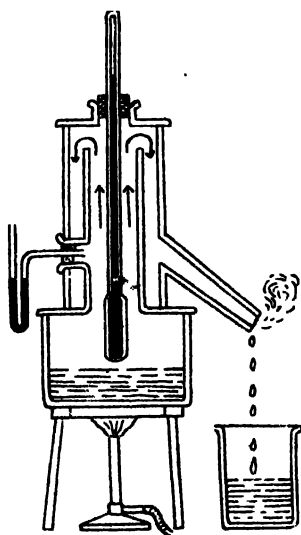
থার্মমিটারের স্ফুটনাঙ্ক বাহির করিবার ব্যবস্থা

মানুষের স্বাভাবিক তাপ প্রায় ৯৮°·৪ ফাঃ। একটু হিসাব করিলে দেখিবে সেণ্টিগ্রেডে ইহার পরিমাণ প্রায় ৩৭° ডিগ্রী। আমাদের দেহের তাপ জানিবার জন্য ফারেণহাইট চিহ্নযুক্ত ভিন্ন রকমের থার্মমিটার যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার নাম ক্লিনিকাল বা শারীর থার্মমিটার। এই যন্ত্রে ৯৪° ডিগ্রী হইতে ১১০° ফাঃ পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে।

১° ডিগ্রী অন্তর অঙ্কচিহ্ন দেওয়া থাকে। প্রত্যেকটি ডিগ্রী আবার ৫ ভাগে বিভক্ত। কাজেই ক্ষুদ্রতম অংশের পরিমাণ হইল ·২ ডিগ্রী। যদি ৯৯° ডিগ্রীর দাগ অতিক্রম করিয়া পারদ ক্ষুদ্র ৩ দাগে আসিয়া দাঁড়ায় তবে শরীরের উষ্ণতা হইবে ৯৯+·২×৩ অর্থাৎ ৯৯°·৬ ফাঃ।

ক্লিনিকাল থার্মমিটার মানুষের মুখে বা বগলে খানিক সময় রাখিয়া বাহিরে আনিলে পারদ উক্ত মানুষের উষ্ণতা অনুযায়ী দাগেই দাঁড়াইয়া থাকে, নামিয়া আসে না। পারদের খোল নীচের দিকে রাখিয়া দুএকবার ঝাঁকানি দিলেই পারদ সরু নল হইতে নামিয়া আসে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যবহারে যে থার্মমিটার দরকার হয় উহা গরম বা ঠাণ্ডা জিনিষ হইতে সরানোমাত্র পারদ আগের অথবা ঐ সময়কার আবহাওয়ার উষ্ণতা অনুযায়ী জায়গায় ফিরিয়া আসিতে থাকে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা প্রভৃতিতে সেন্টিগ্রেড থার্মমিটারই বেশি ব্যবহৃত হয়। আবহাওয়া আফিসে যে এক প্রকার থার্মমিটার ব্যবহৃত হয়, উহা আপনা আপনি দিন রাত্রির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নির্দেশ করে। পরীক্ষকগণ স্থানীয় উষ্ণতা অনেক সময় ফারেণহাইট স্কেলে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

১১০ ১০৯ ১০৮ ১০৭ ১০৬ ১০৫ ১০৪ ১০৩ ১০২ ১০১ ১০০ ৯৯ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯৪

ক্লিনিকাল থার্মমিটার

প্রশ্নমালা

(১) তাপ ও উষ্ণতায় প্রভেদ কি? স্পর্শ দ্বারা কোন জিনিষের উষ্ণতা ঠিকভাবে বোঝা যায় না কেন?

(২) থার্মমিটারের নির্মাণ প্রণালী কি? সেন্টিগ্রেড ও ফারেণহাইট থার্মমিটারের প্রভেদ কি?

(৩) থার্মমিটারে পারদ ব্যবহার করা হয় কেন?

অষ্টম অধ্যায়

উত্তাপ সঞ্চালন (Transference of Heat)

সাধারণত তিন প্রকারে তাপের চলাচল হইয়া থাকে। ইহাদের যথাক্রমে পরিবহন (conduction), পরিচলন (convection) এবং বিকীরণ (radiation) বলা হয়।

তাপের পরিবহন (Conduction of Heat)

একটি লোহার দণ্ডের এক প্রান্তে তাপ দিলে ঐ প্রান্তের লৌহ কণাগুলি প্রথমে গরম হয়। ঐ উত্তপ্ত কণাগুলি নিকটবর্তী অন্য কতকগুলি লৌহকণাকে তাপ দিয়া গরম করে। ইহারা আবার পরবর্তী কতকগুলি কণাকে তাপ দিয়া উহাদিকেও গরম করে। এইভাবে দণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে তাপ ক্রমে চলিতে থাকে এবং অবশেষে সমস্ত দণ্ডটি বেশ উত্তপ্ত হইয়া পড়ে। তাপের এইরূপ সঞ্চালনের নাম পরিবহন। এই পরিবহন প্রণালীতে যখন কোন জিনিষ গরম করা হয়, তখন উহার এক অংশের কণাগুলি উত্তপ্ত হইয়া ঐ তাপ বহন করিয়া অন্য অংশে সরিয়া যায় না। উহারা নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া গরম হয় এবং নিকটবর্তী কণাগুলিকে তাপ অর্পণ করিয়া উহাদের গরম করিয়া থাকে।

পরিবহন প্রণালীতে কঠিন পদার্থ গরম হইয়া থাকে। যে সমস্ত কঠিন পদার্থের অংশ বিশেষে তাপ দিলে সমগ্র পদার্থটাই তাড়াতাড়ি গরম হয় তাহাকে তাপের সুপরিবাহক বলা হয়। সকল জিনিষের তাপ-পরিবহন ক্ষমতা সমান নহে। কাচ ও কাঠের মধ্য দিয়া তাপ খুব কম যাইতে পারে। উনুনের ভিতরে কাঠের এক প্রান্ত যখন জ্বলিতে থাকে তখন

উহার বাহিরের অংশ অনায়াসেই হাত দিয়া ধরা যায়। ধাতব পদার্থ মাত্রই উত্তম তাপ-পরিবাহী (conductor)। তবে সকল ধাতুর তাপ-পরিবহন ক্ষমতা সমান নহে। এলুমিনিয়ম লোহার চেয়ে শীঘ্র গরম হয়। ফ্লানেল, করাতের গুঁড়া, তুলা, রেশম, পশম, কাগজ, পাখীর পালক প্রভৃতি খুব কম তাপ-পরিবাহী। এই কারণে রেশম, পশম এবং ফ্লানেলের জামা কাপড় অথবা তুলার লেপ শীতকালে ব্যবহার করিলে শরীরের তাপ উহাদের মধ্য দিয়া বাহির হইতে পারে না, শরীর গরম থাকে। পাখীর পালক, বিড়াল কুকুর প্রভৃতির লোম উহাদের দেহের তাপ আটকাইয়া রাখে, কাজেই বাহিরের ঠাণ্ডায় উহাদের কষ্ট হয় না। করাতের গুঁড়া দিয়া বরফ ঢাকিয়া রাখা হয় কেন এখন বুঝিলে। জল এবং বায়ু তাপ পরিবহনে মোটেই ভাল নহে।

তাপের পরিচলন (Convection of Heat)

পরিবহন প্রণালীতে তরল পদার্থ গরম করা যায় না। একটি পরীক্ষা-নলে জল লইয়া জলের উপরকার অংশে তাপ দিতে থাকিলে (পাশের চিত্র) ঐ জল অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ গরম হয়। কিন্তু নীচেকার জল প্রায় পূর্বাবস্থাতেই থাকে। একই কারণে সূর্যের তাপে পুষ্করিণীর উপরকার জল বেশ গরম হইলেও নীচেকার জল ঠাণ্ডা থাকে। বায়ব পদার্থের বেলাও এই রকম হইয়া থাকে। কি ভাবে তরল পদার্থ গরম হয় দেখা যাউক।
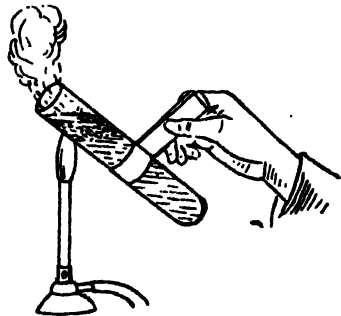
উপরের জল ফুটিতেছে, নীচের জল পূর্ববৎ আছে

একটি কাচপাত্রে খানিকটা জল লও এবং উহার ভিতর কিছু মেজেণ্টার গুঁড়া ফেলিয়া পাত্রটি গরম কর। একটু পরেই দেখিবে রঙের কণাগুলি জলের মধ্যে উঠা নামা করিতেছে এবং জলও ক্রমে গরম হইতেছে। রঙের কণাগুলির এরূপ উঠা নামার কারণ কি এবং কি উপায়ে জলের সমস্তটা গরম হইল দেখ। প্রথমত পরিবহন প্রণালীতে কাচপাত্রের তলদেশ গরম হয় এবং উহার সংস্পর্শে থাকায় কাচপাত্রের সর্বনিম্ন স্তরের জলও উষ্ণ হয়। এই জল গরম হইয়া আয়তনে বাড়ে এবং হালকা হয়। এই হালকা জল উপরে উঠে এবং ঐ হালকা জলের সঙ্গে রঙের কণাসকলও উপরে উঠে। এদিকে উপরকার ঠাণ্ডা ভারি জল নীচে আসিয়া ঐ গরম জলের স্থান অধিকার করে। এই জল আবার পাত্রের তলদেশে আসিয়া পূর্ববৎ গরম হইয়া হালকা হয় এবং উপরে উঠে, আর উপরের খানিকটা জল নীচে নামিয়া আসে। এইভাবে উপর-নীচে একটা জলস্রোত চলে এবং উহার সঙ্গে রঙের কণাগুলিও উঠে নামে। অবশেষে পাত্রের জল সর্বত্র সমান গরম হইয়া পড়ে। এইরূপ এক স্থান হইতে তাপের অন্য স্থানে চলাচলকে তাপের পরিচলন বলে। তাপ-পরিবহনে পদার্থের ক্ষুদ্র কণাগুলি নিজ নিজ স্থান ছাড়িয়া যায় না, কিন্তু পরিচলনে উহারা পদার্থের এক অংশ হইতে অন্য অংশে গমন করে। পরিবহন প্রণালীতে কোন পদার্থের যে কোন অংশ গরম করিলে, অন্যান্য অংশও একটু পরে গরম হয়। কিন্তু পরিচলন প্রণালীতে যে সকল জিনিষ (তরল ও বায়বীয়) গরম করা হয়, উহাদের তলাতেই তাপ দিতে হয়। বায়ুমণ্ডল পরিচলন
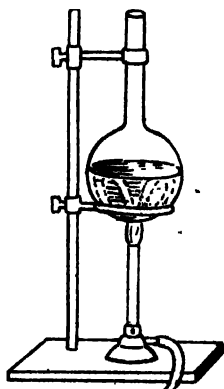
তাপে জলস্রোত উঠা নামা করিতেছে

প্রণালীতে গরম হইয়া থাকে। সূর্যতাপ বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়া আসিবার কালে উহাকে গরম করে না।

তাপের বিকীরণ (Radiation of Heat)

একটি উনুনে আগুন ধরাইয়া উহার কিছু দূরে এক পাশে বসিলে আমরা গরম্ অনুভব করি। এখানে কোন কঠিন পদার্থ যেমন লোহা দ্বারা আমাদের সঙ্গে উনুনের আগুনের কোন যোগ নাই। উনুন এবং আমাদের মাঝখানে আছে বায়ু। এই বায়ুর যে অংশ উনুনের ঠিক কাছে উহা গরম হইয়া হালকা হয়। এই হালকা বায়ু আশে পাশে বা নীচে না যাইয়া উপরেই উঠিবে। অতএব পরিবহন ও পরিচলন প্রণালীতে তাপ আমাদের নিকট আসে না। অথচ উনুনের একপাশে থাকিয়া আমরা তাপ অনুভব করি। কোন পদার্থের সাহায্য ভিন্ন এই যে প্রণালীতে তাপ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়, ইহাকে তাপের বিকীরণ বলে। বৈজ্ঞানিকগণ আলো ও তাপের বিকীরণ বুঝাইতে গিয়া ঈথারের পরিকল্পনা করিয়াছেন। জল, স্থল, বায়ু অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া এই ঈথার বিদ্যমান আছে। সূর্যের বা কোন আগুনের উৎস উহাদের চারিপাশের ঈথারে এক প্রকার তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং এই তরঙ্গ তাপশক্তিকে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেয়। উনুনের আগুনের চারিদিকে ঈথার তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং এই তরঙ্গ আসিয়া আমাদের শরীর স্পর্শ করে বলিয়া আমরা গরম অনুভব করিয়া থাকি। তাপশক্তি যখন ঈথারের সাহায্য লইয়া বিকীর্ণ হয়, তখন বায়ুর উষ্ণতার কোন পরিবর্তন ঘটে না। সূর্য তাপ বিকীরণ করে; এজন্য সূর্যতাপ আমাদের কাছে আসিবার সময় মধ্যবর্তী বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয় না।

তাপ বিকীরণের ছোট খাটো দৃষ্টান্তের সঙ্গে আমরা নিত্য পরিচিত। গরম জিনিষ আস্তে আস্তে তাপ বিকীরণ করিয়া ঠাণ্ডা হয়। দিনের বেলা ভূপৃষ্ঠ সূর্যের বিকীর্ণ তাপে উত্তপ্ত হয়। রাত্রে ভূপৃষ্ঠ ঐ তাপ ঊর্ধ্বে বিকীরণ করিয়া আবার ঠাণ্ডা হয়। গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় টীনের ঘরে থাকা যায় না, কিন্তু রাত্রিকালে টীন হইতে তাপ বিকীর্ণ হইয়া যায় বলিয়া ঘর পুনরায় বেশ ঠাণ্ডা হয়।

সকল জিনিষ সমান মাত্রায় তাপ বিকীরণ করে না। কঠিন পদার্থ তরল পদার্থের চেয়ে তাড়াতাড়ি গরম ও ঠাণ্ডা হয়। যে সকল জিনিষ শীঘ্র তাপ শোষণ করে, উহারাই আবার শীঘ্র তাপ বিকীরণ করিতে সমর্থ হয়। কাল বা রঙিন জিনিষ প্রচুর তাপ বিকীরণ করে, সাদা অথবা খুব মসৃণ জিনিষ হইতে খুব অল্প তাপই বিকীর্ণ হইয়া থাকে। চায়ের কেতলি, কাপ প্রভৃতি সাদা রঙের বলিয়া সহজে ঠাণ্ডা হয় না। আবার কাল পাথুর বাটি বা পাত্রে উষ্ণ তরল পদার্থ যেমন, দুধ, শীঘ্রই ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে।

পাশের চিত্রে একটি থার্মো-ফ্লাস্ক দেখান হইয়াছে। ইহার প্রধান অংশটি একটি কাচের পাত্র। কাচপাত্রটির দুইটি স্তর (প ও ফ) আছে। ঐ স্তর দুইটির মধ্যবর্তী স্থান বায়ুশূন্য করা হয়। "প" ও "ফ" স্তর দুইটি সাদা ও মসৃণ, আয়নার মত। কাচপাত্রটি একটি রঙিন ধাতব পাত্রের মধ্যে সোলার (স) উপর বসানো। উপরের খোলা মুখ সোলার ছিপি (ছ) দ্বারা বন্ধ করা হয়, তারপর আবার ধাতুর ঢাকনি দ্বারা ধাতব পাত্রটির মুখ আঁটিয়া দেওয়া হয়। এই সম্মিলিত যন্ত্রটিই থার্মো-ফ্লাস্ক। ইহাতে গরম দুধ বা জল রাখিলে কি
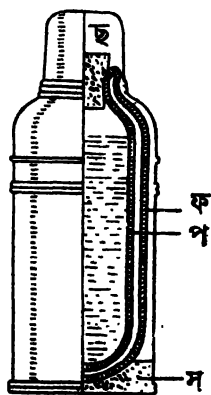
থার্মো-ফ্লাস্ক

হয় দেখ। পাত্রটি কাচের এবং উহার উপরে নীচে সোলা—ইহারা কু-পরিবাহক বলিয়া পরিবহন প্রথায় তাপ বাহির হইতে পারে না। কাঁচপাত্রের দুইটি স্তরের মাঝখান বায়ুশূন্য, কাজেই বায়ুর অভাবে তাপ পরিচলনও সম্ভব নয়। আবার সাদা ও মসৃণ বলিয়া কাচপাত্রটি খুব কম তাপই বিকীরণ করে। সুতরাং কোন প্রকারেই তাপ বিশেষ কমিতে পারে না বলিয়া ফ্লাস্কের দুধ, জল বা কোন তরল পানীয় অনেকক্ষণ গরম থাকিয়া যায়।

শক্তি ও শক্তির রূপান্তর
(Energy and its Transformation)

পদার্থের ওজন বা আয়তন মাপিলে উহার অস্তিত্ব ধরা পড়ে। কিন্তু কার্য-ক্ষমতার ভিতর দিয়াই আমরা শক্তির বিকাশ বুঝিয়া থাকি। একটি ভারি শক্ত জিনিষ ঘরের সিলিং-এ ঝুলান আছে। ঝুলাইবার দড়ীটি কাটিয়া দিলে জিনিষটি নীচে নামিয়া আসে, মেজের উপর গ্লাস বাটি থাকিলে উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া দেয়। এখানে ঝুলানো অবস্থায় ভারি জিনিসটির ছিল স্থিরশক্তি। আশ্রয়-শূন্য হওয়ায় স্থিরশক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হইয়া কার্য করার সামর্থ্য পাইল। উনুনের তাপে কেতলির জল উত্তপ্ত হয়, ক্রমে ফুটিয়া বাষ্পের সৃষ্টি করে, শেষে ঐ বাষ্প প্রবল চাপে কেতলির ঢাকনিটি ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়। এই সমস্ত ব্যাপারেই আমরা শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি। তাপ, আলোক, তড়িৎ, শব্দ, চুম্বক, গতিশক্তি ও স্থিরিশক্তি ইহারা শক্তির বিভিন্ন রূপ। কোন কার্য করার প্রয়োজন হইলে, শক্তি একরূপ হইতে অন্যরূপে পরিবর্তিত হয়। ইহার নাম শক্তির রূপান্তর। শক্তির রূপান্তর প্রতিনিয়ত আমাদের চতুর্দিকে চলিতেছে। দুই খণ্ড পাথর বা কাঠ হাতে ধরিয়া

ঘষিলে উহারা গরম হইয়া পড়ে। কয়লা পুড়িলে উহার তাপশক্তি বয়লারের জলকে বাষ্পে পরিণত করে। বাষ্পের চাপ আবার এঞ্জিনের পিষ্টনকে ইতস্তত চালনা করে। শেষকালে পিষ্টনের এই গতিশক্তি এঞ্জিনের চাকা ঘুরায়, তাই সমস্ত রেলগাড়ীটি লাইনের উপর দিয়া চলিতে থাকে। চলিবার সময় লাইন দুইটি আবার গরম হয়। এখানে তাপশক্তি হইতে গতিশক্তি এবং গতিশক্তি হইতে তাপশক্তির বিকাশ দেখা যায়। এঞ্জিনের চাকার সহিত ডাইনামো যুক্ত থাকে। চাকা ঘুরিবার সঙ্গে সঙ্গে এই গতিশক্তি ডাইনামোতে গিয়া তড়িৎশক্তির রূপ গ্রহণ করে। এই তড়িৎশক্তি তারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বিজলী বাতির মধ্যে তাপ ও আলো শক্তিরূপে প্রতিভাত হইয়া পড়ে। তড়িৎশক্তি তারে প্রবাহিত হইয়া আবার মোটর ঘুরায়—তাই পাখা চলে, কল-কারখানার যন্ত্র চলে, জল পাম্প করিয়া উপরে তোলার ব্যবস্থা হয়। এখানে তড়িৎশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হইল। সেতারের তার আঙ্গুল দিয়া টানিবামাত্র উহার কম্পন হয়; সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া আমাদের কানে প্রবেশ করে এবং শব্দের অনুভূতি জন্মায়। এখানে গতিশক্তি শব্দে পরিণত হইল।

এই যে বিভিন্ন শক্তি ও উহাদের রূপান্তরের কথা বলা হইল, ইহাদের সকলের উৎস হইল সূর্যের তেজ বা সৌর শক্তি। বহু যুগ ধরিয়া অরণ্যের গাছপালা সূর্যের আলো ও তাপ শোষণ করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উহারা ঘটনাচক্রে মাটি চাপা পড়িয়া ক্রমে চাপ ও উত্তাপের প্রভাবে কয়লায় পরিণত হইয়াছিল, ইহাই বৈজ্ঞানিকদের অভিমত। এই কয়লা জ্বালাইয়া আমরা আবার সেই প্রচ্ছন্ন সৌরতাপের সন্ধান পাই কয়লা পুড়িয়া আমরা যে এঞ্জিন চালাই সেই এঞ্জিন ডাইনামো ঘুরায়। ডাইনামো হইতে তড়িৎশক্তি আসিয়া বিজলী বাতি হইতে যে তীব্র আলো ও তাপ উদ্গীরণ করে, উহাও সেই সৌর শক্তিরই বিকাশ মাত্র।

বৈজ্ঞানিক জুল প্রথমে দেখান, নির্দিষ্ট পরিমাণ গতিশক্তি প্রয়োগে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপের উদ্ভব হয়। শক্তির যেখানেই রূপান্তর সেখানেই এই নিয়ম খাটে। ইহা হইতে আমরা একটি বিশেষ সিদ্ধান্তে আসিয়াছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র শক্তির একটা সুনির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, ইহা আমরা বাড়াইতেও পারি না, কমাইতেও পারি না। ইহার বিনাশ নাই। এক রূপ হইতে ভিন্ন রূপে পরিবর্তন হওয়াই শুধু সম্ভব।

প্রশ্নমালা

(১) তাপের সঞ্চালন কয় রকমে হয়? একটি করিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাও।

(২) পরিবহন ও পরিচলনে প্রভেদ কি? শীতকালে পশমের কাপড়, লেপ প্রভৃতি ব্যবহার করিলে শরীর গরম থাকে কেন?

(৩) থার্মো-ফ্লাস্কের গঠন ও ব্যবহার প্রণালী বর্ণনা কর।

(৪) শক্তির রূপান্তর হয় মাত্র; ইহার বিনাশ নাই—এ বিষয়ে যাহা জান লিখ।

নবম অধ্যায়

আলো (Light)

আলোর প্রকৃতি (Nature of Light)

আলোর প্রকৃতি কি, এ প্রশ্নটি বৈজ্ঞানিকদের মনে জাগিয়াছিল বহু প্রাচীনকালে। একদল বৈজ্ঞানিকের ধারণা ছিল, আলো অসংখ্য ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টি। দৃশ্যমান কোন আলোময় পদার্থ অথবা সূর্য

হইতে ঐ ক্ষুদ্র কণিকাগুলি ছুটিয়া বাহির হইয়া আমাদের চোখে পড়ে, তাই আমরা উহাদিগকে দেখিতে পাই। এই মত বেশি দিন চলে নাই। অবশেষে যে মতবাদ গৃহীত হইল তাহা এই—সূর্য এবং যে কোন উত্তপ্ত ও উজ্জ্বল পদার্থ চতুর্দিকের ঈথারে (তাপের বিকীরণ দ্রষ্টব্য) বড় ছোট নানাপ্রকার তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছে। এই তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল বেগে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। অপেক্ষাকৃত বড় তরঙ্গগুলি কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে উহারা গরম হয়, আমাদের দেহ স্পর্শ করিলে আমরা গরম অনুভব করি। কিন্তু ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিই দ্রব্য সামগ্রীর উপর পড়িয়া আলোরূপে প্রতিভাত হয়, আমাদের চোখে প্রবেশ করিয়া দৃষ্টির অনুভূতি জন্মায়।

আলো দেখা যায় না, কিন্তু কোন বস্তুর উপর পড়িয়া আলো উহাকে দৃশ্যমান করে। ইহার প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায়। অন্ধকার ঘরের কোন একটি দেওয়ালের ক্ষুদ্র একটি ছিদ্রপথ দিয়া সূর্যের আলো ভিতরে প্রবেশ করান হইল। আলোর পথে ধূলিকণা থাকে বলিয়া উহারাই আলোকিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসিয়া উপস্থিত হয়। ধূলিকণার অস্তিত্ব ভুলিয়া আমরা হয়ত মনে করিতাম আমরা আলোই দেখিতেছি। বাস্তবিক পক্ষে আমরা আলো দেখি না, আলোময় বা আলোকিত দ্রব্যসামগ্রীই দেখিয়া থাকি।

যে সমস্ত পদার্থের মধ্য দিয়া আলো অবাধে চলিতে পারে, উহাদিগকে স্বচ্ছ (transparent) পদার্থ বলে। বায়ু, জল, কাচ এবং স্ফটিক প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। আবার যে সকল পদার্থের মধ্য দিয়া আলো চলিতে পারে না, উহারা অস্বচ্ছ (opaque) পদার্থ; যেমন, কাঠ, পাথর, ইট, আয়না এবং লোহা রূপা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ। কাগজ, ঘষাকাঁচ, ধাতুর খুব পাতলা পাত প্রভৃতি কতকগুলি বস্তুর মধ্য দিয়া আলো অল্প পরিমাণে চলিতে পারে। ইহারা ঈষৎ স্বচ্ছ (translucent) পদার্থ।

আলোর সরল রেখায় গমন
(Rectilinear Propagation of Light)

আলোকরশ্মি আলোর উৎপত্তিস্থল হইতে চতুর্দিকে সরল রেখায় চলিয়া থাকে। ধূলিকণাপূর্ণ অন্ধকার ঘরে কোন ছিদ্র দিয়া আলো প্রবেশ করান হইলে, দেখা যায় আলোকরশ্মি ঠিক সরল রেখায় ছিদ্রমুখ হইতে ঘরের মধ্যে যাইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে দুইটি সহজ পরীক্ষার উল্লেখ করিব। প্রথম পরীক্ষাটির জন্য নীচের চিত্রের অনুরূপ ব্যবস্থা
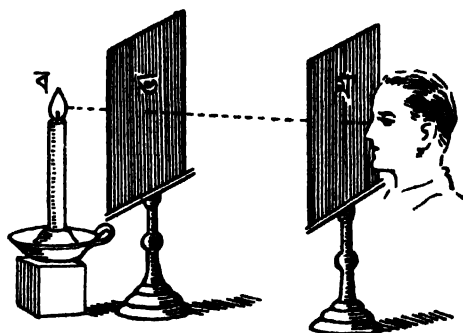
বাতির শিখা "বভম" রেখায় দেখা যাইতেছে

করিতে হইবে। দুইখানি পুরু কাগজ, কাঠের সঙ্গে আটকাইয়া পর পর খাড়াভাবে বসান আছে। প্রত্যেক খণ্ডের মাঝখানে একটি করিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্র (ভ, ম) দেখিবে। কাগজ দুইখানির কোন একদিকে একটি মোমবাতি এমনভাবে রাখা হইল যে বাতির শিখা (ব) এবং কাগজ দুইখানির ছিদ্র (ভ, ম) যোগ করিলে "ব ভ ম" একটি সরল রেখা হইয়া দাঁড়ায়। এখন "ম"এর পিছনে ঐ সরল রেখার বরাবর চোখ রাখিলে বাতির শিখা বেশ দেখা যায়। কিন্তু মোমবাতি, চোখ অথবা যে

কোন একখানি কাগজ পাশাপাশি দিকে একটুও সরাইলে, বাতির শিখা অদৃশ্য হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় পরীক্ষাটি অন্ধকার ঘরে করিতে হইবে। একটি মোমবাতি জ্বালিয়া উহার একদিকে একটি পর্দা খাড়াভাবে দাঁড় করাইয়া রাখ। একখণ্ড কাগজের মধ্যে আলপিন দিয়া একটি সরু ছিদ্র করিয়া কাগজ-খানি মোমবাতি ও পর্দার মধ্যবর্তী কোথাও খাড়াভাবে বসাও। দেখ,
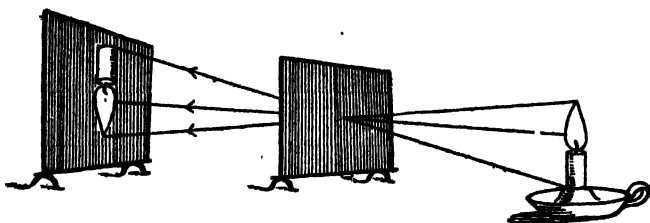
পর্দায় মোমবাতির উল্টা ছবি পড়িয়াছে

পর্দার উপর মোমবাতির একটি উল্টা ছবি পড়িয়াছে। আলো সরল রেখায় চলে বলিয়াই যে ইহা সম্ভব হইল, তাহা চিত্র দেখিয়া বুঝিতে পারিবে।

আলোকরশ্মির সরল রেখায় চলার পরিণাম ছায়ার উৎপত্তি। অস্বচ্ছ পদার্থ যখন আলোর চলার পথে বাধা দেয়, তখন ঐ অস্বচ্ছ পদার্থের পিছনে আলো পড়িতে পারে না, অন্ধকার হয়। ঐ অস্বচ্ছ পদার্থটির প্রত্যেক অংশই বাধা দেয় বলিয়া, ছায়া ঐ পদার্থের আকৃতি অনুযায়ী হয়। ঘরের দেওয়ালে উঁচু জায়গায় একটি বাতি জ্বলিতেছে। মেঝের উপর একখানা চৌকা লম্বা কাঠ দাঁড় করানো আছে। দেখা যায়, মেঝের উপর কাঠখানির ছায়া পড়িয়াছে। বাতি, কাঠের শীর্ষদেশ ও ছায়ার দূরবর্তী প্রান্তভাগ যোগ করিলে, একটা সরল রেখা পাওয়া যাইবে।

বাতির এবং অস্বচ্ছ পদার্থটির আয়তনের উপর নির্ভর করিয়া বিভিন্ন প্রকারের ছায়া হইয়া থাকে।

(১) মনে কর "ক" একটি বিন্দু পরিমিত উজ্জ্বল পদার্থ। "খগ" একটি অস্বচ্ছ বস্তু। "ক" হইতে বিকীরিত আলোর সরল পথে "খগ" বস্তুটি অন্তরায় থাকায় পর্দার উপর "চছ" স্থানে ছায়া পড়িয়াছে। "চ"র উপরস্থিত এবং "ছ"র নিম্নস্থিত পর্দার অংশে উজ্জ্বল বিন্দু হইতে সরল রেখায় আলো পৌঁছাইতে পারে। "চছ"র মধ্যে আলো থাকা সম্ভব হইত যদি উজ্জ্বল বিন্দু হইতে বিকীরিত আলোকরশ্মি "খগ" বস্তুটির ধারের কাছে বাঁকিয়া যাইতে পারিত। বাঁকিয়া যাইতে পারে না বলিয়াই চিত্রে "চছ" ছায়াটি অন্ধকার, উহার উপর ও নীচ আলোকিত। "চ", "ছ" বিন্দু দুইটি ছায়াটির সীমা নির্দেশ করিতেছে।
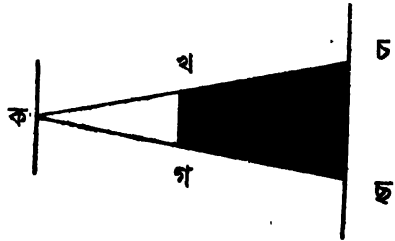
"চছ" জায়গায় ছায়া পড়িয়াছে

(২) উজ্জ্বল পদার্থটি অপেক্ষাকৃত বড় কিন্তু সামনের অস্বচ্ছ বস্তুটির চেয়ে ছোট হইলে, ছায়ার প্রকৃতি অন্য রকম হয়। মনে কর "কখ" (পর পৃষ্ঠায় ছবি দেখ) একটি উজ্জ্বল পদার্থ। উহা হইতে বিকীর্ণ আলোর সরল পথে "গঘ" অস্বচ্ছ বস্তুটি থাকায় পর্দার "পভ"স্থানে ছায়া পড়িতেছে। "প"র উপরস্থিত অংশে এবং "ভ"র নিম্নস্থিত অংশে "কখ"এর সম্মুখস্থ সকল স্থান হইতেই আলো সরল রেখায় পৌঁছিতে পারে বলিয়া ঐ অংশগুলি আলোকিত। "কখ" হইতে কোন সরল রেখা "গঘ"তে বাধা না পাইয়া "ফব" স্থানে পৌঁছিতে পারে না। সুতরাং "কখ" হইতে একটুও আলো না পাওয়ায় "ফব" স্থানে সম্পূর্ণ ছায়া বা ঘনান্ধকার বিরাজ করে। ইহার নাম প্রচ্ছায়া (umbra)। কিন্তু "পফ" স্থানে

এবং "বভ" স্থানে "কখ"এর কেবল নীচের ও উপরের একটু অংশ হইতে সরল রেখায় আলো আসিতে পারে, কাজেই "পফ" এবং "বভ" অংশে অন্ধকারের গাঢ়তা কম। ইহাদের উপচ্ছায়া (penumbra) বলা হয়। উজ্জ্বল পদার্থটি অস্বচ্ছ পদার্থটির চেয়ে অনেক বড় হইলে দেখা যায়, পদার্থটি যদি অস্বচ্ছ পদার্থ হইতে অল্প দূর অবধি রাখা যায়, তবে পূর্বেকার মত ছায়া তৈয়ারি হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখিলে প্রচ্ছায়া বিন্দুতে পরিণত হয়। ঐ দূরত্ব অতিক্রম করিলে আর ছায়াই পাওয়া যায় না। টেবিলের উপর বাতি রাখিয়া ছোট একটি পেন্সিল দেওয়ালের কাছ হইতে ক্রমে দূরে সরাইয়া লও। দেখিবে ছায়ার আকৃতি এই নিয়মে বদলাইতেছে।
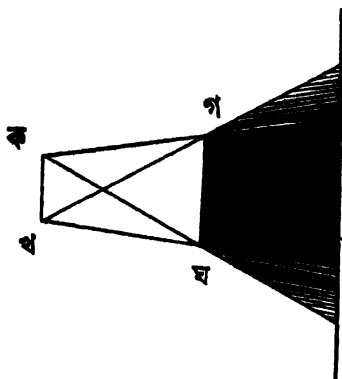
"পভ" ছায়ার "ফব" প্রচ্ছায়া এবং "পফ," "বভ" উপচ্ছায়া

প্রশ্নমালা

(১) "আলো আমরা দেখি না, আলোকিত বস্তুই দেখি"—প্রমাণ কর।

(২) আলো সরল রেখায় চলে, কয়েকটি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর।

(৩) প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া কাহাকে বলে? উহারা কিরূপে তৈয়ারি হয় চিত্র দ্বারা দেখাও। পাখীরা যখন আকাশে উড়ে তখন মাটির উপর উহাদের ছায়ার কিরূপ পরিবর্তন হয় বল।

দশম অধ্যায়

আলোর প্রতিফলন (Reflection of Light)

আলোকরশ্মির সরল রেখায় চলিবার পথে যদি ঐ রশ্মি কোন মসৃণ অস্বচ্ছ সমতল পদার্থের উপর পড়ে, তবে উহা প্রতিহত হইয়া ভিন্ন দিকে ফিরিয়া আসে—ইহার নাম আলোর প্রতিফলন। দর্পণের কোন জায়গায় আলো পড়িলে, আলো ঐ জায়গা হইতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। দর্পণ এবং উহার মত মসৃণ অস্বচ্ছ পদার্থকে প্রতিফলক বলে। প্রতিফলকের (পাশের চিত্র) উপর যেখানে (অ) আলোকরশ্মি আপতিত হয়, উহার নাম পাতনবিন্দু (point of incidence)। ঐ বিন্দু হইতে প্রতিফলকের উপর লম্ব-রেখা (অগ) টানিলে, উহাকে অভিলম্ব (normal) বলা হয়। আপতিত রশ্মি(কঅ) এই অভিলম্বের সহিত যে কোণ (কঅগ) করে, তাহাকে আপতন কোণ (angle of incidence) এবং প্রতিফলিত রশ্মি ঐ অভিলম্বের সহিত যে কোণ (গঅখ) করে, তাহাকে প্রতিফলন কোণ (angle of reflection) বলে। সমতল প্রতিফলক হইতে প্রত্যেক আলোকরশ্মি নিম্নলিখিত দুইটি নিয়ম অনুসারে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।
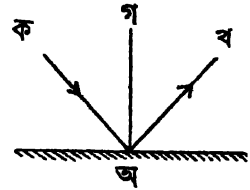
আয়নার উপর আলোর প্রতিফলন

(১) আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থান করে। (২) আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ পরস্পর সমান। আলোকরশ্মি যদি লম্বভাবে আয়নার উপর আপতিত হয়, তবে উহা লম্বের বরাবরই বিপরীত দিকে প্রতিফলিত হয়। পর পৃষ্ঠার চিত্রে, একখানা অন্ধকার ঘরে সরু ছিদ্র (ক) দিয়া সূর্যের আলো একখানি

আয়নার (অ) উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। এখানে "কঅ" আপতিত রশ্মি, "অখ" প্রতিফলিত রশ্মি, "অগ" অভিলম্ব। বিশেষ যন্ত্র
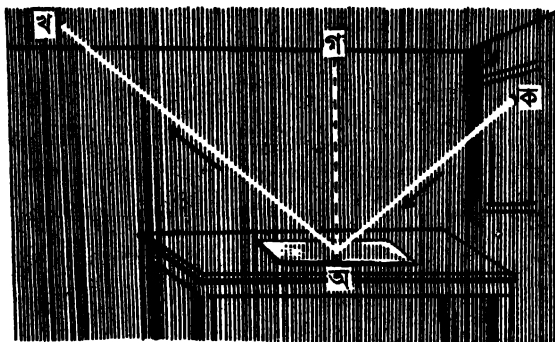
সূর্যের আলোর প্রতিফলন

সাহায্যে দেখানো যায়, আপ্লুতন কোণ "কঅগ" এবং প্রতিফলন কোণ "গঅখ" পরস্পর সমান।

উজ্জ্বল বস্তু হইতে বিভিন্নমুখী (Divergent) রশ্মি দর্পণের উপর পড়িলে, পূর্বোক্ত নিয়মে উহারা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এই প্রতিফলিত রশ্মির কতকগুলি আমাদের চোখে পড়িলে, আমরা ঐ দর্পণের পিছনে বস্তুটির অনুরূপ প্রতিকৃতি বা প্রতিবিম্ব (Image) দেখি। আলোর প্রতি-ফলনের দ্বিতীয় নিয়ম খাটাইয়া প্রমাণ করা যায় যে, কোন বস্তু ও উহার প্রতিবিম্ব দর্পণ অথবা প্রতিফলক হইতে সমদূরে অবস্থিত। মোম বাতির প্রতিবিম্ব এবং উহা কি প্রকারে আমাদের চোখে পড়ে, পর পৃষ্ঠার চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। দেখ, আয়না (অ) হইতে মোমবাতি (ক) এবং উহার প্রতিবিম্ব (খ) উভয়ের দূরত্ব সমান। বাজারে কাঠের ফ্রেমওয়ালা আয়না কিনিবার সময় উহার উপর আঙ্গুল রাখিয়া যদি দেখ আঙ্গুলের প্রতিবিম্ব আঙ্গুলের খুব কাছে, তবে বুঝিবে আয়নাখানি পুরু নয়। আয়না

যত দূরে হইবে প্রতিবিম্বও আঙ্গুলের তত দূরে দেখিবে। দর্পণে আমাদের প্রতিবিম্বের ডান হাত আমাদের বাম হাতের অনুরূপ, ডান চোখ আমাদের
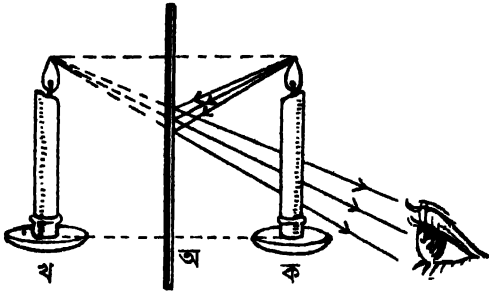
মোমবাতি ও উহার প্রতিবিম্ব

বাম চোখের অনুরূপ হয়। অর্থাৎ প্রতিবিম্বের ডান অংশ আমাদের দেহের বাম অংশের সহিত এবং বাম অংশ আমাদের দেহের ডান অংশের সহিত সম্পূর্ণ একরূপ দেখায়। একখানা কাগজে উল্টা "ক" অক্ষরটি লিখিয়া দর্পণের সামনে ধরিলে, অক্ষরটির প্রতিবিম্ব ঠিক সোজাভাবে দেখা যায়।

প্রতিবিম্বটি সোজা দেখায়

একখানি আয়নার উপর হইতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি দ্বিতীয় একখানি আয়নার উপর পড়িলে, উহা আবার প্রতিফলিত হইয়া থাকে। খেলার মাঠে খুব দূরে থাকিয়া পেরিসকোপ নামক এক প্রকার যন্ত্র দ্বারা ভিড়ের পিছনে দাঁড়াইয়া খেলা দেখা হয়। দুইখানি আয়না দ্বারা আলোর যে প্রতিফলন হয়, তাহার উপর যন্ত্রটির কার্য্যপদ্ধতি নির্ভর করে।

প্রশ্নমালা

(১) আলোর প্রতিফলনের দুইটি নিয়ম কি ?

(২) প্রতিবিম্ব কাহাকে বলে ? দর্পণে মানুষের প্রতিবিম্ব কিরূপ হয় ? একটি রবারের বলের প্রতিবিম্বই বা কিরূপ ?

(৩) সূর্যের দিকে মুখ করিয়া আয়না ধরিলে, প্রতিফলিত আলো কোন জিনিষের উপর পড়ে কি ?

একাদশ অধ্যায়

আলোর প্রতিসরণ
(Refraction of Light)

একই রকম প্রকৃতি ও গুরুত্বের স্বচ্ছ পদার্থে আলো সরল রেখায় চলে। কিন্তু যখন আলোকরশ্মি কোন বিশেষ স্বচ্ছ পদার্থের (যেমন বায়ুর) ভিতর সোজা চলিতে চলিতে ভিন্ন প্রকৃতির স্বচ্ছ পদার্থের (যেমন জলের) সম্মুখীন হয়, তখন উহা বাঁকিয়া পরিবর্তিত সরল রেখায় ঐ ভিন্ন প্রকৃতির স্বচ্ছ পদার্থের (যেমন জলের) মধ্যে চলা আরম্ভ করে। এক প্রকৃতির স্বচ্ছ পদার্থ হইতে ভিন্ন প্রকৃতির স্বচ্ছ পদার্থে প্রবেশ করিবার সময়, আলোর এই যে গতিপথের পরিবর্তন, ইহার নাম আলোর প্রতিসরণ (Refraction)। জলের ভিতর এই আলোকরশ্মি যে ভিন্ন সরল রেখায় বাঁকিয়া চলে, উহার নাম প্রতিসরিত রশ্মি (Refracted ray)। সূর্যের আলো বরাবর জলে পড়িয়া কি ভাবে

প্রতিসরিত হয়, নীচের চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। আপতিত রশ্মি (Incident ray) যে বিন্দুতে জলের উপর পড়ে, তাহার নাম পাতনবিন্দু। পাতনবিন্দু হইতে জলের সমতলের উপর লম্ব টানিলে, অভিলম্ব (Normal) পাওয়া যায়। আপতিত রশ্মি লম্বের সহিত যে কোণ তৈয়ারি করে, উহার নাম আপতন কোণ (Angle of incidence), এবং প্রতিসরিত রশ্মি লম্বের সহিত যে কোণ করে, উহার নাম প্রতিসরণ কোণ (Angle of refraction)। পর পৃষ্ঠায় প্রথম চিত্রে "কখ" আপতিত রশ্মি, "খগ"
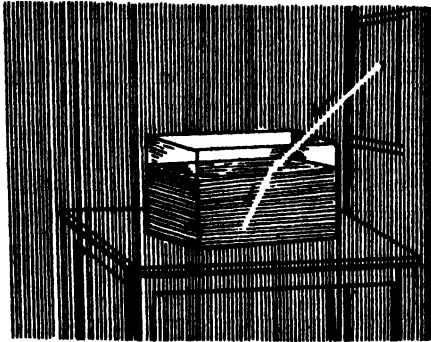
সূর্যালোকরশ্মির জলে প্রতিসরণ

প্রতিসরিত রশ্মি, "চখছ" অভিলম্ব; আর "কখচ" এবং "গখছ" যথাক্রমে আপতন ও প্রতিসরণ কোণ। আলোর প্রতিসরণেরও দুইটি নিয়ম আছে। যথা :—(১) আপতন রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং অভিলম্ব এক সমতলে থাকে। (২) আলোর প্রতিসরণ কোণ অর্থাৎ প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্বের দিকে কতখানি বাঁকিয়া যাইবে তাহা নির্দেশ করে। আপতন কোণ বড় বা ছোট হইলে, নির্দিষ্ট অনুপাতে প্রতিসরণ কোণও বড় বা ছোট হইবে।

আলোকরশ্মি বায়ু হইতে জলে (নীচের প্রথম চিত্র) প্রবেশ করার সময়, প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্বের দিকে হেলিয়া পড়ে অর্থাৎ আপতন
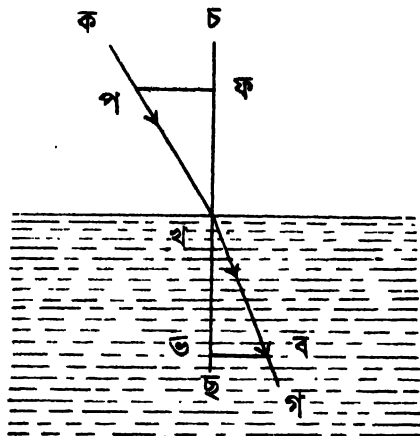
জলে আলোর প্রতিসরণ

কোণ অপেক্ষা প্রতিসরণ কোণ ছোট হয়। আবার আলোকরশ্মি যখন জলের মধ্য হইতে বায়ুতে প্রতিসরিত হইয়া আসে, তখন আপতন কোণ অপেক্ষা প্রতিসরণ কোণ বড় হয়, অর্থাৎ প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব হইতে দূরে হেলিয়া যায়। পাশের ছবিতে বায়ু হইতে চৌকোনা কাচের মধ্য দিয়া আলোক রশ্মির প্রতিসরণ দেখান হইয়াছে।
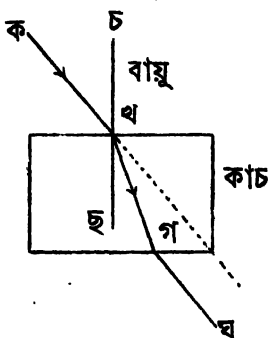
কাচে আলোর প্রতিসরণ

আলোর প্রতিসরণের ফলে অনেক কৌতুকপ্রদ ব্যাপার দেখা যায়। পর পৃষ্ঠার চিত্রে জলের মধ্যে লাঠিখানির ডুবানো অংশ বাঁকা মনে হয়।

লাঠিখানির নিম্নতম অংশ হইতে কয়েকটি আলোকরশ্মি জলের মধ্য দিয়া চলিয়া, বায়ুতে বড় কোণে প্রতিসরিত হইয়া, তোমার চোখে পড়িল। এই চোখে-পড়া বিভিন্নমুখী আলোকরশ্মিপথ পিছনে বাড়াইয়া দিলে যে বিন্দুতে মিলিত হয়, সেইখানে লাঠির নিম্নতম অংশ দেখা যাইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। ডুবানো ভাগের প্রতি অংশই এইরূপ অল্প বেশি উপর হইতে দেখা যায়। কাজেই লাঠিখানির ডুবানো অংশ বাঁকিয়া
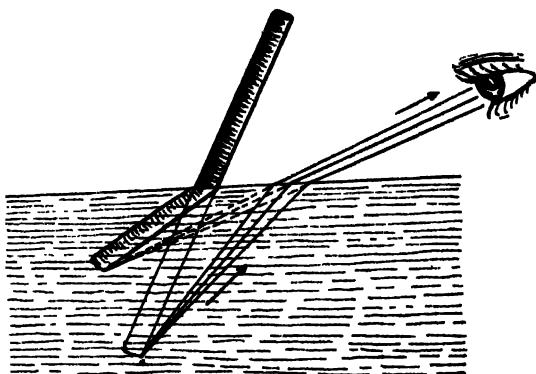
লাঠির ডুবানো অংশ বাঁকা দেখায়

গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আলোকরশ্মি লম্বভাবে জলের উপর পড়িলে, জলের মধ্যে উহা বাঁকিয়া যায় না, একই পথে বরাবর চলিতে থাকে। এইজন্য কাত না করিয়া লম্বভাবে লাঠিখানি জলে ডুবাইলে, ডুবানো অংশ একটু ছোট দেখায়, বাঁকা দেখায় না। আলোর প্রতিসরণের জন্য জলপূর্ণ পাত্র বা চৌবাচ্চার তলদেশ অনেক উঁচুতে দেখায়; একখানা চৌকস কাচখণ্ড কোন লেখার উপর রাখিলে, লেখাগুলি উপরে মনে হয়।

অপেক্ষাকৃত ঘন স্বচ্ছ বস্তু হইতে লঘু স্বচ্ছ বস্তুতে আলো আসিবার সময়, প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণ অপেক্ষা বড় হয় জান। আপতন কোণের বৃদ্ধিতে প্রতিসরণ কোণেরও বৃদ্ধি হয়। কিন্তু আপতন কোণ ক্রমে বড় হইয়া একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছিলে, আলোর আর প্রতিসরণ হয় না, ঘন ও লঘু পদার্থের সংযোগ স্থানে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হইয়া ঘন পদার্থের মধ্যে ফিরিয়া আসে, লঘু পদার্থে প্রবেশ করিতে পারে না।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন বায়ু-স্তরের গুরুত্ব বিভিন্ন; সমুদ্র, বক্ষের ঠিক উপরকার বায়ু-স্তর ঘন। ঐ স্তরের যত উপরে যাওয়া যায়, বায়ু-স্তর
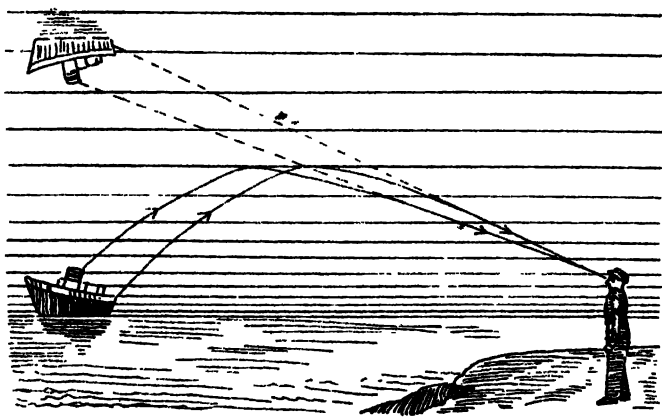
মরীচিকা

তত লঘু। আলো অনেক সময় ঘন নিম্ন স্তরের বায়ু হইতে উপরের লঘু স্তরে যাইবার সময়, সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়া পড়ে। এই প্রতিফলিত রশ্মিও সাধারণ প্রতিফলনের নিয়মের অনুবর্তন করিয়া চলে,

এবং প্রতিবিম্ব রচনার সহায়তা করে। এইরূপ সম্পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য অনেক সময় অনেক স্থানে সমুদ্রের উপরকার জাহাজের উল্টা প্রতিকৃতি আকাশে দেখা যায়। ইহাকে মরীচিকা (৭২ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ) বলে।

প্রশ্নমালা

(১) আলোর প্রতিসরণ কাহাকে বলে? উহার দুইটি নিয়ম কি?

(২) জলে লাঠি কাতভাবে ডুবাইলে, উহা বাঁকা দেখা যায় কেন?

(৩) আলোর প্রতিসরণের ফল বুঝাইবার জন্য দুইটি দৃষ্টান্ত দাও।

(৪) মরীচিকা কাহাকে বলে?

দ্বাদশ অধ্যায়

বর্ণ ও বর্ণালী (Colour & Spectrum)

সূর্যের আলোর রঙ আমাদের কাছে সাদা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে অসংখ্য ভিন্ন প্রকার রঙের আলোর মিশ্রণের ফল। এই রঙগুলিকে সুবিধার জন্য বিশিষ্ট সাতটি রঙে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। এই সাতটি শ্রেণীবদ্ধ করা রঙের নাম যথাক্রমে—বেগনি (Violet), গাঢ়নীল (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow), নারঙ্গ (Orange) এবং লাল (Red)। সূর্যের সাদা রঙ-এর এই সাতটি বিশেষ উপাদান পৃথকভাবে পাশাপাশি বর্তমান থাকিলে যে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ হয়, উহার নাম বর্ণালী (Spectrum)। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন সর্বপ্রথমে দেখিতে পান, সূর্যের আলোকরশ্মি কাচের প্রিজমের (Prism) মধ্যে প্রতিসরিত হইয়া অপর দিক হইতে শুধু বাঁকিয়া বাহির হয় না, পূর্বোক্ত সাতটি উপাদানে

বিশ্লিষ্ট হইয়াও পড়ে। নীচের চিত্রে "স" ছিদ্রমুখে সূর্যের আলো ফেলান হইয়াছে। এই আলো কোন অন্তরায় না থাকিলে "সস'" সরল রেখায় গিয়া পর্দার উপরে পড়িবে। কিন্তু আলোর পথে চিত্রে প্রদর্শিত ভাবে একটি কাচের প্রিজম রাখিলে, সূর্যের আলো বায়ুতে পূর্বের সরল রেখায় চলিয়া প্রিজমের এক পাশ স্পর্শ করিবে, এবং পরিবর্তিত সরল পথে কাচের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবে। প্রিজম হইতে বায়ুতে প্রবেশ করিবার জন্য আলোর পথের আবার পরিবর্তন ঘটিবে। সূর্যের আলো প্রিজমের
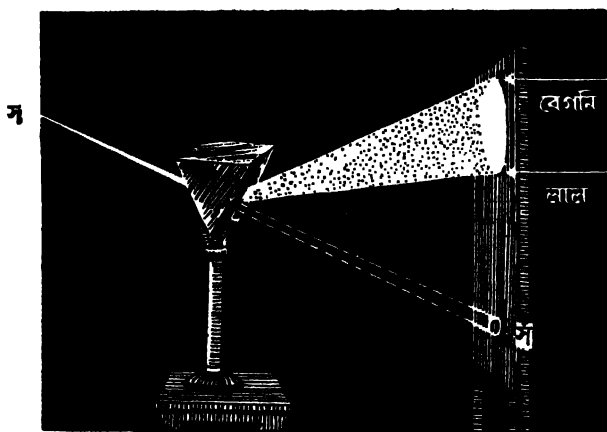
বর্ণালী

বিপরীত পাশ হইতে বাহির হইয়া যখন পর্দার উপর পড়িল, তখন দেখা যায়, সাদা আলো বিশ্লিষ্ট হইয়া সাতটি বর্ণের ধারা সৃষ্টি করিয়াছে। পর্দার উপরে সর্বোপরি বেগনি, সর্বনিম্নে লাল এবং মধ্যবর্তী স্থানে গাঢ়নীল, নীল, সবুজ প্রভৃতি পরে পরে দেখা যাইবে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের আলোর প্রতিসরণের মাত্রা বিভিন্ন বলিয়া উহারা পর্দার বিভিন্ন জায়গায় পড়িল। আর একটি সহজ পরীক্ষার কথা বলি।

একখানি গোল কার্ডবোর্ডের এক দিক নির্দিষ্ট অনুপাতে সাতটি বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, উহাকে জোরে ঘুরাইলে উহা সাদা মনে হয়, বিভিন্ন বর্ণগুলি আলাদা ভাবে দেখা যায় না। খুব জোরে ঘুরানোর জন্য কার্ডবোর্ডখানির কোন একটি বর্ণ চোখে পড়িয়াই যেমন উহা সরিয়া যায় তেমনি উহার পরবর্তী রঙটি চোখে আসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রথম যে বর্ণ চোখে পড়িল উহার অনুভূতি বর্ণটি সরিয়া যাওয়া সত্বেও স্বল্পক্ষণ থাকিয়া যায় অর্থাৎ ঐ বর্ণের অনুভূতি থাকিতে থাকিতে পরবর্তী বর্ণটি চোখে পড়ে ; ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ আমরা সমষ্টিগতভাবে দেখিয়া থাকি। এদিকে কার্ডখানি ক্রমাগত ঘুরানো হয় বলিয়া ও দর্শন অনুভূতির পর্যবস্থানের (Persistence of Vision) জন্য আমরা প্রতিমূহুর্তে কার্ডবোর্ডখানির সমস্ত বর্ণ সমষ্টিগতভাবে দেখিয়া থাকি। কাজেই সাদা আলোর বর্ণ যে প্রধানত সাতটি বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণের ফল তাহাই প্রমাণিত হইয়া গেল।
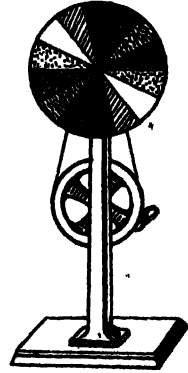
রঙিন কাগজখানি ঘুরাইলে সাদা দেখায়

উপরি কথিত দুইটি পরীক্ষা দ্বারাই নিউটন সিদ্ধান্ত করিলেন, সূর্যের সাদা আলো সাতটি বিভিন্ন বর্ণের সমষ্টি। কাচ বা প্রিজমের মধ্য দিয়া মোমবাতির আলো, বিজলীবাতির আলো, অথবা সূর্যের আলোর দিকে তাকাইলেই, আমরা বর্ণালী দেখিতে পাই।

রামধনু (Rainbow)

সূর্যের আলো জলের মধ্যে পড়িলেও বর্ণালীর সৃষ্টি হইয়া থাকে। বারিপাতের সময় আকাশে আমরা যে রামধনু দেখিয়া থাকি, উহার

গঠন প্রণালী প্রায় বর্ণালীর মত। বৃষ্টির প্রারম্ভে যে গুঁড়িগুঁড়ি জলকণা পড়ে, অথবা বৃষ্টির পরে যে সকল জলকণা আকাশে ভাসিয়া বেড়ায়, উহারা সূর্যালোক বিশ্লিষ্ট করিয়াই রামধনু রচনা করে। সূর্যরশ্মি জলকণাতে প্রবেশ করিয়া (নীচের চিত্র দেখ) বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিতে পৃথক হইয়া বিভিন্ন পথে প্রতিসরিত হয়। এই প্রতিসরিত বিভিন্ন বর্ণের রশ্মিগুলি ঐ জলকণার পিছন দিক হইতে প্রতিফলিত হইয়া আবার জলকণার মধ্য দিয়া বায়ুতে প্রতিসরিত হইয়া, বিভিন্ন দিকে পৃথক হইয়া চলে। অনেকগুলি জলকণার মধ্য দিয়া এইরূপ প্রতিসরিত রশ্মি যখন নীচের দিকে আসিয়া আমাদের চোখে পড়ে, তখন এই বিশ্লিষ্ট বর্ণগুলি রামধনুর আকারে আমরা দেখিতে পাই। সকাল বেলা যদি পশ্চিম আকাশে মেঘ হইয়া বৃষ্টি হয়, তবে পশ্চিম আকাশে রামধনু দেখা দেয়। আমরা সূর্যকে পিছনে রাখিয়া তাকাইলে উহা দেখিতে পাই। তেমনি বিকালের দিকে পূর্বাকাশে মেঘ হইয়া বৃষ্টি পড়িলে, পশ্চিম দিক হইতে সূর্যরশ্মি জলকণাতে পড়িয়া পূর্বদিকে রামধনু রচনা করে। এস্থলেও সূর্যকে আমাদের পিছনে রাখিয়া রামধনু দেখিতে হইবে। কৃত্রিমভাবেও রামধনু তৈয়ারি করা যায়। প্রাতে বা বিকালে সূর্য পিছন দিকে রাখিয়া মুখে জল নিয়া উপরের দিকে ছিটাইয়া দিলে দেখা যায়, ঐ সমস্ত বিক্ষিপ্ত জলকণায় সূর্যরশ্মি প্রবেশ করিয়া বিচিত্র বর্ণসমন্বয়ের অর্থাৎ রামধনুর সৃষ্টি করিয়াছে।
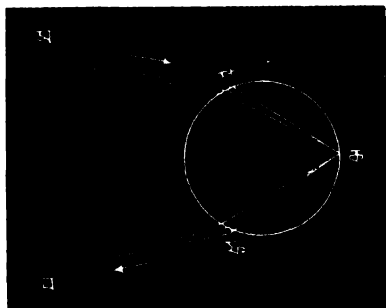
রামধনুর গঠনপ্রণালী

অস্বচ্ছ জিনিষের বর্ণ (Colour of Opaque Bodies)

সূর্যের আলো যখন লাল গোলাপের উপর পড়ে, তখন লাল রঙ বাদে সূর্যের বাকি সমস্ত রঙের আলো গোলাপের পাবড়ি শোষণ করে, শুধু লাল রঙের আলো ছাড়িয়া দেয়। ঐ রঙের আলো আমাদের চোখে পড়ে বলিয়া, আমরা গোলাপকে লাল বর্ণের দেখি। নীল কাপড় সূর্যের সমস্ত রঙের আলো শোষণ করে, কেবল নীল রঙের আলো ছাড়িয়া দেয়, তাই কাপড়খানি দেখিতে নীল হয়। গোলাপ ফুলটি সূর্যের আলোতে দেখি বলিয়াই উহা লাল। ঘরে সবুজ বর্ণের বাতির আলোর কাছে লাল গোলাপটি রাখিলে, গোলাপটি ঐ সবুজ আলো শোষণ করে, কোন আলো ছাড়িয়া দিবার কথাই উঠে না। কাজেই গোলাপটি দেখিতে কাল মনে হইবে। যে বস্তু কোন বর্ণের আলো বিকীর্ণ করিয়া দেয় না, সমস্ত বর্ণের আলোই শোষণ করিয়া রাখে, তাহারা দেখিতে কাল। সূর্যের সমস্ত বর্ণের আলো সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করে বলিয়া, সাদা কাগজ সাদা দেখায়। লাল গোলাপটি লাল আলোর মধ্যে রাখিলে, উহা অধিকতর উজ্জ্বল দেখায়। ঘাসের রঙ ও পাতার রঙ, সবুজ কেন এখন সহজে বুঝিতে পার। সাদা আলোর বিভিন্ন রঙিন রশ্মিগুলির কোন্ বর্ণের রশ্মি একটি অস্বচ্ছ জিনিষ ছাড়িয়া দিতে, প্রতিফলিত করিতে অথবা বিকীর্ণ করিতে পারে, তাহারই উপর ঐ জিনিষটির বর্ণ নির্ভর করে।

প্রশ্নমালা

(১) সূর্যের আলো সাতটি রঙের সমষ্টি। পরীক্ষা দ্বারা বুঝাও

(২) রামধনু গঠনের প্রণালী কি ?

(৩) গাছের পাতা সবুজ দেখায় কেন ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চুম্বক পাথর (Lode stone)

প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে চীনদেশে এক প্রকার পাথর পাওয়া যায়। ইহা লোহা আকর্ষণ করিতে পারে এবং সূতায় বাঁধিয়া ঝুলাইলে কয়েক-বার ইতস্তত দোল খাইয়া অবশেষে প্রায় উত্তর দক্ষিণমুখী হইয়া দাঁড়ায় এবং ইহার একটি নির্দিষ্ট প্রান্ত সর্বদা উত্তরদিকে এবং অপর প্রান্ত দক্ষিণদিকে থাকে। এই পাথরের নাম চুম্বক পাথর। ইহা স্থির অবস্থায় নির্দিষ্ট দিকে থাকে বলিয়া, নাবিকগণ দিক-নির্ণয়ের জন্য ইহা ব্যবহার করিতেন। এইজন্য ইহাকে দিক-নির্ণয় পাথরও বলা হইত। চুম্বক পাথর লৌহ ও অক্সিজেনযুক্ত যৌগিক পদার্থ। স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় বলিয়া, ইহা স্বাভাবিক চুম্বক নামে পরিচিত। এসিয়া-মাইনর, সুইডেন ও স্পেন প্রভৃতি স্থানের খনিতে চুম্বক-পাথর পাওয়া যায়।

একখানি চুম্বক পাথর লোহার গুঁড়ার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া তুলিয়া লইলে, দেখিবে পাথরের দুই প্রান্তে প্রচুর লোহার গুঁড়া লাগিয়া রহিয়াছে, মাঝখানে কোন গুঁড়াই লাগিয়া নাই। পরীক্ষাটি দ্বারা জানিলে, চুম্বক পাথর লোহা আকর্ষণ করে, কিন্তু এই আকর্ষণ শক্তি উহার দুই প্রান্তে সবচেয়ে বেশি (পাশের চিত্র দেখ)। মধ্যবর্তীস্থানে আকর্ষণ শক্তি ক্রমেই কম এবং ঠিক মাঝখানে এই শক্তি একটুও নাই। পাক না থাকে এরূপ সূতায় বাঁধিয়া চুম্বক পাথরখানি ঝুলাও এবং
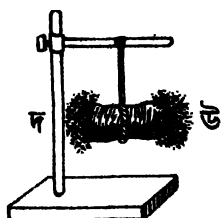
চুম্বক পাথরের পরীক্ষা

উহাকে পূর্ব-পশ্চিম-মুখী করিয়া রাখ। দেখ, পাথরখানি কয়েকবার এদিক ওদিক দুলিয়া প্রায় উত্তর-দক্ষিণমুখী হইয়া দাঁড়াইল এবং একটি নির্দিষ্ট প্রান্ত উত্তরদিকে এবং অপর প্রান্ত দক্ষিণদিকে অবস্থান করিল। চুম্বক পাথরের যে প্রান্ত উত্তরদিকে থাকে, উহাকে উত্তর মেরু (সংক্ষেপে "উ" মেরু) এবং যে প্রান্ত দক্ষিণ দিকে থাকে, উহাকে দক্ষিণমেরু (সংক্ষেপে "দ" মেরু) বলা হয়। মেরু দুইটি যোগ করিয়া যে রেখা কল্পিত হয়, উহাকে চুম্বকের মেরুদণ্ড (axis) বলে।

যে পদার্থে চুম্বক পদার্থের দুইটি গুণ বর্তমান, তাহাকে চুম্বক বলে। লোহা, ইস্পাত, নিকেল প্রভৃতি পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং ইহাদিগকে চুম্বকে পরিণত করা যায়। কাঠ, কাগজ, কাচ, দস্তা, তামা প্রভৃতি অধিকাংশ দ্রব্য চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। উহাদিগকে চুম্বকে পরিণত করাও যায় না। কিন্তু চুম্বক পাথর ও লোহার মাঝখানে কাচ, কাগজ ইত্যাদির কোন একটি রাখিলেও, লোহাকে চুম্বক টানিবে।

লৌহ ও ইস্পাতকে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা চুম্বকে পরিণত করা যায়। সেই চুম্বককে কৃত্রিম চুম্বক বলে। কৃত্রিম চুম্বক সাধারণত তিন রকমের দেখা যায়, যথা (১) ঘোড়ার ক্ষুরের আকারের (horse shoe), (২) দণ্ডের (bar) আকারের, এবং (৩) শলাকার (needle) আকারের। একটি চুম্বক দণ্ড লোহার গুঁড়ায় ডুবাইয়া এবং সূতায় ঝুলাইয়া
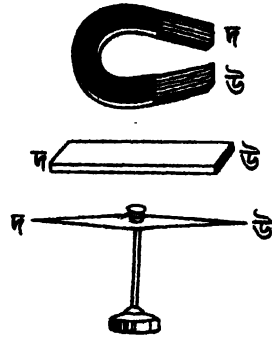
কৃত্রিম চুম্বকের বিভিন্ন আকার

পরীক্ষা করিলে দেখিবে, ইহা চুম্বক পাথরের মতই আচরণ করে। চুম্বক পাথর যে আকারের পাওয়া যায়, উহা ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক

নহে, আর উহার চুম্বক শক্তিও ক্ষীণ। এইজন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কৃত্রিম চুম্বকের সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে।

চুম্বকন (Magnetisation)

নরম লোহা ও ইস্পাতকে ভাল চুম্বকে পরিণত করা যায়। নিকেল ও কোবাল্ট নামক দুইটি ধাতুকেও চুম্বক করা চলে, কিন্তু উহাদের চুম্বকশক্তি খুব কম হয়। নরম লোহা ও ইস্পাতের মধ্যে আবার নরম লোহাকে তাড়াতাড়ি চুম্বকে পরিণত করা যায়, কিন্তু উহার চুম্বকত্ব বেশি দিন থাকে না। ইস্পাতকে চুম্বক করিলে, উহার চুম্বকশক্তি দীর্ঘকাল
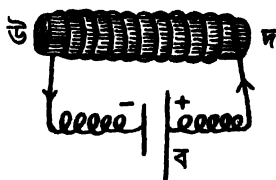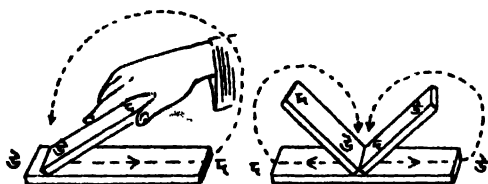
চুম্বকনের বিভিন্ন প্রণালী

থাকে। এইজন্য স্থায়ী চুম্বক তৈয়ারির জন্য ইস্পাতই উপযুক্ত। নিম্নে চুম্বক তৈয়ারির কয়েকটি প্রণালী বলা হইল।

(১) একটী ইস্পাতের দণ্ড (bar) টেবিলের উপর রাখ। একটি চুম্বক দণ্ডের যে কোন মেরু (ধর "উ" মেরু) ইস্পাত দণ্ডের বাম প্রান্ত

হইতে ডান প্রান্ত পর্যন্ত ঘষিয়া টানিয়া যাও। ইস্পাতটির ডান প্রান্তে পৌঁছিবার পর চুম্বকদণ্ড তুলিয়া লও এবং ঐ চুম্বকদণ্ডের উত্তর মেরু পুনরায় বাম প্রান্তে রাখিয়া পূর্ব্ববৎ ডান প্রান্তে ঘষিয়া লও। এইরূপ ইস্পাতদণ্ডের দুই পিঠে বরাবর বাম হইতে ডান দিকে কয়েকবার ঘষিয়া দিলে, উহা চুম্বক হইয়া যাইবে।

(২) দুইটি সমশক্তি সম্পন্ন চুম্বকের বিপরীত মেরু দুইটি চিত্রের অনুরূপভাবে (৮০ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় চিত্র) সংলগ্ন রাখিয়া, ইস্পাতদণ্ডের মাঝখানে রাখ। এখন ইস্পাতের উপর রাখিয়া ঐ মেরু দুইটিকে বিপরীত দিকে ঘষিয়া লইয়া যাও এবং দুই প্রান্তে পৌঁছিবার পর আবার উহাদিগকে তুলিয়া পূর্ব্ববৎ মাঝখানে বসাইয়া একইভাবে ঘষিয়া যাও। এইরূপ কয়েকবার করিলেই ইস্পাতখানি চুম্বক হইয়া দাঁড়াইবে।

উপরি কথিত প্রণালীতে বেশি শক্তির চুম্বক পাওয়া যায় না। স্থায়ী শক্তিমান চুম্বক তৈয়ারি করার জন্য বিদ্যুতের সাহায্য লইতে হয় একটি ইস্পাতদণ্ডের (৮০ পৃষ্ঠার তৃতীয় চিত্র) চারিদিকে সুতা বা রেশম-আবৃত সরু তামার তারের পাক জড়াইয়া, ঐ তারে কিছুক্ষণ তড়িৎ-প্রবাহ চালাইলে ইস্পাতদণ্ডটি শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়।
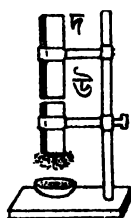
উপরের চুম্বকের প্রভাবে নীচেকার লোহা অস্থায়ী চুম্বক হইয়া দাঁড়াইল

কোন চুম্বকের সংস্পর্শে বা নিকটে একখণ্ড ইস্পাত বা লোহা রাখিলে ঐ ইস্পাত বা লোহা চুম্বকে পরিণত হয়, কিন্তু চুম্বকটি সরাইয়া লইলে উহাদের চুম্বকত্ব অন্তর্হিত হয়। উপরের চিত্রে চুম্বকখানি উপরে থাকাতে নীচেকার লৌহদণ্ড চুম্বকের মত লোহার গুঁড়া আকর্ষণ করিতেছে। উপরের চুম্বক সরাইয়া লইলে লোহার গুঁড়া পড়িয়া যাইবে।

হাতুড়ি দিয়া পিটাইলে ও আছাড় মারিলে, চুম্বকের শক্তি কমিয়া যায়। আগুনে পোড়াইয়া লাল করিলে, ঐ শক্তি সম্পূর্ণ চলিয়া যায়। একটি চুম্বককে ২।৩ খণ্ড করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে, ইহাদের প্রত্যেক খণ্ড একটি স্বতন্ত্র চুম্বক হইয়াছে এবং প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া মেরু আছে। চুম্বককে যত ভাগেই খণ্ড কর না কেন, প্রত্যেক খণ্ডই স্বতন্ত্র চুম্বক হইয়া দাঁড়াইবে।
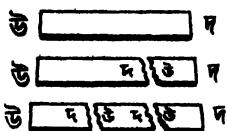
প্রত্যেকটি খণ্ড একটি স্বতন্ত্র চুম্বক

চুম্বকমেরুর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ
(Magnetic Attraction and Repulsion)

নীচের চিত্রের অনুরূপ একটি চুম্বকশলাকা খাড়া (vertical) কীলকের (pivot) উপর রাখ। চুম্বকটি কীলকের উপর দাঁড়াইয়া ইতস্তত ঘুরিতে থাকে এবং স্থতায় ঝুলানো চুম্বকের মতই স্থির অবস্থায় উত্তর-দক্ষিণমুখী হইয়া দাঁড়ায়। চুম্বক শলাকাটির স্থির অবস্থায় উহার উত্তর মেরুর কাছে দ্বিতীয় একটি চুম্বকের দক্ষিণ মেরু রাখ। দেখিবে আকর্ষণের জন্য চুম্বকশলাকার উত্তর মেরু দ্বিতীয় চুম্বকের দক্ষিণ মেরুর দিকে চলিয়া আসিল।
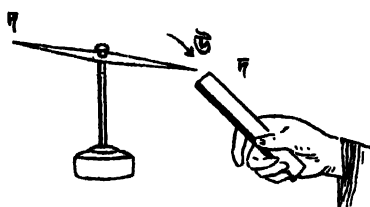
বিপরীত দুইটি চুম্বকমেরুর আকর্ষণ

এইবার চুম্বকশলাকার উত্তর মেরুর কাছে দ্বিতীয় চুম্বকের উত্তর মেরু আন (পরের পৃষ্ঠার চিত্র)। দেখিবে, উহাদের মধ্যে বিকর্ষণ হওয়াতে, চুম্বক-শলাকাটি দ্বিতীয় চুম্বকের কাছ হইতে সরিয়া গেল। দ্বিতীয় চুম্বকের দক্ষিণ মেরু পর পর চুম্বকশলাকার দক্ষিণ ও উত্তর মেরুর কাছে রাখিলে,

দেখিবে প্রথম ক্ষেত্রে বিকর্ষণ ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আকর্ষণ হইয়াছে। কাজেই দেখা গেল চুম্বকের দুইটি সদৃশ মেরু পরস্পর বিকর্ষণ করে, দুইটি বিপরীত মেরু পরস্পর আকর্ষণ করে। পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পার দুইটি সদৃশ মেরুর ভিতর বিকর্ষণ মাত্রা এবং দুইটি বিপরীত মেরুর আকর্ষণ মাত্রা, উহাদের ব্যবধানের উপরে নির্ভর করে। ব্যবধান বেশি হইলে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কম হয়। ব্যবধান যত কম, উহাদের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ তত বেশি হইবে।

সদৃশ দুইটি চুম্বকমেরুর বিকর্ষণ
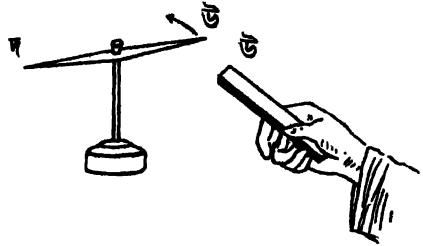
ভু-চুম্বকত্ব (Terrestrial Magnetism)

কীলকের উপর স্থাপিত চুম্বকশলাকা অথবা সুতায় ঝুলানো চুম্বক হেলিয়া দুলিয়া স্থির অবস্থায় উত্তর-দক্ষিণমুখী হইয়া থাকে তোমরা জান। পণ্ডিতেরা ইহার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিলেন, পৃথিবী নিজেই একটা বিরাট চুম্বক। ঝুলানো চুম্বকের যে মেরু উত্তরমুখী থাকে, সেই মেরুর বিপরীত গুণসম্পন্ন (অর্থাৎ সাধারণ চুম্বকের দক্ষিণ মেরু-সদৃশ) মেরু পৃথিবীর উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। তেমনি ঝুলানো চুম্বকের যে মেরু দক্ষিণমুখী থাকে, সেই মেরুর বিপরীত গুণসম্পন্ন (অর্থাৎ সাধারণ চুম্বকের উত্তর মেরু-সদৃশ) মেরু পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। কাজেই ঝুলানো অবস্থায় চুম্বকের দক্ষিণ ও উত্তর মেরু যথাক্রমে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলিয়া, চুম্বকটি অন্য কোন দিক অবলম্বন না করিয়া উত্তর-দক্ষিণমুখী হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর উত্তর ও

দক্ষিণ প্রান্তের চুম্বক-মেরুকে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া, কীলকাশ্রিত বা যে কোন সাধারণ কৃত্রিম চুম্বকের উত্তর মেরুকে উত্তর-সন্ধানী বা প্রকৃত দক্ষিণ মেরু এবং দক্ষিণ মেরুকে দক্ষিণ-সন্ধানী বা প্রকৃত উত্তর মেরু বলিয়া ধরা হইয়া থাকে।

কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্র (Compass)

সূতায় ঝুলানো বা কীলকাশ্রিত চুম্বক সর্বদা উত্তর দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে বলিয়া, ইহা নাবিকদের বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্র এবং ইহাকে দিকনির্ণয় যন্ত্র বা কম্পাস বলা হয়। কম্পাস দুই প্রকারের হয় যথা :—(১) পকেট কম্পাস, (২) জাহাজের কম্পাস।

পকেট কম্পাসে ছোট একটি পিতলের গোল বাক্সের মাঝখানে একটি ছোট চুম্বকশলাকাকে পিনের উপর রাখা হয়। চুম্বকশলাকাটি ঝুলানো চুম্বকের মত নড়াচড়া করিতে পারে। চুম্বকশলাকার নীচে বাক্সটির তলায় একখানি মোটা গোল কাগজের উপর একটি বৃত্ত আঁকা থাকে ; ঐ বৃত্তের পরিধিকে সমান বত্রিশ ভাগে ভাগ করিয়া উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম এবং অন্যান্য দিকগুলির নাম সংক্ষেপে লেখা হয়। চুম্বকশলাকাটি বাহিরের বাতাসে না দোলে, সেজন্য বাক্সের উপরিভাগ কাচ দিয়া ঢাকা থাকে।

জাহাজের কম্পাসে একটি গোল পিতলের বাটির মাঝখানে একটি কীলকের উপর একটি চুম্বকদণ্ড বসানো আছে। চুম্বকদণ্ডটিকে ব্যাস করিয়া একখানি গোল পুরু-কাগজ উহার উপরেই লাগানো থাকে। কাগজে একটি বৃত্ত আঁকা এবং উহার পরিধি সমান বত্রিশ ভাগে বিভক্ত করিয়া উহার উপর দাগ কাটা থাকে। কাগজের নীচে আছে বলিয়া চুম্বকের কোন অংশই দেখা যায় না। এইজন্য চুম্বকের প্রান্ত দুইটির

ঠিক উপরেই কাগজের উপর "উ", "দ" (উত্তর ও দক্ষিণ মেরু জ্ঞাপক) অক্ষর অঙ্কিত থাকে। কাগজের উপর উত্তর দক্ষিণ দিক নির্দিষ্ট থাকায়, কাগজের উপর অঙ্কিত দাগগুলি অন্যান্য দিকও নির্দেশ করিতে পারে। সমস্ত যন্ত্রটি কাচ দিয়া ঢাকা এবং উহাকে একটি বাক্সের মধ্যে রাখা হয়।

এই কম্পাস জাহাজে ব্যবহৃত হয়। সমুদ্রে ঢেউ হইলে জাহাজ নাচিতে থাকে, কাজেই কম্পাসের চুম্বকও এদিক ওদিক কাত হয় বলিয়া দিকনির্ণয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। সমুদ্রের ঢেউ থাকা সত্ত্বেও চুম্বকশলাকা কাত না হয়, এজন্য একটি বিশেষ কল-কৌশলের সাহায্য লওয়া হয়। চিত্রে দেখ, কম্পাসের বাটিটি বাহিরের একটি
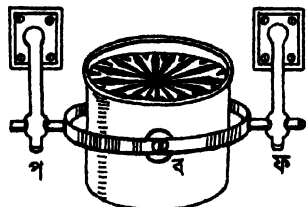
জাহাজের কম্পাস

গোলাকার বড় ধাতুর আঙটির "ব" ও "ভ" এই দুইটি বিপরীত বিন্দুতে আলগাভাবে সংলগ্ন আছে। এই আঙটিটির বিপরীত দিকে সংলগ্ন দুইটি দণ্ড জাহাজের সঙ্গে যুক্ত দুইটি খাড়া দণ্ডের সহিত আবার "প" ও "ফ" স্থানে আলগাভাবে যুক্ত আছে। "বভ" এবং "পফ" সংযোজক রেখা দুইটি লম্বভাবে পরস্পরকে কাটাকাটি করিবে। অর্থাৎ "পফ" উত্তর-দক্ষিণমুখী হইলে "বভ" পূর্ব-পশ্চিমমুখী হইবে। "বভ" রেখার চতুর্দিকে কম্পাসের বাটিটি ঘুরিতে পারে। আবার বাটিসমেত বাহিরের বড় আঙটিটি "পফ" রেখার চতুর্দিকে ঘুরিতে পারে। এই ব্যবস্থার জন্য সমস্ত অবস্থাতেই কম্পাসের বাটি সোজা থাকে, কাজেই উহার চুম্বকখানিও ভূ-সমান্তরাল হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারে। সমুদ্রের অজ্ঞাতস্থানে যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় সূর্য বা নক্ষত্রাদি দেখা যায় না, তখন এই যন্ত্রটির দিকে লক্ষ্য করিয়া উত্তর দক্ষিণ দিক জানা যায় এবং উত্তর দক্ষিণ দিক জানা গেলে অন্যান্য দিকও সহজেই বাহির হইয়া পড়ে।

প্রশ্নমালা

(১) একটি ধাতুর দণ্ড চুম্বক কি না, কিরূপে জানিবে ?

(২) চুম্বক কয় প্রকারে তৈয়ারি করা যায় ? চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু কাহাকে বলে ? চুম্বকত্ব কিসে নষ্ট হয় ?

(৩) কৃত্রিম চুম্বক কয় প্রকার ? একটি চুম্বককে ভাঙ্গিয়া দুই খণ্ড করিলে, প্রত্যেক খণ্ড কিরূপ আচরণ করে ?

(৪) দুইটি চুম্বকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের নিয়ম কি ?

(৫) পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক, কিরূপে প্রমাণ করিবে ?

(৬) জাহাজের কম্পাস বর্ণনা কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

তড়িৎ (Electricity)

তড়িৎ একটি শক্তি বিশেষ। তড়িৎ সাধারণত দুই প্রকারের হয়, যথা স্থির-তড়িৎ (Statical Electricity) এবং চল-তড়িৎ (Current Electricity)। বিশেষ বিশেষ জিনিষের ঘর্ষণে স্থির-তড়িৎ উৎপন্ন হয় বলিয়া, ইহার অপর নাম ঘর্ষ-তড়িৎ (Frictional Electricity)। শুকনা চুলে মোমবাতি ঘষিলে এই প্রকার তড়িৎ উৎপন্ন হয়, ঐ তড়িতের ফলে উহা কাগজের টুকরা আকর্ষণ করে। স্থির বা ঘর্ষ-তড়িৎ আমাদের বিশেষ ব্যবহারে আসে না। চল-তড়িৎকে তারের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা যায়। বড় বড় সহরে তেল বা বাষ্পীয় কলদ্বারা চালিত ডাইনামো নামক যন্ত্র হইতে খুব বেশি শক্তির তড়িৎপ্রবাহ প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারি করা হয় এবং উহার সাহায্যে বাতি জ্বালান, ট্রামগাড়ী চালান, পাখা প্রভৃতি

যন্ত্রাদি চালান ছাড়া, আরও অনেক কাজ নিষ্পন্ন হইতেছে। ক্ষীণশক্তির তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করার যন্ত্র সহজেই নির্মাণ করা যায়। এই যন্ত্রকে তড়িৎসেল (Electric Cell) বলা হয়।

নীচের ছবিতে একটি সরল তড়িৎসেল (স) দেখান হইয়াছে। ইহাতে একটি কাচপাত্রে জলমিশানো সালফিউরিক এসিড আছে। এসিডের মধ্যে একখানি তামার পাত "ত" এবং একখানি দস্তার পাত "দ" পাশাপাশি অল্প ব্যবধানে ডুবানো আছে। এইভাবে সমস্ত জিনিষটি রাখিয়া দিলে, কিছুই দেখা যায় না, কোন রাসায়নিক ক্রিয়াও হয় না। কিন্তু পাত দুইখানির উপরিভাগ ধাতুর তারের সাহায্যে যুক্ত করিলে, রাসায়নিক ক্রিয়া সুরু হয়, তড়িৎপ্রবাহও চলিতে আরম্ভ করে। তারের সংযোগ কাটিয়া দিলে, তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। দস্তার উপর এসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ার দরুণ যে শক্তি ব্যয়িত হয়, উহাই তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া তারে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এসিডের রাসায়নিক ক্রিয়ায় দস্তা একেবারে ক্ষয় হইলে, তড়িৎসেল হইতে আর তড়িৎপ্রবাহ হয় না। সরল তড়িৎ সেলের কতকগুলি ত্রুটি দূর করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বিভিন্ন তড়িৎসেলের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ডেনিয়েল, বুনসেন, ও লেক্লাঞ্চি তড়িৎসেল উল্লেখযোগ্য।
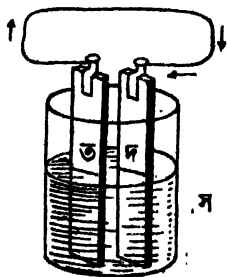
সরল তড়িৎসেল

পূর্বোক্ত সরল তড়িৎসেলের দুইটি ধাতুর পাতের উপরিভাগকে তড়িৎদ্বার বলে। এই তড়িৎদ্বার দুইটি তার দ্বারা যুক্ত করিলে, তড়িৎপ্রবাহ চক্রাকারে সম্পন্ন হয়। এসিডের মধ্য দিয়া প্রবাহ, দস্তা হইতে তামার দিকে এবং বাহিরে সংযোগ-তারের মধ্য দিয়া, তামা হইতে দস্তার দিকে আসিয়া আবার সেলে প্রবেশ করে। তড়িতের এই সম্পূর্ণ চলার পথকে

তড়িৎ-বর্তনী (circuit) বলা হয়। তড়িৎ-বর্তনীতে ফাঁক থাকিলে প্রবাহ বন্ধ হয়। তামার পাতের উপরিভাগকে পজিটিভ (+) মেরু এবং দস্তার পাতের উপর অংশকে নেগেটিভ (−) মেরু বলা হয়। একটি সেলের নেগেটিভ মেরু অপর একটি সেলের পজিটিভ মেরুর সঙ্গে যুক্ত কর। এইরূপ চার পাঁচটি সেল পর পর যুক্ত করিলে, একটি ব্যাটারি তৈয়ারি হয়। ব্যাটারি হইতে অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তির তড়িৎপ্রবাহ পাওয়া যায়।

তড়িৎ পরিবাহী ও অপরিবাহী
(Conductor and Insulator)

তড়িৎসেলের দুইটি মেরু সূতা দ্বারা যুক্ত করিয়া পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায়, কোন তড়িৎপ্রবাহ হইতেছে না। বিভিন্ন ধাতুর তার দ্বারা যুক্ত করিলে, তড়িৎপ্রবাহ বেশ চলে। ধাতব পদার্থ, ভূপৃষ্ঠ, অম্ল ও লবণাক্ত জল এবং মনুষ্যদেহ প্রভৃতি তড়িতের পরিবাহী (conductor) অর্থাৎ ইহাদের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চলিতে পারে। সূতা, রেশম, কাঠ, কাচ ও রবার ইত্যাদির মধ্য দিয়া প্রবাহ চলে না—ইহারা তড়িতের অপরিবাহী (insulator)। তড়িতের অপরিবাহী জিনিষও আমাদের কাজে আসে। মিস্ত্রিরা কাঠের নির্মিত চেয়ার, বা বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া বিদ্যুতের লাইন বা উহার অন্তর্ভুক্ত সুইচ বা অন্য যন্ত্রাদি নিরাপদে মেরামত করে। মাটির উপর দাঁড়াইয়া ঐ সমস্ত কাজ করিলে, তড়িৎপ্রবাহ শরীরের মধ্য দিয়া মাটিতে চলিয়া যায়, শরীরে প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। খুব বেশি শক্তির প্রবাহ হইলে মারাত্মক বিপদও ঘটিয়া থাকে। বৈদ্যুতিক কারখানায় মিস্ত্রিরা সেইজন্য রবারের জুতা ব্যবহার করে। অপরিবাহী পদার্থ যেমন সূতা, রেশম অথবা রবার দ্বারা ধাতুর তার আবৃত করিয়া, ঐ তার বৈদ্যুতিক সংযোগ-তার হিসাবে এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয় কেন, এখন বুঝিতে পার।

তড়িৎপ্রবাহের ক্রিয়া (Effect of Current)

তাপের ক্রিয়া (Heating Effect)

পরিবাহী কোন তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চলিলে তারটি বেশ গরম হয়। ব্যাটারি হইতে তড়িৎপ্রবাহ চালিত হইলে, ঐ তার এত গরম হয় যে হাত দিয়া ধরা যায় না। তারটি কোন কাচপাত্রস্থিত তেল বা জলের মধ্যে (পাশের চিত্র) রাখিয়া, উহার দুই প্রান্ত তড়িৎসেলের "কখ" মেরুদ্বয়ের সহিত যুক্ত করিয়া প্রবাহ চালাইলে, ঐ সমস্ত পদার্থও বেশ গরম হইয়া পড়ে। তড়িতের এই ধর্ম লইয়া বৈদ্যুতিক কেতলি, চুলা ও ইস্ত্রি প্রভৃতি যন্ত্র নির্মিত হয়। এই সমস্ত যন্ত্রে আবরণশূন্য এমন এক প্রকার ধাতুর তার, কুণ্ডলীর আকারে রাখা হয়, যাহা তড়িৎপ্রবাহে উত্তপ্ত হইয়া উঠে। বেশি শক্তির তড়িৎ-প্রবাহ ছাড়া পূর্বোক্ত যন্ত্রগুলি অবশ্য ব্যবহার করা যায় না।
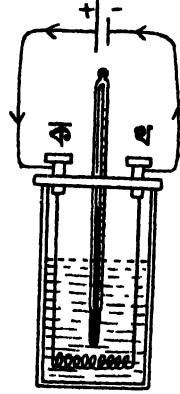
তড়িৎপ্রবাহের ফলে জল গরম হইতেছে
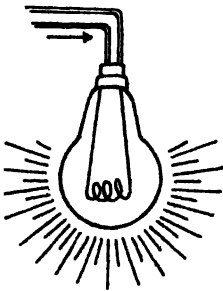
খুব সরু ধাতুর তারের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চালাইলে, উহা উত্তপ্ত হইয়া পড়ে এবং শেষে ঐ উত্তপ্ত তার হইতে আলো বিকীর্ণ হইতে থাকে। অধিক উত্তপ্ত ধাতুর তার বায়ুর সংস্পর্শে তাড়াতাড়ি পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হয় বলিয়া, বৈদ্যুতিক আলোতে সূক্ষ্ম তারটি বায়ুশূন্য একটি কাচপাত্রের (bulb) মধ্যে সংস্থাপন করা হয়। ব্যাটারি দ্বারা বৈদ্যুতিক আলো জ্বালান যায়, কিন্তু উহার খরচ খুব বেশি। দু' তিনটি শুকনা লেক্লান্সি সেল দ্বারা টর্চের বাতি আমরা জ্বালাইয়া থাকি।

বৈদ্যুতিক আলো

রাসায়নিক ক্রিয়া (Chemical Effect)

অনেক তরল পদার্থের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চলে, অনেক তরল পদার্থের মধ্যে চলে না। পারদ সুপরিবাহী; তেল এবং বিশুদ্ধ পাতিত জল (Distilled water) তড়িতের অপরিবাহী। কিন্তু লবণ বা এসিড মিশানো জলের মধ্যে তড়িৎ বেশ চলিতে পারে। তড়িৎপ্রবাহ চলিতে পারে সত্য, কিন্তু উহার প্রভাবে জল উহার দুইটি উপাদানে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়। পাশের চিত্রে তড়িৎপ্রভাবে জলের বিশ্লেষণ দেখান হইয়াছে। জলের উপাদান অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস, দুইটি উপুড় করা কাচনলের (খ, ক) মধ্যস্থ জল সরাইয়া উহাদের উপরিভাগে জমিয়াছে। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা ইহাদের অস্তিত্ব ধরা যায়।
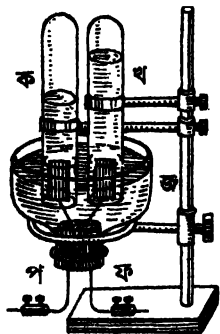
জল বিশ্লিষ্ট হইতেছে

তড়িৎপ্রবাহের ফলে অনেক দ্রাবণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঘটে। একটি কাচপাত্রে তুঁতের জল রাখিয়া উহার মধ্যে একখণ্ড তামার ফলক ও একটি পুরাতন পয়সা পাশাপাশি (পাশের চিত্র) একটু ব্যবধানে রাখ। এখন ব্যাটারির পজিটিভ মেরুর সঙ্গে তামার ফলকটি এবং নেগেটিভ মেরুর সঙ্গে পয়সাটি তার দিয়া যোগ করিলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সুরু হইবে। ফলে তুঁতে বিশ্লিষ্ট হয় এবং উহার একটি উপাদান "তামা" ঐ পয়সার উপর জমিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে পয়সার উপর একটি সুন্দর তামার আবরণ পড়ে।
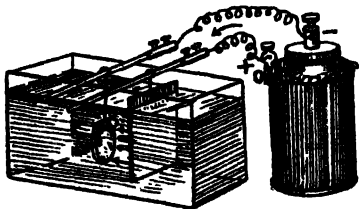
পয়সার উপর তামার আবরণ পড়িতেছে

এই রকমে ধাতব বস্তুর উপর সোনা, রূপা, তামা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুর স্থায়ী আবরণ দেওয়া সম্ভব হয়। তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে এলুমিনিয়াম, তামা প্রভৃতি ধাতুকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

তড়িৎপ্রবাহ ও চুম্বকধর্ম (Magnetic Property)

নীচের চিত্রে একটি চুম্বকশলাকা কীলকের উপর দাঁড়ানো আছে। উহার ঠিক উপরে উহার সমান্তরাল একটি ধাতুর শলাকা "কখ" একটি কাটামোর সঙ্গে সংলগ্ন। শলাকার দুই প্রান্ত সরল তড়িৎসেলের দুই মেরুর সহিত যোগ করিলে, তড়িৎ-বর্তনী সম্পূর্ণ হইবে এবং তড়িৎ প্রবাহও সুরু হইবে। দেখ, তড়িৎপ্রবাহের জন্য চুম্বকশলাকাটি একদিকে ঘুরিয়া যায়; তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করিলে, উহা আবার উত্তর-দক্ষিণমুখী হইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায়। তড়িৎপ্রবাহ তীব্র হইলে, চুম্বকশলাকাও বেশি ঘুরে। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, কোন পরিবাহী তারের ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চলিলে, উহার চতুর্দিকে চুম্বক ধর্ম সঞ্চারিত হয়। তড়িৎ-প্রবাহ ডান দিক হইতে বাম দিকে চলিলে, চুম্বকশলাকার উত্তর মেরু একটি নির্দিষ্ট দিকে ঘুরিয়া যাইবে। তড়িৎপ্রবাহ বাম দিক হইতে ডান দিকে চলিলে, উহার বিপরীত দিকে উত্তর মেরু ঘুরিয়া যাইবে। তড়িৎ-বাহী তারের চারিদিকে যে চুম্বক ধর্মের সঞ্চার হয়, উহার সাহায্যে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিফোন, টেলি-গ্রাফ, ট্রামগাড়ি প্রভৃতি চালিত
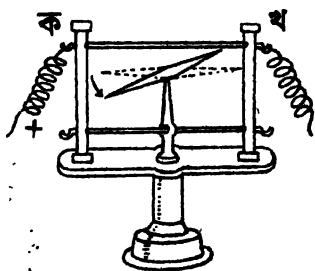
তড়িৎপ্রবাহের ফলে চুম্বকশলাকা ঘুরিয়া গেল

একটি তড়িৎসেলের দুইটি

মেরু তার দ্বারা যুক্ত করিয়া, ঐ তারের খানিকটা সোজা করিয়া একটি চুম্বকশলাকার উপর ধর। চুম্বকশলাকাটি যদি কোন দিকে না ঘোরে, তাহা হইলে বুঝিবে তড়িৎসেলটি খারাপ ; উহা হইতে কোন প্রবাহ চলিতেছে না।

তড়িৎচুম্বক (Electromagnet)

পূর্বে দেখিয়াছ, ইস্পাতদণ্ডের চতুর্দিকে সুতার আবরণযুক্ত পরিবাহী তারের কুণ্ডলী জড়াইয়া ঐ তারে কিছুক্ষণ তড়িৎপ্রবাহ চালাইলে, উহা স্থায়ী শক্তিমান চুম্বক হইয়া দাঁড়ায়। ইস্পাতের পরিবর্তে নরম লোহার দণ্ড ব্যবহার করিলে, উহা স্থায়ী চুম্বক হয় না। যতক্ষণ তারে তড়িৎপ্রবাহ থাকে, ততক্ষণ উহা শক্তিশালী চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে। তড়িৎপ্রবাহ সরাইয়া লওয়া মাত্র, উহার চুম্বকত্ব চলিয়া যায়। নরম লোহার চতুর্দিকে এইরূপ তড়িৎ-প্রবাহ দ্বারা যে অস্থায়ী চুম্বক পাওয়া যায়, উহার নাম তড়িৎচুম্বক। তড়িৎ-চুম্বক নির্মাণে নরম লোহার দণ্ডটি ঘোড়ার ক্ষুর অথবা ইংরেজি 'ইউ'র মত বাঁকানো লওয়া হয়। ইহাতে দুইটি মেরু একই দিকে থাকিয়া লোহাকে আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া, তড়িৎচুম্বকটি অধিক শক্তিশালী হয়।
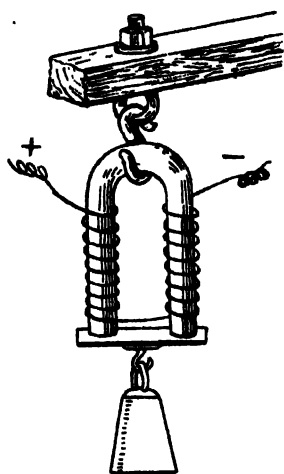
তড়িৎচুম্বক

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (Electric Bell)

কাহাকেও ডাকিবার প্রয়োজন হইলে, আফিসে বা অনেক বাড়ীতে বৈদ্যুতিক ঘণ্টার সাহায্যে ডাকা হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক ঘণ্টার

প্রধান অবলম্বন তড়িৎচুম্বক। নীচে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার ছবি দেখ। কাঠের উপর আটকানো "ব" একটি তড়িৎচুম্বক; ইহার সামনে স্প্রিং (চ) যুক্ত একটি লোহার পাত (ল) আছে। লোহার পাতের সঙ্গে একটি দণ্ড এবং ঐ দণ্ডের শেষভাগে একটি হাতুড়ি (হ)। হাতুড়িটি নিকটস্থ ঘণ্টা বা বাটির (ঘ) উপর আঘাত করিলে, উহা টং টং শব্দে বাজে। তড়িৎচুম্বকের তারের একটি প্রান্ত "ক" ইস্ক্রুপের সহিত সংযুক্ত, অপর প্রান্ত স্প্রিংএর সহিত "স" বিন্দুতে সংযুক্ত। সাধারণ অবস্থায় স্প্রিংটি নীচের "ম" ইস্ক্রুপকে স্পর্শ করিয়া থাকে। এই ইস্ক্রুপটি উপরের "খ" ইস্ক্রুপের সহিত তার দ্বারা যুক্ত আছে। এখন "ক" ইস্ক্রুপের সঙ্গে তড়িৎসেলের পজিটিভ মেরু এবং উপরের "খ" ইস্ক্রুপের সহিত নেগেটিভ মেরু যোগ কর। এইরূপ করিলে তড়িৎপ্রবাহ পজিটিভ মেরু হইতে "ক" ইস্ক্রুপের ভিতর দিয়া সংযোগ-তার দিয়া তড়িৎচুম্বকের তার-

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা
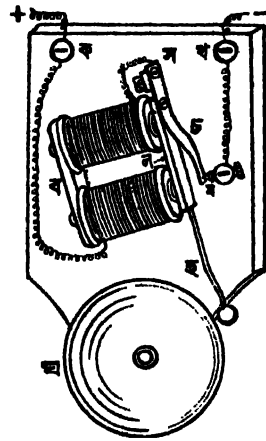
কুণ্ডলী ভ্রমণ করিয়া "স" বিন্দুতে আসিবে। তারপর ঐ প্রবাহ স্প্রিং ও লোহার পাত এই পথ ধরিয়া নীচের "ম" ইস্ক্রুপের মধ্য দিয়া সংযোগ-তার হইয়া উপরের "খ" ইস্ক্রুপে যায় এবং পুনরায় নেগেটিভ মেরু দিয়া তড়িৎ-সেলে প্রবেশ করে। এইরূপ তড়িৎপ্রবাহের ফলে, তড়িৎচুম্বকের নরম লোহা চুম্বক হয় এবং সামনের লৌহপাত টানিয়া আকর্ষণ করে; সেই সঙ্গে হাতুড়িটি ঘণ্টার উপর আঘাত করিয়া শব্দের সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সময় লৌহপাতের সংলগ্ন স্প্রিং ও নীচেকার "ম" ইস্ক্রুপের সংযোগ কাটিয়া

যায়; সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎপ্রবাহও বন্ধ হয়। ফলে তড়িৎচুম্বক চুম্বকত্ব হারাইয়া, লৌহপাত আর টানিতে পারে না। স্প্রিং-এর জোরে উহা স্বস্থানে আসিয়া নীচেকার "ম" ইস্ক্রুপ স্পর্শ করে। তড়িৎবর্তনী আবার সম্পূর্ণ হওয়ায়, তড়িৎপ্রবাহ সুরু হয়; পূর্ববৎ লৌহপাতটি তড়িৎচুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াতে, হাতুড়িটি ঘণ্টার উপর ঘা মারিয়া আবার শব্দের সৃষ্টি করে। এইরকম বারবার আঘাত পাইয়া ঘণ্টা টং টং বাজিতে থাকে। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থায় ঘণ্টার শব্দ অবিরাম চলিবে। এইজন্য তড়িৎবর্তনীর মাঝে কোথায়ও ফাঁক রাখা হয় এবং ফাঁকের সঙ্গে একটি বৈদ্যুতিক সুইচ্ যুক্ত করা হয়। সুইচ্ টিপিলে তড়িৎবর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং তড়িৎ-প্রবাহও চলে, সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টারও শব্দ হয়। সুইচ্ অল্পক্ষণ টিপিলে শব্দও অল্পক্ষণের জন্য হইবে। টর্চে ব্যবহার করা হয়, এরূপ তিন চারিটি শুকনা তড়িৎসেল দ্বারা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজান সম্ভব হইয়া থাকে।

টেলিগ্রাফ (Telegraph)

খুব দূরে টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণের জন্য, অনেক যন্ত্র-ব্যবস্থার দরকার হয়। এখানে টেলিগ্রাফের মূল তথ্য সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু বলা হইবে। টেলিগ্রাফের বিশিষ্ট অংশ হইল তড়িৎচুম্বক। "ক" স্থান হইতে "খ" স্থানে সংবাদ পাঠাইতে হইলে কি ব্যবস্থা করা হয়, পর পৃষ্ঠার চিত্রে দেখান হইয়াছে। "ক" স্থানে ব্যাটারি (ব) রাখা হয়। ব্যাটারির দুই মেরুর সহিত দূরবর্তী "খ" স্থানে বসানো একটি তড়িৎচুম্বকের (ত) তার-কুণ্ডলীর দুই প্রান্তভাগ দুইগাছি খুব বড় তার দিয়া যোগ করা হয়। মাটি বিদ্যুতের সুপরিবাহক বলিয়া, একগাছি তার ব্যবহার না করিয়া নিম্নোক্ত ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাটারির যে কোন মেরু, ধর নেগেটিভ মেরুর সঙ্গে ছোট তার জুড়িয়া "ক" স্থানের মাটিতে (ম) পুঁতিয়া দেওয়া হয়। তেমনি তড়িৎচুম্বকের তারের একপ্রান্ত "খ" স্থানের মাটিতে (ম') পুঁতিয়া

দেওয়া হয়। এখন ব্যাটারির পজিটিভ মেরু খুব দীর্ঘ এক গাছি তার দিয়া "খ" স্থানের তড়িৎচুম্বকের তারের অপর প্রান্তের সহিত যুক্ত করিলেই চলিবে। মাটি সুপরিবাহক বলিয়া এইভাবে তড়িৎবর্তনী সম্পূর্ণ হয়। সর্বদা তড়িৎপ্রবাহ না চলে, এইজন্য "ক" স্থানে সংযোগ-তার কাটা থাকে। কাটা দুই মুখ এমন একটি যন্ত্র-ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে যে, উহার একটি চাবি (চ) খট্ শব্দ করিয়া চাপিয়া ধরিলে, তার দুইটির সংযোগ হয় এবং তড়িৎবর্তনী সম্পূর্ণ হওয়ায় তড়িৎপ্রবাহ চলে। চাবি টিপিলে তড়িৎপ্রবাহ কোন্ পথে চলে দেখ। তড়িৎপ্রবাহ ব্যাটারির পজিটিভ মেরু হইতে চাবির মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ সংযোগ-তার ভ্রমণ করিয়া, "খ" স্থানে

"ক" ষ্টেশন টেলিগ্রাফ "খ" ষ্টেশন
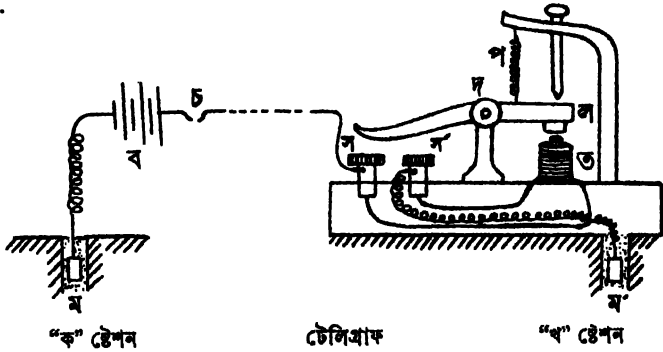
বসানো যন্ত্রের "স" ইস্ক্রুপের মধ্য দিয়া, তড়িৎ-চুম্বকের তারে প্রবেশ করিবে। তারপর তড়িৎ-চুম্বকের তারের অপর প্রান্ত দিয়া (স') ইস্ক্রুপে আসিবে এবং (স') ইস্ক্রুপ হইতে সংযোগ-তার দিয়া মাটিতে (ম') যায়, তারপর মাটির ভিতর দিয়া ম' হইতে ম-তে আসিবে এবং অবশেষে সংযোগ-তার ধরিয়া ব্যাটারিতে পুনরায় প্রবেশ করিবে। "ক" জায়গায় খট্ শব্দে চাবি টেপা হইলে, অমনি তারে তড়িৎপ্রবাহ চলিয়া "খ" স্থানের তড়িৎচুম্বকের তারে আসে। তড়িৎচুম্বকের লৌহ চুম্বকে পরিণত

হয় এবং অমনি উহার সম্মুখের স্প্রিংএর সহিত সংযুক্ত একটি লৌহখণ্ডকে (ল) আকর্ষণ করে। লৌহখণ্ডখানি খট্ শব্দ করিয়া আসিয়া তড়িৎ-চুম্বকের গায়ে লাগে। "ক" স্থানের চাবিটি আবার ছাড়িয়া দিলে, তড়িৎ-বর্তনী খণ্ডিত হয়, তড়িৎপ্রবাহও বন্ধ হয়; ফলে তড়িৎচুম্বক চুম্বকত্ব হারাইয়া সম্মুখের লোহা আকর্ষণ করে না। স্প্রিংএর (প) বলে লৌহখণ্ডটি উপরে চলিয়া যায়। কাজেই "ক" স্থানে চাবি টিপিয়া যেমন দুইবার খট্ খট্ শব্দ হয়, "খ" স্থানেও সেইরূপ তড়িৎচুম্বকের আকর্ষণে লৌহখণ্ডটি দুইবার খট্ খট্ করিয়া উহার দিকে আকৃষ্ট হয়। এই খট্ খট্ শব্দের সুবিধা লইয়া, নানারকম সাঙ্কেতিক শব্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে। "ক" স্থানে চাবি টিপিয়া যতবার খট্ শব্দ করা হয়, "খ" স্থানেও লৌহখণ্ড (ল) তড়িৎচুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হইয়া, ততবার খট্ শব্দের সৃষ্টি করে অর্থাৎ "ক" স্থানের সঙ্কেত হুবহু "খ" স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই আলোচনা দ্বারা "ক" হইতে "খ" স্থানে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা দেখান হইল। "ক" স্থানে "খ"-এর মত ব্যবস্থা এবং "খ" স্থানে "ক" স্থানের মত ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রত্যেক জায়গায় দুই রকম ব্যবস্থা রাখিয়া, প্রত্যেক জায়গাতেই সংবাদ গ্রহণ ও প্রেরণ, উভয় ব্যাপার নিষ্পন্ন করা সম্ভব হইয়া থাকে।

প্রশ্নমালা

(১) সরল তড়িৎসেল বর্ণনা কর। তড়িৎবর্তনী কাহাকে বলে?

(২) তড়িৎপ্রবাহের বিভিন্ন ক্রিয়া কি?

(৩) তড়িৎচুম্বক কাহাকে বলে? উহার ব্যবহার সম্বন্ধে দুইটি দৃষ্টান্ত দাও।

(৪) বৈদ্যুতিক ঘণ্টার নির্মাণ ও ব্যবহার বর্ণনা কর।

(৫) টেলিগ্রাফের মূল তথ্য কি? ছবি আঁকিয়া বুঝাও।

রসায়ন-বিদ্যা

ভূমিকা (Introduction)

জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তাহার চারি পাশে নানা বস্তু ও নানা ঘটনা দেখে এবং স্বতঃই তাহার মনে প্রশ্ন জাগে—ইহা কি—উহা কি—এরূপ ঘটে কেন—এটিকে কিরূপে পাওয়া যায়—প্রভৃতি। সকলেই জানে প্রদীপ জ্বলে—জ্বলিবার পর তৈল পড়িয়া থাকে না—উহা কোথায় যায়—কেমন ভাবে যায়? লোহার উপর মরিচা ধরে—সোনা রূপার উপর ধরে না। ছোট একটি বীজ মাটিতে রোপণ করা হইল—অঙ্কুর বাহির হইল—ক্রমে উহা মহীরুহে পরিণত হইল—কিরূপে ইহা সম্ভব? জলের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালান হইলে, জল আর জল রহিল না; তাহার পরিবর্তে দুইটি গ্যাস উৎপন্ন হইল—উহাদের একটি আবার প্রজ্বলিত হয়—কিন্তু জল ত প্রজ্বলিত হয় না। খানিকটা লবণ তাপ দিয়া গলান হইল—তাহার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা হইল—এবার পাওয়া গেল একটি উজ্জ্বল ধাতু এবং অপরটি গ্যাস। ধাতুটি এমনই ভীষণ যে জলে দিলে উহাতে আগুন লাগে; বাতাসে রাখিলেও উহাতে আগুন লাগে। গ্যাসটি আবার আরও ভীষণ, নাকে যাইলে মানুষ পলাইবার পথ পায় না—যুদ্ধের সময় ব্যবহার করিলে শত্রুপক্ষ অকর্মণ্য ও নির্জীব হইয়া পড়ে; কিন্তু ঐ ধাতু ঐ গ্যাসের সহিত সংযুক্ত হইলে এমনই মিলন ঘটিবে, যাহা ভিন্ন ডাল, ঝোল, মাছের কালিয়া অখাদ্য হইয়া যায়। এক টুকরা কাঠের কয়লা ও এক টুকরা হীরক পোড়ান হইল—প্রত্যেকটি হইতে অঙ্গারাম্ল গ্যাস পাওয়া

গেল। তবে কি কাঠ-কয়লা ও হীরক একই পদার্থ? কাঠ পোড়াইলেও এই গ্যাস পাওয়া যায়। তবে কি কাঠ-কয়লা, হীরক ও কাঠ একই রকম জিনিষ?

তামার উপর বা দস্তার উপর এসিড দেওয়া হইল—উহারা দ্রব হইল, সোনা কিন্তু এইরূপে দ্রব হইল না। ইহার কারণ কি? আমরা নানা প্রকার ধাতু, কয়লা, তৈল, সাবান, গন্ধতৈল, কাচ প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবহার করি; এগুলিই বা আসে কোথা হইতে?

এইরূপ নানা প্রকারের প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। কে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? উত্তর দিবে রসায়ন-বিজ্ঞান। আমাদের এই জগৎ কি কি উপাদানে গঠিত? এই উপাদানগুলির সৃষ্টি বা ধ্বংস সম্ভব কি না? যে সকল মূল পদার্থ আমরা পৃথিবীতে দেখি—সেগুলি গ্রহ নক্ষত্রে আছে কি না? কেমন ভাবে ঐ সকল মূল পদার্থ প্রস্তুত করা যায়, উহাদের ধর্ম কি? উহাদের পরস্পরের প্রতিক্রিয়া কি, এবং এই প্রতিক্রিয়ার পর যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হইল, তাহা মানুষের কার্যকরী কি না? যে বিজ্ঞান এই সকল প্রশ্নের সমাধান ও মীমাংসা করে, তাহাই হইল রসায়ন-বিজ্ঞান। এখানে সংক্ষেপে রসায়ন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দু'চার কথা আলোচনা করা হইল।

প্রথম অধ্যায়

দ্রবণ (Solution)

তোমরা সকলেই জান এক টুকরা মিছরি জলে ফেলিয়া দিলে, উহা কিছুক্ষণ পরে জলে গলিয়া যায়। সেইরূপ চিনি, লবণ, তুঁতে, ফটকিরি প্রভৃতি পদার্থও জলে ধীরে ধীরে গলিয়া যায়। এই জলকে **দ্রবণ** বলা হয়। যে বস্তুগুলি জলে গলে, তাহাদিগকে **দ্রাব্য পদার্থ** এবং জলকে এই সকল বস্তুর **দ্রাবক** বলা যাইতে পারে। সুতরাং মিছরি, চিনি, লবণ, তুঁতে, ফটকিরি—সকলগুলিই দ্রাব্য পদার্থ।

কিছু খড়ির গুঁড়া, বালি, কাঠ-কয়লার গুঁড়া বা গন্ধকচূর্ণ জলে দিয়া নাড়িয়া দেখিবে, উহারা যেমন তেমনি থাকিবে—দ্রব হইবে না অর্থাৎ গলিবে না। সুতরাং কতকগুলি পদার্থ আছে—যাহারা জলে গলে না—ইহারা **অদ্রাব্য পদার্থ**।

এখন চিনি-গলা জল বা লবণ-গলা জল বা ফটকিরি-গলা জল মুখে লইয়া দেখ—চিনি-গলা জলের স্বাদ মিষ্ট, লবণ-গলা জলের স্বাদ লবণাক্ত এবং ফটকিরি-গলা জলের স্বাদ কষায়। আবার চিনি ও লবণ-গলা জল বর্ণহীন, কিন্তু তুঁতে-গলা জলের বর্ণ নীলাভ। সুতরাং কোন বস্তু জলে গলিলে, ঐ বস্তুর গুণাগুণ দ্রবণে অর্থাৎ গলা-জলে বিগুমান থাকে। তোমাদের কেহ কেহ হয়ত সমুদ্রের জল মুখে দিয়া থাকিবে, দেখিয়াছ উহা অত্যন্ত লবণাক্ত; সুতরাং সমুদ্রের জলে যে লবণ আছে, তাহা বুঝিতে পার। এখন সমুদ্রের জল হইতে লবণ কি উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে? একটি পাত্রে সমুদ্রের জল লইয়া তাপ দিয়া সমস্ত জল বাষ্পে

পরিণত করিলে, দেখিবে লবণ পড়িয়া আছে। আবার ঠিক এই প্রক্রিয়ায় চিনি-গলার জল হইতে চিনি এবং তুঁতে-গলার জল হইতে তুঁতে পাওয়া যাইবে। এই প্রক্রিয়াকে **বাষ্পীভবন** (Evaporation) বলে।

পৃক্ত ও অপৃক্ত দ্রবণ
(Saturated and Unsaturated Solution)

এক গ্লাস জলে কিছু লবণ দিয়া ঐ জল নাড়িতে থাক। সমস্ত লবণটুকু দ্রব হইয়া অর্থাৎ গলিয়া যাইবে। আরও একটু লবণ দাও, উহাও জলে দ্রব হইবে। কিন্তু আর একটু লবণ দিলে হয়ত উহা দ্রব হইবে না, খানিকটা জলের তলায় পড়িয়া থাকিবে ; জল নাড়িলেও উহা দ্রব হইবে না। এখন জল, লবণকে দ্রব করিবার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। এই অবস্থায় ঐ জলকে বলা হয় **পৃক্ত দ্রবণ**। তোমরা ভাত খাইতে বসিলে, যদি অল্প অল্প করিয়া তোমাদের পাতে ভাত দেওয়া হয়, তাহা তোমরা খাইয়া ফেলিবে। কিন্তু পেট ভরিলেই তোমরা আর বেশি খাইতে পারিবে না, তখন ভাত দিলে উহা পাতে পডিয়া থাকিবে। সেইরূপ জল কোন বস্তুকে দ্রব করিবার সীমা অতিক্রম করার পর, ঐ বস্তু জলে আরও দিলে উহা তলায় পড়িয়া থাকে। কিন্তু যদি কোন পদার্থ জলে দ্রব হইবার পর, জলের আরও ঐ পদার্থ দ্রব করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে ঐ দ্রবণকে **অপৃক্ত** দ্রবণ বলে। ইহা কিরূপ অবস্থা জান ?—তোমরা ভাত খাইতেছ, এখনও পেট ভরে নাই ; আরও ভাত খাইতে পার—এই অবস্থা।

জলের দ্রব করিবার ক্ষমতা জলের তাপের উপরও নির্ভর করে যে পরিমাণ শীতল জলে যতটুকু চিনি বা ফটকিরি দ্রব হইতে পারে, সেই পরিমাণ উত্তপ্ত জলে ততোধিক পরিমাণে ঐ বস্তু অর্থাৎ চিনি বা ফটকিরি

দ্রব হয়। কিন্তু উত্তপ্ত দ্রবণ শীতল করিলে, ঐ অতিরিক্ত অংশটুকু পুনরায় তলায় জমিয়া যায়।

গালা, গন্ধক প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ জলে দ্রব হয় না বটে, কিন্তু প্রথমটি মেথিলেটেড স্পিরিট (methylated spirit) এবং দ্বিতীয়টি কারবন ডাই-সালফাইড (carbon di-sulphide) নামক তরল পদার্থে দ্রব হয়।

পরিস্রাবণ (Filtration)

তোমাদের মধ্যে যাহারা পল্লীগ্রামে থাক, তাহারা জান, গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে পুষ্করিণীর জল অত্যন্ত ময়লা ও কর্দমাক্ত হয়। বর্ষাকালে কলিকাতার গঙ্গাজলেও যথেষ্ট পরিমাণে মাটি ও বালি ভাসিতে থাকে। এই ময়লা জল একটি কাচপাত্রে দু'তিন দিন ধরিয়া রাখিয়া দাও; দেখিবে উপরের জল অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে এবং পাত্রের তলায় কাদা ও মাটি জমা হইয়াছে। এই প্রক্রিয়াকে **থিতান** বলে। পাত্রের উপরের এই থিতান জল অতি সন্তর্পণে অপর পাত্রে স্থানান্তরিত করিতে পারা যায়। কিন্তু কতকটা জল ঢালিয়া ফেলার পর, পাত্রের জল পুনরায় ঘোলা হইয়া যায় এবং থিতান জলের সহিতও সামান্য সামান্য কাদা বা বালি চলিয়া আসে। সুতরাং এই ভাসমান (suspended) কাদা ও বালি জল হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিতে হইলে, একখানি ফিলটার বা ব্লটিং কাগজের ঠোঙ্গা করিয়া উহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া ময়লা জল ঢালিতে হইবে। সমস্ত ভাসমান ময়লা কাগজের উপর পড়িয়া থাকিবে এবং পরিষ্কার স্বচ্ছ জল কাগজের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। এই প্রক্রিয়াকে **পরিস্রাবণ** বলে।

একখানি গোলাকার ফিলটার কাগজ (অপর পৃষ্ঠায় প্রথম চিত্র) প্রথমে দুই ভাঁজ ও পরে এই দুই ভাঁজকরা কাগজকে আরও দুই ভাঁজ

করিয়া, উহার একটি মুখ খুলিয়া, উহাকে একটি কাচের **ফানেলের** মধ্যে বসাও (দ্বিতীয় চিত্র) ; পরে সামান্য জল দিয়া কাগজ ভিজাইয়া ফানেলের গায়ে উহা বেশ করিয়া বসাইয়া দাও। এখন একটি **স্রাবণ দণ্ডের** (filter stand) উপর ফানেলটি বসাইয়া, উহার তলায় একটি

ফিলটার কাগজ ভাঁজ করা হইয়াছে

পরিষ্কার কাচপাত্র রাখ এবং ময়লা জল ফিলটার কাগজের উপর ধীরে ধীরে ঢালিতে থাক (নীচের চিত্র)। দেখিবে পরিষ্কার **স্বচ্ছ জল**
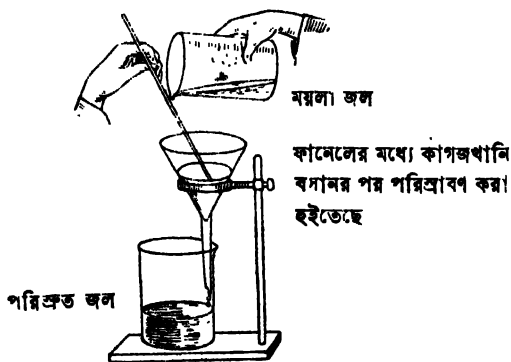
নীচের পাত্রে জমিবে ও সমস্ত ময়লা ফিলটার কাগজের উপর পড়িয়া থাকিবে।

সমুদ্রের তীরে যে বালি বা মাটি পাওয়া যায়, তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ মিশ্রিত থাকে। মনে কর, তোমাকে এইরূপ লবণ মিশ্রিত খানিকটা বালি দেওয়া হইল। তুমি উহার মধ্য হইতে কিরূপে লবণ বাহির করিবে ? ঐ লবণ মিশ্রিত বালি একটি পাত্রে লইয়া জল দিয়া

নাড়িতে থাক। লবণ জলে দ্রব বলিয়া উহা জলে গলিয়া যাইবে কিন্তু বালি জলে অদ্রব বলিয়া গলিবে না। এখন পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া দ্বারা লবণ-জল (বা লবণ দ্রবণ) বালি হইতে পৃথক কর। এইবার এই লবণ-জল অগ্নির তাপে ফুটাইলে, জল উড়িয়া যাইবে এবং পাত্রে লবণ অবশিষ্ট থাকিবে।

পল্লীগ্রামের অপরিষ্কার জল পানীয়ের উপযোগী করিবার জন্য, সছিদ্র মাটির কলসীতে পরিষ্কার বালি ও কাঠ-কয়লা রাখিয়া তাহার উপর অতি ধীরে ধীরে ঐ অপরিষ্কার জল ঢালা হয়; তখন জল পরিস্রুত হইয়া কলসীর ছিদ্র দিয়া পড়িয়া নীচের পাত্রে জমে।

স্ফটিকীকরণ (Crystallisation)

কতকগুলি মিছরি বা তুঁতের টুকরা কিম্বা খানিকটা চিনি বা বালি হাতে লইয়া ভাল করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে, উহারা কতকগুলি সমতল ও উজ্জ্বল ক্ষেত্র দ্বারা বেষ্টিত। ঐগুলিই দানা বা **স্ফটিক** (crystal)। পাহাড়ের ধারে কিম্বা পার্বত্য নদীর ধারে বেড়াইলে, সুন্দর সুন্দর দানার আকারবিশিষ্ট প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার মিউজিয়ামেও নানাবিধ স্ফটিকাকারের বস্তু রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সকল কঠিন পদার্থই যে স্ফটিকাকারে পাওয়া যায় তাহা নহে। কাঠ, কয়লা, চূণ প্রভৃতি পদার্থ স্ফটিকাকারে পাওয়া যায় না। ইহাদের বিশেষ কোন আকার নাই। সেইজন্য এই জাতীয় পদার্থকে **অনিয়তাকার** (amorphous) পদার্থ বলা যাইতে পারে।

কি ভাবে স্ফটিকাকার পদার্থ প্রস্তুত করা যায়, তাহার বিষয় দু' চারি কথা তোমাদিগকে বলিব। কিছু ফটকিরির গুঁড়া উত্তপ্ত জলে দিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত একটুও ফটকিরি জলে গলে, ততক্ষণ পর্যন্ত বেশ করিয়া ঐ জলকে নাড়িতে থাক—এইরূপে উত্তপ্ত জলকে পৃক্ত দ্রবণে

(Saturated solution) পরিণত কর। এইবার ফটকিরির দ্রবণ, শীতল হইতে দাও। তখন দেখা যায়—তাপ কমার সঙ্গে সঙ্গে জলের দ্রব করিবার ক্ষমতাও কমিয়া যায়; সুতরাং ঐ দ্রবণ শীতল হইলে, খানিকটা ফটকিরি পাত্রের তলায় জমিবে। এখন পাত্রের জল ফেলিয়া দিয়া, ফটকিরির টুকরাগুলি ভাল করিয়া দেখ। দেখিবে উহা ছোট ছোট স্ফটিকে পরিণত হইয়াছে। এইভাবে অনেক দ্রব্য স্ফটিকাকারে পাওয়া যাইতে পারে।
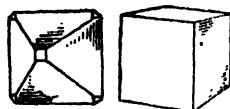
ফটকিরির স্ফটিক   লবণের স্ফটিক

এইবার তুঁতের (Copper sulphate) একটি ছোট স্ফটিক লইয়া উহাতে সুতা বাঁধ এবং স্ফটিকটি তুঁতের পৃক্ত দ্রবণের মধ্যে দু' চার দিন ডুবাইয়া রাখ। ঐ সময়ের মধ্যে দ্রবণের খানিকটা জল বাষ্পে পরিণত হইবে; এবং জলের পরিমাণ কম হওয়ার জন্য, কতকটা তুঁতে জল হইতে পৃথক হইয়া, ঐ ছোট স্ফটিকটির উপর জমিয়া জমিয়া উহাকে একটি বড় স্ফটিকে পরিণত করিবে।

পাতন বা চুয়ান (Distillation)

জলে চিনি কিম্বা লবণ দ্রবীভূত থাকিলে, পরিস্রাবণ দ্বারা জল হইতে উহা পৃথক করা যায় না। পরিস্রাবণ দ্বারা কঠিন বা ভাসমান পদার্থই জল হইতে পৃথক করা সম্ভব। দ্রব পদার্থ জল হইতে পৃথক করিতে হইলে, **পাতন** বা **চুয়ান** প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হইবে। কূপ বা প্রস্রবণের জলে ভাসমান পদার্থ না থাকিলেও, দ্রব পদার্থ উহাতে গলিত থাকে। একটি পাত্রে ঐ জল লইয়া অগ্নির তাপে জল তাড়াইয়া দিলে, সাদা কঠিন পদার্থ পাত্রের তলায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। এই পদার্থ নিশ্চয়ই জলে দ্রবীভূত ছিল। নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুতের জন্য

এবং পরীক্ষাগারে (Laboratory) ব্যবহার করার জন্য জল আবশ্যক; কিন্তু ঐ জলে দ্রব পদার্থ থাকা ক্ষতিকর। সুতরাং এক্ষেত্রে জলকে পাতন বা চুয়ান প্রক্রিয়া দ্বারা পরিষ্কার করা নিতান্ত আবশ্যক।

একটি কাচের ফ্লাস্কে কিছু জল লইয়া ফ্লাস্কের মুখ একটি সছিদ্র কর্ক দ্বারা বন্ধ কর এবং ঐ ছিদ্রের মধ্যে একটি বাঁকা নল লাগাইয়া উহার সহিত একটি **কনডেনসার** (Condenser) বা ঘনীকরণ যন্ত্র সংযুক্ত কর; কনডেনসারের অপর মুখে একটি ছোট কাচের ফ্লাস্ক বসাও (নীচের চিত্র দেখ)।

পাতন ক্রিয়া
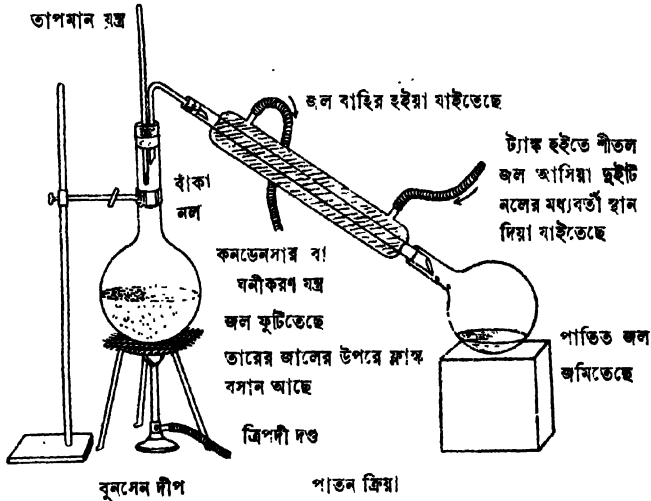
চুয়ান প্রক্রিয়া বুঝিতে হইলে, কনডেনসারের গঠন প্রণালীও জানা আবশ্যক। একটি সরু কাচের নলের বহির্ভাগে আর একটি মোটা নল সংলগ্ন থাকে। ফ্লাস্কে জল ফুটিয়া যখন বাষ্পে পরিণত হয়, তখন ঐ বাষ্প কনডেনসারের সরু নলটির মধ্য দিয়া আসিতে থাকে এবং সরু ও

মোটা নলটির মধ্যবর্তী স্থান দিয়া শীতল জল প্রবাহিত করিয়া সরু নলের মধ্যস্থ উত্তপ্ত বাষ্পকে শীতল করা হয়। বাষ্প শীতল হইলেই জল হয়; এই জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ছোট কাচের বোতলে জমিতে থাকে।

পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রে দেখিতেছ, ফ্লাস্কের জল একটি বুনসেন দীপের সাহায্যে ফুটান হইতেছে এবং জলের ট্যাঙ্ক (tank) হইতে শীতল জল কনডেনসারে আসিয়া বাষ্পকে জলে পরিণত করিতেছে। তারপর ট্যাঙ্কের শীতল জল কনডেনসারে উষ্ণ হইয়া আর এক পথ দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। জল বাষ্পে পরিণত হইবার সময় কঠিন দ্রব পদার্থ ফ্লাস্কেই থাকিয়া যায়। সুতরাং চুয়ান বা পাতিত জলে কোন অদ্রাব্য পদার্থ থাকিতে পারে না।

ঊর্ধ্বপাতন (Sublimation)

কর্পূর, ক্যালমেল প্রভৃতি কতকগুলি কঠিন পদার্থ আছে, যেগুলি সাধারণ উষ্ণতায় (at ordinary temperature) বা উত্তাপ পাইলে কঠিন অবস্থা হইতে একবারেই বায়বীয় আকার ধারণ করে, আবার শীতল হইলে বায়বীয় আকার হইতে একবারে কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে **ঊর্ধ্বপাতন** বলে। কর্পূর, ক্যালমেল প্রভৃতি দ্রব্যকে শোধন করিতে হইলে ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয়।

মনে কর, তোমাকে কর্পূর ও বালি একসঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দুইটিই জলে অদ্রাব্য। সুতরাং কি উপায়ে তুমি ইহাদিগকে পৃথক করিবে? ঐ মিশ্রিত পদার্থ একটি পাত্রে লইয়া উহার উপর একখানি ফিলটার কাগজ চাপা দাও এবং তাহার উপর একটি কাচের ফানেল উল্টা করিয়া বসাও (অপর পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। এখন স্পিরিট

ল্যাম্প বা বুন্‌সেন দীপ জ্বালিয়া কপূর ও বালির মিশ্রণ উত্তপ্ত কর এবং কিছুক্ষণ পরে পাত্রটি শীতল হইতে দাও। এইবার উপরের ফানেলটি তোল; দেখিবে সমস্ত কর্পূর ফানেলের মধ্যে জমিয়া আছে এবং বালি ফিলটার কাগজের নীচে পড়িয়া আছে।
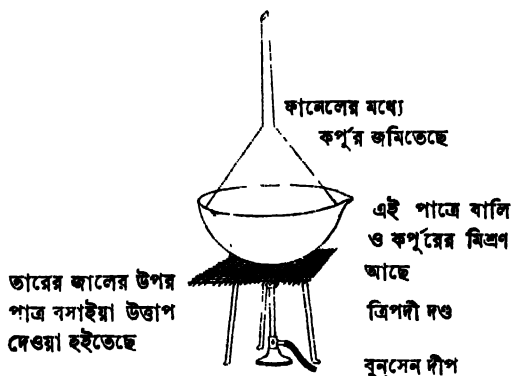
কেন এরূপ হইল বলিতে পার? কপূর উত্তপ্ত হইয়া বায়বীয় আকার ধারণ করিয়া, ফিলটার কাগজের মধ্য দিয়া, উপরে উঠিয়া, অপেক্ষাকৃত শীতল ফানেলের সংস্পর্শে আসিয়া পুনরায় কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উত্তাপে বালির অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই বলিয়া, উহা পাত্রের তলায় পড়িয়া আছে।

প্রশ্নমালা

(১) পৃক্ত দ্রবণ কাহাকে বলে? এক সের জলে খানিকটা সোরা (nitre) দিয়া জল পৃক্ত করার পর, ঐ দ্রবণ ফুটান হইল। আরও যদি সোরা দেওয়া যায় উহা দ্রব হইবে, না তলায় পড়িয়া থাকিবে? ঐ ফুটন্ত সোরার দ্রবণ শীতল করিলে কি হইবে?

(২) জলে গন্ধক কি দ্রব হয়? উহা কোন্ পদার্থে দ্রব হয়? খানিকটা লবণ, খানিকটা তুঁতে ও খানিকটা চিনি পৃথক পৃথক পাত্রে জল দ্বারা দ্রব করা হইল—তুমি বলিতে পার কোন্‌টি কিসের দ্রবণ?

(৩) তোমাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি মিশ্রণ দেওয়া হইয়াছে; তুমি কিরূপে উহাদিগকে পৃথক করিবে?

(ক) গন্ধক ও খড়ির গুঁড়া

(খ) লবণ ও বালি

(গ) কর্পূর ও কাচের গুঁড়া

(ঘ) কাঠ-কয়লার গুঁড়া, গন্ধক চূর্ণ ও সোরা

(৪) পুষ্করিণীর জলে কিরূপ ময়লা থাকে? কি উপায়ে তুমি ঐ জল হইতে সকল প্রকার ময়লা দূর করিতে পার?

দ্বিতীয় অধ্যায়

পদার্থের গঠন: যৌগিক ও মৌলিক পদার্থ (Compound and Element)

একটি পরীক্ষা-নলে কিছু **মারকিউরিক অক্সাইড** (mercuric oxide—(লাল গুঁড়া পদার্থ) লইয়া, উহার মুখে একটি সছিদ্র কর্ক পরাও এবং ঐ ছিদ্রের মুখে একটি বাঁকা নল সংযুক্ত করিয়া, উহার অপর প্রান্ত জলপাত্রে ডুবাও (পর পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। এখন স্পিরিট ল্যাম্প বা বুন্‌সেন দীপ সাহায্যে পরীক্ষা-নল উত্তপ্ত করিলে দেখিবে, মারকিউরিক

অক্সাইড হইতে এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ পৃথক হইয়া জলমধ্যে বুদ্‌বুদ্‌-আকারে বাহির হইতেছে এবং পরীক্ষা-নলের মুখের কাছে পারদ (mercury) জমিতেছে। যদি বায়বীয় পদার্থ একটি জলপূর্ণ গ্যাস জারের

গ্যাস জারের মধ্যে গ্যাস জমিতেছে

জলপাত্রে জল আছে। তাহার উপর জলপূর্ণ গ্যাস জার উপুড় করিয়া রাখা হইয়াছে

পরীক্ষা-নলে মারকিউরিক অক্সাইড উত্তপ্ত করা হইতেছে

বুন্‌সেন্‌ দীপ
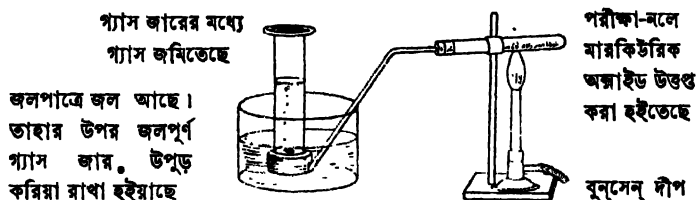
মধ্যে সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইলে উহা যে অম্লজান (oxygen) তাহা সহজে প্রমাণ করা যাইতে পারে (১২২ পৃঃ দেখ)। তবেই দেখা গেল ঐ লাল গুঁড়া পদার্থ (মারকিউরিক অক্সাইড) হইতে দুইটি পদার্থ পাওয়া গেল—একটি পারদ যাহা তরল বস্তু এবং অপরটি অক্সিজেন যাহা বায়বীয় পদার্থ।

এইভাবে আর একটি পরীক্ষা-নলে কিছু **পোটাসিয়াম ক্লোরেট** (potassium chlorate) লইয়া উত্তপ্ত করিলে, উহা হইতেও অক্সিজেন (অম্লজান) গ্যাস পাওয়া যায়।

আবার একটি তড়িৎকোষের (battery বা cell) দুই মেরুর (pole) সহিত দুইটি প্ল্যাটিনাম-তার সংযুক্ত করিয়া, ঐ তার দুইটির অপর প্রান্ত একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও (১৩৬ পৃঃ দেখ)। দেখিবে প্রত্যেক তারের গা দিয়া গ্যাসের বুদ্‌বুদ উঠিতেছে; উহাদের একটি অক্সিজেন (অম্লজান) এবং অপরটি হাইড্রোজেন (উদজান)।

অতএব দেখা গেল, মারকিউরিক অক্সাইড হইতে দুইটি পদার্থ উৎপন্ন হইল—একটি তরল পারদ, অপরটি অক্সিজেন গ্যাস এবং জল হইতেও

দুইটি পদার্থ পাওয়া গেল; ইহাদের প্রত্যেকটি বায়বীয়—একটি অক্সিজেন এবং অপরটি হাইড্রোজেন। আবার পটাসিয়াম ক্লোরেট হইতে অক্সিজেন ব্যতীত, পটাসিয়াম নামক একটি ধাতু ও ক্লোরিণ (chlorine) নামে আর একটি বায়বীয় বস্তু পাওয়া যাইতে পারে।

এক্ষেত্রে মারকিউরিক অক্সাইড, জল, পটাসিয়াম ক্লোরেট প্রভৃতি হইল যৌগিক পদার্থ; কারণ ইহারা দুই বা ততোধিক বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে; অর্থাৎ ঐগুলি ভাঙ্গিয়া দুই বা ততোধিক বিভিন্ন পদার্থ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস হইতে চেষ্টা করিয়াও, উহা ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ পাওয়া যায় না। সেইরূপ হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিণ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পারদ প্রভৃতি হইতেও, ঐ ঐ পদার্থ ব্যতীত অন্য পদার্থ পাওয়া যায় না। যদি কোন পদার্থ হইতে ঐটি ব্যতীত অপর কোন পদার্থ পাওয়া না যায়, তবে উহাকে বলা হয় **মৌলিক** বা **মূল পদার্থ** (Element)। অতএব অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পারদ প্রভৃতি সকলগুলিই মৌলিক পদার্থ।

আমাদের এই জড়জগৎ কতকগুলি মৌলিক পদার্থ লইয়া গঠিত। এবং দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে (chemical union) **যৌগিক পদার্থ** (chemical compound) উৎপন্ন হয়।

আমরা প্রায় ৯২টি মৌলিক পদার্থের বিষয় অবগত আছি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলিকে বলি **ধাতু** (metal) এবং কতকগুলিকে বলি **অধাতু** (non-metal)। ধাতু যেমন—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, নিকেল, দস্তা, লৌহ, এলুমিনিয়াম, পারদ, সোডিয়াম, কেলসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি; এবং অধাতু যেমন—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিণ, আইওডিন, অঙ্গার, গন্ধক প্রভৃতি।

তৃতীয় অধ্যায়

দহন ও লৌহে মরিচা পড়া

(Combustion and Rusting of Iron)

একটি ছোট হালকা পাত্রে (crucible) ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর খানিকটা গুঁড়া লইয়া ঐ পাত্রটি একটি জলপূর্ণ থাত্রে ভাসাইয়া রাখ। এখন এই পাত্রের উপর একটি ছিপিবন্ধ কাচের বেলজার (bell jar) ঢাকা দাও। প্রথমে দেখিবে, বেলজারের মুখের ছিপি খুলিলে জারের ভিতরে ও বাহিরে জল সমতলে আছে। এখন বেলজারের উপরের মুখ দিয়া একটি জলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইয়া, ম্যাগনেসিয়াম গুঁড়াগুলি স্পর্শ কর এবং শীঘ্র কাঠিটি বাহির করিয়া জারের মুখ ভাল করিয়া পুনরায়
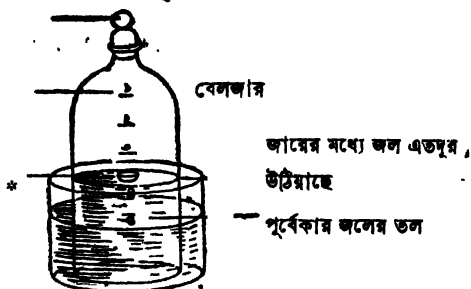
ছিপি দিয়া বন্ধ কর। এখন দেখিবে, দীপ্ত কাঠি স্পর্শে ম্যাগনেসিয়াম জলিয়া উঠিবে এবং জারের মধ্যে জলের তল (level) বাহিরের জলের তল অপেক্ষা উঁচু হইবে ও পূর্বে জারের মধ্যে যতটুকু বায়ু ছিল, এখন তাহার $\frac{4}{5}$ অংশ অবশিষ্ট আছে (উপরের চিত্র দেখ)। এখন জারের মধ্যে

* উপরে যে চিত্র দেওয়া হইল সেইরূপ পাত্রে ম্যাগনেসিয়ম ব্যতীত লৌহচূর্ণ (পৃঃ ১১২) এবং গন্ধকচূর্ণ (পৃঃ ১১৫) লইয়া পরীক্ষার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

আবার একটি প্রজ্বলিত কাঠি প্রবেশ করাও; দেখিবে উহা নিভিয়া যাইবে। সুতরাং প্রজ্বলন বা দহনের পর, জারের মধ্যে যে গ্যাস অবশিষ্ট থাকে, উহাতে কোন বস্তুই জ্বলিতে পারে না। তবেই বুঝা গেল বায়ুতে অন্তত দুইটি পদার্থ আছে। একটিতে কোন কোন বস্তু জ্বলিতে পারে এবং অপরটিতে কোন বস্তু জ্বলিতে পারে না। প্রথমটি হইল দহনের সহায়—উহার নাম **অক্সিজেন** এবং অপরটি হইল দহনের প্রতিবন্ধক—উহার নাম **নাইট্রোজেন**।

তোমরা জারটি লক্ষ করিয়া দেখিয়াছ, দহনের পর জারের মধ্যে যে $\frac{4}{5}$ অংশ গ্যাস আছে, তাহাই নাইট্রোজেন। অতএব বায়ুর $\frac{4}{5}$ অংশ নাইট্রোজেন এবং অবশিষ্ট $\frac{1}{5}$ অংশ অক্সিজেন!

যদি ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর গুঁড়াগুলির ওজন জানা থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে, দহনের পর পাত্রে (crucible) যে সাদা গুঁড়া অবশিষ্ট থাকে তাহার ওজন বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ অবশিষ্ট সাদা গুঁড়ার নাম **ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড** (magnesium oxide)। জারের মধ্যে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত ম্যাগনেসিয়াম সংযুক্ত হইয়া ইহা উৎপন্ন হইয়াছে; এইজন্যই দহনের পর ধাতুর ওজন বেশি হইয়াছে। দহন ক্রিয়ায় বায়ুর অক্সিজেন নিঃশেষ হইয়া গেলে, তাহার স্থান খালি হইল—জল উঠিয়া সেই খালি স্থান অধিকার করিল; সুতরাং যে পরিমাণ স্থান জল আসিয়া অধিকার করিল, বায়ুতে সেই পরিমাণ **অক্সিজেন** ছিল এবং যে পরিমাণ গ্যাস অবশিষ্ট রহিল তাহাই **নাইট্রোজেন**।

ঠিক পূর্বের মত আর একটি ছোট পাত্রে কয়েকটি চকচকে লোহার টুকরা রাখিয়া, পাত্রটি (১১১ পৃঃ চিত্র) জলে ভাসাইয়া দাও এবং উহার উপর একটি বেলজার চাপা দাও। এখন ভিতরে ও বাহিরের জল সমতলে আছে। জারের মধ্যে যে বায়ু আছে, তাহার আয়তন মাপিয়া লও এবং জারের উপরের মুখ ভাল করিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া, উহাকে ঠিক এইভাবে

কিছুদিন রাখিয়া দাও। পরে দেখিবে জারের মধ্যে জল বাহিরের জল অপেক্ষা উচ্চ হইয়াছে এবং লোহার উপর মরিচা ধরিয়াছে (১১১ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। এখন জারের মধ্যে যে গ্যাস আছে, তাহার আয়তন মাপিয়া দেখ, দেখিবে ঠিক পূর্বের মত $\frac{4}{5}$ অংশ অবশিষ্ট আছে। এখন একটি প্রজ্বলিত কাঠি জারের মধ্যে ধর। দেখিবে উহা নিভিয়া যাইবে। সুতরাং এক্ষেত্রে জারের মধ্যে যে গ্যাস অবশিষ্ট আছে, উহা **নাইট্রোজেন**। কিন্তু অক্সিজেন কোথায় গেল ? উহা ধীরে ধীরে লৌহের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে—ফলে লৌহের উপর মরিচা ধরিয়াছে। এখানেও চকচকে লোহার ওজনের অপেক্ষা, মরিচা-ধরা লোহার ওজন বেশি হইয়াছে। বেশি ওজনটুকুই হইল অক্সিজেনের ওজন, যাহা লৌহের সহিত সংযুক্ত হইয়া **অক্সাইড** উৎপন্ন করিয়াছে। সুতরাং মরিচা হইল এক প্রকার **অক্সাইড**। কোন মূল পদার্থের সহিত অক্সিজেন সংযুক্ত হইলেই অক্সাইড গঠিত হয়।

শুষ্ক বায়ুতে অর্থাৎ জলীয় বাষ্পহীন বায়ুতে লোহার উপর শীঘ্র মরিচা পড়ে না। অতএব বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি মরিচা ধরার একটি কারণ; বায়ুতে **অঙ্গারাম্ল গ্যাস** (কারবন ডাই-অক্সাইড) থাকাও মরিচা পড়ার অপর একটি কারণ। মরিচা ধরিলে লৌহ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। সেইজন্য লোহার কড়ি প্রভৃতির উপর একটি রঙএর আবরণ দেওয়া হয়। ইহাতে লৌহের উপর শীঘ্র মরিচা ধরে না।

তোমরা সকলেই জান কাঠ ও কয়লা জ্বলে এবং জ্বলিবার পর পড়িয়া থাকে কিছু ভস্ম; তৈলও জ্বলে কিন্তু এখানে কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কাঠ, কয়লা, তৈল এগুলি হইল **দাহ্য** পদার্থ। কিন্তু বায়ুর সাহায্য ব্যতীত কিছুই জ্বলিতে পারে না। প্রজ্বলিত কাঠকে মাটি চাপা দাও—উহা নিভিয়া যাইবে। বায়ুর অভাব ঘটিল বলিয়াই নিভিয়া গেল। আমরা দেখিয়াছি বায়ুর নাইট্রোজেনে কিছুই জ্বলে না। তবেই

বুঝিলে সাধারণত অক্সিজেন ব্যতীত দাহ্য পদার্থ পুড়িতে পারে না। জ্বলিবার সময় দাহ্য পদার্থ অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হয়, ফলে আমরা তাপ ও আলোক পাইয়া থাকি। এই ক্রিয়াকেই **দহন** বলে। কাঠ পুড়িল বা খানিকটা তৈল পুড়িল, এখানেও অক্সিজেনের সহিত কাঠ বা তৈলের সংযোগ ঘটিল। কাঠে আছে অঙ্গার (carbon) ও হাইড্রোজেন, তৈলেও আছে অঙ্গার এবং হাইড্রোজেন, মোমবাতিতেও আছে তাহাই, এই দুইটিই দাহ্য পদার্থ। কাঠ, তৈল বা মোমবাতি জ্বালাইলে হাইড্রোজেন পুড়িল, অঙ্গার পুড়িল এবং হাইড্রোজেন দহনের ফলে উৎপন্ন হইল কিছু জল বা জলীয় বাষ্প এবং অঙ্গার দহনের ফলে উৎপন্ন হইল **অঙ্গারাম্ল গ্যাস** (কারবন ডাই-অক্সাইড)। জল এবং অঙ্গারাম্ল গ্যাস, ইহারা প্রত্যেকেই **অক্সাইড।** কিন্তু ইহারা অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও অঙ্গার দহনের সময়ে বায়ুর এক উপকরণ অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক মিলনে মিলিত হইয়া যায়। একটি **গ্যাস-জারে** (gas jar) একটি প্রজ্বলিত মোমবাতি ধর (চিত্র দেখ) এবং গ্যাস-জারের মুখে একখানি ঢাকনি চাপা দাও। জারের মধ্যে বাতিটি কতক্ষণ জ্বলিবে? যতক্ষণ অক্সিজেন গ্যাস থাকিবে। যেমনি অক্সিজেন গ্যাস শেষ হইয়া আসিবে, তেমনি দেখা যাইবে শিখাটি ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া অবশেষে নিভিয়া যাইবে। জারের উপরের দিক ভাল করিয়া দেখ, দেখিবে উহার গায়ে ছোট ছোট জলবিন্দু জমিয়াছে। এখানে জলবিন্দু কোথা হইতে আসিল বলিতে পার? পূর্বে বলিয়াছি তৈল ও মোমবাতিতে অঙ্গার ও হাইড্রোজেন নামক দুটি মৌলিক পদার্থ আছে এবং প্রত্যেকেই দাহ্য বস্তু। সুতরাং বাতি জ্বলিবার সময় হাইড্রোজেন গ্যাস অক্সিজেনে পুড়িয়া

গ্যাস জারের মধ্যে বাতি জ্বালান হইয়াছে; জারের মুখে ঢাকনি দেওয়া আছে

উৎপাদন করে জল, তাহাই জারের গায়ে বিন্দু বিন্দু আকারে জমিয়া আছে এবং অঙ্গার পুড়িয়া উৎপন্ন করিয়াছে অঙ্গারাম্ল গ্যাস (carbon dioxide)। মোমবাতিটি নিভিয়া যাইবার পর কিছু পরিষ্কার চুণের জল জারের মধ্যে ঢালিয়া নাড়িতে থাক। দেখিবে চুণের জল দুধের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। চুণের জলে অঙ্গারাম্ল গ্যাস দ্রব হইয়া এই প্রকার সাদা পদার্থ উৎপন্ন করে। এই উপায়ে অঙ্গারাম্ল গ্যাসের উপস্থিতি বুঝিতে পারা যায়।

তোমরা হয়ত গন্ধক পোড়ান দেখিয়া থাকিবে। সংক্রামক ব্যাধি আরম্ভ হইলে ঘরের মধ্যে গন্ধক জ্বালান হয় এবং জ্বলিবার সময় ইহা হইতে এক প্রকার তীব্রগন্ধযুক্ত বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। যদি গন্ধক জ্বালাইয়া তাহার উপর একটি পাত্র চাপা দাও, দেখিবে গন্ধক কিছুক্ষণ জ্বলিয়া নিভিয়া যাইবে, এখানেও গন্ধকের সহিত অক্সিজেনের মিলন হয়। যেমনি অক্সিজেন নিঃশেষ হইল, তেমনি গন্ধকও নিভিয়া গেল। এখানেও গন্ধক অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া উৎপন্ন করিল আর এক প্রকার **অক্সাইড**, উহাকে বলে **সালফার ডাই-অক্সাইড**। ইহা এক প্রকার বায়বীয় বস্তু, ইহার তীব্র গন্ধ আছে, ইহা জীবাণুনাশক এবং জলে শীঘ্র দ্রব হয়।

যে প্রক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়ামচূর্ণ আবদ্ধ জারের মধ্যে প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল, ঠিক সেইরূপে একটি ছোট ক্রুসিবেলে (crucible) (১১১ পৃঃ চিত্র) কিছু গন্ধক রাখিয়া **ক্রুসিবেলটি** জলে ভাসাইয়া রাখ এবং উহার উপর একটি বেলজার চাপা দাও। জল এখানেও জারের ভিতরে ও বাহিরে সমতলে আছে। এখন জারের মধ্যস্থ বায়ুর আয়তন মাপিয়া পূর্বের মত গন্ধকটি জ্বালাইয়া দিয়া, জারের উপরের মুখ বন্ধ কর। কিছুক্ষণ পরে দেখা যাইবে, জারের ভিতরের জল বাহিরের জল অপেক্ষা উপরে উঠিয়াছে (১১১ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। দহনের ফলে গন্ধক বায়ুর

অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ (**সালফার ডাই-অক্সাইড** বা **গন্ধকাম্ল গ্যাস**) উৎপন্ন করিয়াছে; উহা জলে দ্রব বলিয়া জারের মধ্যে জল উঠিয়াছে। দহনের ফলে অক্সিজেন শেষ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং জারের মধ্যে অবশিষ্ট আছে নাইট্রোজেন। পূর্বে জারের মধ্যে যে আয়তনে বায়ু ছিল, দেখিবে এক্ষণে তাহার $\frac{8}{5}$ অংশ অবশিষ্ট আছে। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতেছি, বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্যাস ব্যয় হইবার পর, অবশিষ্ট থাকে বায়ুর $\frac{8}{5}$ অংশ। প্রজ্বলিত কাঠি প্রবেশ করাইয়া দেখিতে পার, জারের মধ্যে উহা নিভিয়া যাইবে। অতএব ইহাও যে নাইট্রোজেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং বায়ুর অপর $\frac{1}{5}$ অংশই অক্সিজেন। এই অক্সিজেন কখনও ম্যাগনেসিয়ামের সহিত মিলিত হইয়া উৎপন্ন করে সাদা কঠিন পদার্থ, কখনও লৌহের সহিত মিলিত হইয়া উৎপন্ন করে এক প্রকার লাল কঠিন পদার্থ, কখনও বা অঙ্গারের সহিত, কখনও বা গন্ধকের সহিত মিলিত হইয়া উৎপন্ন করে বায়বীয় পদার্থ এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দহনের পর পাইতেছি বিভিন্ন অক্সাইড।

ম্যাগনেসিয়াম ধাতু অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইবার সময় আমরা যেমন প্রথমে ম্যাগনেসিয়ামকে জ্বালাইয়া দি, সেইরূপ গন্ধককে ও মোমবাতিকেও জ্বালাইয়া দিয়া থাকি এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাপ ও আলোক পাইয়া থাকি। এই ক্রিয়াগুলিকে বলে দহন।

কিন্তু লৌহের বেলায় দেখিতে পাই, উহা বায়ুর অক্সিজেনে ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইয়া মরিচায় পরিণত হয়। আবার দেখ, লৌহ মরিচায় পরিণত হইবার সময় তাপও পাই না, আলোকও পাই না। সুতরাং মরিচা ধরাকে ঠিক দহন ক্রিয়া বলা যায় না।

আবার ম্যাগনেসিয়াম দহনের পর, উহা ওজনে বৃদ্ধি পায়। আরও দেখ, লোহা অপেক্ষা মরিচার ওজন বেশি। দাহ্য পদার্থের দহনের

পর বা অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইবার পর, ওজন বাড়ে। ইহাই নিয়ম এবং এই বেশি ওজন অক্সিজেনের ওজন নির্দেশ করে। কিন্তু দেখ তৈল জ্বলিল, কিছুই অবশিষ্ট রহিল না; গন্ধক জ্বলিল, এখানেও কিছু বাকি রহিল না। তৈল বা গন্ধক জ্বালিবার সময় যে পদার্থ-গুলি উৎপন্ন হয়, তাহারা বায়বীয় পদার্থ; এবং দহনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল বায়বীয় পদার্থ উন্মুক্ত বায়ুতে মিশিয়া যায়। যদি ঐ সকল বায়বীয় পদার্থ কোন উপায়ে ধরিয়া রাখিয়া ওজন করা হইত, তবে দেখা যাইত এক্ষেত্রেও দহনের পর ওজন বৃদ্ধি হইয়াছে।

প্রশ্নমালা

(১) দহন কাহাকে বলে, উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

(২) কাঠ-কয়লা বা গন্ধক পোড়াইবার পর উহাদের ওজন কমিয়া যায়, কিন্তু ম্যাগনেসিয়াম পোড়াইলে উহার ওজন বাড়ে, ইহার কারণ কি?

(৩) মরিচা ধরা কাহাকে বলে? দহনের সহিত উহার পার্থক্য কোথায়?

(৪) একটি প্রজ্বলিত শিখার উপর ঢাকা চাপা দিলে, শিখাটির কি অবস্থা হয় বল? এরূপ হইবার কারণ কি?

(৫) বায়ুর $\frac{4}{5}$ অংশ নাইট্রোজেন এবং $\frac{1}{5}$ অংশ অক্সিজেন, তাহা কিরূপে প্রমাণ করিতে পার?

চতুর্থ অধ্যায়

বায়ুর গঠন ; অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কারবন ডাই-অক্সাইড

বায়ুর আয়তনের ৪/৫ অংশ নাইট্রোজেন এবং অপর ১/৫ অংশ অক্সিজেন, একথা পূর্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। লেভোসিয়ে (Lavoisier) নামক একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক বায়ুর এই গঠন প্রণালী নির্ধারণ করেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা সর্বপ্রথমে প্রমাণ করেন—ধাতুপদার্থ বায়ুতে পোড়াইলে, উহা অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া ওজনে বৃদ্ধি পায়। মনে কর, ২৪ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু বায়ুতে পোড়ান হইল এবং দহনের পর দেখা গেল, ম্যাগনেসিয়াম ভস্মের ওজন ৪০ গ্রাম হইয়াছে অর্থাৎ ১৬ গ্রাম ওজন বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধি কোথা হইতে হইল ? বায়ু হইতে এই ১৬ গ্রাম অক্সিজেন আসিয়া ম্যাগনেসিয়ামের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু যদি একটি আবদ্ধ পাত্রে কিছু ম্যাগনেসিয়াম লইয়া ধাতু ও বায়ুসহ পাত্রটি দহনের পূর্বে ও পরে ওজন করা হইত, দেখা যাইত ওজন ঠিকই আছে। অর্থাৎ ম্যাগনেসিয়ামের যেটুকু ওজন বৃদ্ধি পায়, আবদ্ধ পাত্রের বায়ু হইতে ঠিক সেই পরিমাণ অক্সিজেন ব্যয় হওয়ার ফলে, আবদ্ধ পাত্রের বায়ুর ওজন ঐ পরিমাণে কমে। অতএব সর্বসমেত ওজন ঠিকই থাকে। লেভোসিয়ে এই আবিষ্কারের জন্য অমর হইয়া গিয়াছেন এবং এইজন্যই তাঁহাকে নব্য-রসায়নের জন্মদাতা বলা হয়। লেভোসিয়ে যখন তাঁহার জ্ঞান গরিমার উচ্চ শিখরে, যখন তাঁহার খ্যাতি জগৎব্যাপ্ত, যখন তিনি বহুবিধ রাজসম্মান ও

পদমর্যাদা লাভ করিয়াছেন, তখন ফরাসীবিপ্লব আরম্ভ হইল। দেশের রাজা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত লেভোসিয়েও বিপ্লবীগণ কর্তৃক দোষী প্রতিপন্ন হইলেন। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইল, তিনি ধৃত হইলেন এবং ইহার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনি বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হইলেন। এইরূপে সেই সময়ের সর্বপ্রধান বৈজ্ঞানিকের জীবনান্ত ঘটিল।

এখন লেভোসিয়ে কিভাবে বায়ুর গঠনপ্রণালী আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগকে বলিব।

একটি বকযন্ত্রে (retort) কিছু পারদ লওয়া হইল এবং বকযন্ত্রের মুখটি এক পাত্রস্থিত পারদের মধ্য দিয়া গিয়া, পারদের উপরে কিছু জাগিয়া রহিল (চিত্র দেখ)। এখন এই পাত্রের পারদের উপর
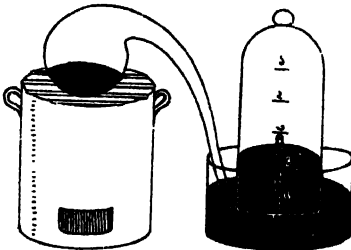
বায়ুপূর্ণ জারে এখন নাইট্রোজেন অবশিষ্ট আছে।

পরীক্ষার পূর্বে বকযন্ত্রের মুখ এই পাত্রের পারদের উপর জাগিয়া ছিল ; পরীক্ষার শেষে পারদের বাহিরের তল অপেক্ষা পারদের ভিতরের তল উচ্চ হইয়াছে

বকযন্ত্রে পারদ উত্তপ্ত করা হইতেছে

একটি বেলজার চাপা দিয়া দিনের পর দিন বকযন্ত্রের পারদকে উত্তপ্ত করা হইল। দেখা গেল উত্তপ্ত পারদের উপর কতকগুলি লাল কণা ভাসিতেছে। ক্রমশই এই লাল কণাগুলি পরিমাণে বেশি হইতে লাগিল এবং ওদিকে বেলজারের মধ্যে পারদ ক্রমশ ঊর্ধ্বে উঠিতে লাগিল। বারদিন ধরিয়া তাপ দেওয়ার পর দেখা গেল, লাল কণাগুলি আর

বাড়িতেছে না এবং বেলজারের মধ্যে পারদও আর উঠিতেছে না। আরও দেখা গেল, বেলজারের মধ্যে পূর্বে যে আয়তনের বায়ু ছিল, এখন তাহার $\frac{৪}{৫}$ অংশ অবশিষ্ট আছে; এবং ইহার মধ্যে প্রজ্বলিত কাঠি প্রবেশ করাইলে উহা নিভিয়া যায়। তাহা হইলে বায়ুর এই অবশিষ্টাংশ দহনের সহায় নহে। এখন বকযন্ত্রের মধ্যে যে লাল কণাগুলি হইয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া একটি ছোট বকযন্ত্রে উত্তপ্ত করা হইল; দেখা গেল উহা হইতে এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ বাহির হইতেছে এবং বকযন্ত্রের গায়ে পারদও জমিতেছে। পরীক্ষার দ্বারা জানা গেল, এই বায়বীয় পদার্থে দীপ্ত কাঠি তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠে। সুতরাং এই বায়বীয় পদার্থটি দহনের সহায়। এই পরীক্ষায় লেভোসিয়ে প্রমাণ করিলেন, বায়ু দুইটি পদার্থ দিয়া গঠিত, উহার একটিতে প্রজ্বলিত বস্তু নিভিয়া যায়, অপরটিতে ঐ বস্তু তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠে। প্রথমটি হইল নাইট্রোজেন এবং দ্বিতীয়টি অক্সিজেন।

মোটামুটি আমরা দেখিতে পাই বায়ুর $\frac{৪}{৫}$ অংশ নাইট্রোজেন এবং $\frac{১}{৫}$ অংশ অক্সিজেন। কিন্তু এই দুইটি পদার্থ ব্যতীত আরও কয়েকটি পদার্থ সামান্য পরিমাণে বায়ুসমুদ্রে মিশিয়া আছে।

একটি পাত্রে চুণের জল লইয়া পাত্রের মুখ খুলিয়া কয়েকদিন রাখিয়া দাও। দেখিবে চুণের জলের উপর সাদা সর পড়িয়াছে। উহা নাড়িয়া দাও, জলে দ্রব হইবে না। এই সাদা অদ্রাব্য পদার্থগুলি খড়ি-গুঁড়া জাতীয়। উহার নাম **ক্যালসিয়াম কার্বনেট** (calcium carbonate); চুণের জলে অঙ্গারাম্ল গ্যাস (carbon di-oxide) মিশাইলে উহা উৎপন্ন হয়। এই পরীক্ষায় প্রমাণ হইল যে, চুণের জলে যে সাদা সর পড়িল, তাহা অঙ্গারাম্ল গ্যাসের জন্য। কোথা হইতে এই গ্যাস আসিল? নিশ্চয়ই বায়ু হইতে।

সকলেই জান, আমরা জীবনধারণের জন্য প্রশ্বাসের সহিত বায়ু

গ্রহণ করি। বায়ুর এই অক্সিজেন রক্তের সহিত মিশিয়া শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয় এবং সেখানে উহা অঙ্গারাম্ল গ্যাসে পরিণত হয়। এই গ্যাস আবার রক্তের সহিত হৃৎপিণ্ডে আসে ও আমরা ফুসফুসের সাহায্যে নিশ্বাসের সহিত এই গ্যাস বাহির করিয়া দি। জন্তুগণ অবিরত এইরূপে বায়ুর অঙ্গারাম্ল গ্যাসের পরিমাণ বাড়াইতেছে।

আমরা রাঁধিবার জন্য কাঠ ও কয়লা পোড়াই; দীপ জ্বালিয়া রাত্রের অন্ধকার দূর করি। এখানেও কাঠ, কয়লা ও তৈল হইতে অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে মিশিতেছে। কিন্তু বিচিত্র এই যে, নানা উপায়ে অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে মিশিলেও, বায়ুর অঙ্গারাম্ল গ্যাসের কোন বৃদ্ধি দেখা যায় না; ইহার পরিমাণ ঠিকই থাকে। ইহার কারণ কি?

আমরা প্রাণধারণের জন্য যেমন বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্যাসটুকু গ্রহণ করি, বৃক্ষলতা প্রভৃতি তাহাদের শরীর পুষ্টির জন্য পাতার সাহায্যে বায়ু হইতে অঙ্গারাম্ল গ্যাস গ্রহণ করে; এবং সূর্যালোকের সাহায্যে নিজেদের জন্য অঙ্গার (carbon)টুকু রাখিয়া, অঙ্গারাম্ল গ্যাসের অক্সিজেন-টুকু বায়ুতে ফিরাইয়া দেয়। এই কারণে বায়ুর অঙ্গারাম্ল গ্যাসের সমতা রক্ষা হয়।

বায়ুতে কিছু জলীয় বাষ্পও আছে। দিবারাত্র নদী, সমুদ্র প্রভৃতি জলাশয় হইতে জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া বায়ুতে মিশিতেছে। একটি গ্লাসে খানিকটা জল লইয়া গ্লাসের বাহির দিকটা শুকনা কাপড় দিয়া মুছিয়া লও; এখন জলের মধ্যে কয়েক টুকরা বরফ ফেলিয়া দাও। দেখিবে গ্লাসের বাহিরে শিশিরবিন্দুর মত জল জমিয়া গিয়াছে। জল নিশ্চয়ই গ্লাসের মধ্য হইতে আসে নাই; বায়ু হইতে আসিয়াছে। এইভাবে সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, বায়ুতে জলীয় বাষ্পও কিছু পরিমাণে আছে।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে প্রতি ১০০ আয়তনের বায়ুতে

নাইট্রোজেনের আয়তন	...	৭৭.০৬
অক্সিজেনের ,,	...	২০.৬০
অঙ্গারাম্ল গ্যাসের ,,	...	.০৪
জলীয় বাষ্পের ,,	...	১.৪০
অন্যান্য বায়বীয় পদার্থের ,,	...	.৯০
মোট		১০০

অবশ্য স্থান বিশেষে ইহাদের পরিমাণের সামান্য ইতর বিশেষ হয়। তবে মোটামুটি পরিমাণ এইরূপ এবং এই সকল বিভিন্ন বায়বীয় পদার্থ একত্র মিশ্রণের ফলে বায়ু উৎপন্ন হইয়াছে। জলের মত বায়ু যৌগিক পদার্থ নহে, ইহা একটি মিশ্র পদার্থ। বায়ুর এই সকল বিভিন্ন উপাদান নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বায়ুসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বায়ু যে মিশ্র পদার্থ এ বিষয়ে দু'একটি কথা পরে বলা যাইবে।

পরীক্ষাগারে মারকিউরিক অক্সাইডে উত্তাপ দিলে, উহা হইতে পারদ ও অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যায় (১০৯ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। পোটাসিয়াম ক্লোরেট নামক এক প্রকার সাদা পদার্থ উত্তপ্ত করিয়া সাধারণত এই গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। পোটাসিয়াম ক্লোরেট বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া, উহার সহিত **ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড** (manganese di-oxide) নামক কৃষ্ণবর্ণ একটি পদার্থ মিশাও। এই মিশ্র পদার্থ একটি **পরীক্ষানলে** (test-tube) লইয়া, উহার মুখে একটি ছিদ্রযুক্ত কর্ক পরাও এবং ছিদ্রের মধ্যে একটি বাঁকা কাচের নল প্রবেশ করাইয়া, নলের অপর প্রান্ত একটি জলপূর্ণ পাত্রে ডুবাইয়া রাখ। এইবার বারণার (burner) বা স্পিরিট ল্যাম্পের দ্বারা **পরীক্ষা-নলটি** উত্তপ্ত কর। দেখিবে জলের মধ্য দিয়া অক্সিজেন গ্যাস বুদবুদ আকারে বাহির হইতেছে। যেখানে বুদবুদ উঠিতেছে ঐ স্থানে একটি জলপূর্ণ গ্যাস জার

উপুড় করিয়া ধর। দেখিবে জারের মধ্যে গ্যাস জমিবে ও জারের জল বাহির হইয়া আসিবে। এখন গ্যাসপূর্ণ জারটির মুখে ঢাকনি দিয়া টেবিলের উপরে বসাও। এইভাবে কয়েকটি জার অক্সিজেন গ্যাসে পূর্ণ কর।

এই গ্যাসের কোন বর্ণ নাই, কোন গন্ধ বা স্বাদ নাই এবং জলে ইহা প্রায় দ্রব হয় না।

একটি পাটকাঠি আগুনে জ্বালিয়া ফুৎকার দিয়া শিখাটি নিভাইয়া দাও এবং নিভাইয়া দিলে ঐ কাঠির মুখে যে আগুন থাকে, সেই আগুনযুক্ত কাঠিটি উপরি কথিত অক্সিজেন-পূর্ণ জারের মুখের ঢাকনি খুলিয়া উহার মধ্যে ধর। দেখিবে কাঠিটি তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিবে। এইরূপে এক টুকরা জ্বলন্ত কাঠ-কয়লা বা প্রজ্বলিত গন্ধক অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে ধরিলে, ঐ দুইটি বস্তুই তীব্র ভাবে জ্বলিয়া উঠিবে (চিত্র দেখ)।
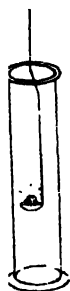
অক্সিজেন গ্যাসে দীপ্ত কাঠ-কয়লা তীব্রভাবে জ্বলিয়া উঠিল

এই সকল পরীক্ষায় প্রমাণ হয়—যে বস্তু বায়ুতে অল্প অল্প জ্বলে, অক্সিজেনে তাহা তীব্রভাবে জ্বলে।

বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্যাস খুব সহজেই পাওয়া যাইতে পারে, একথা তোমরা জান। জলপূর্ণ পাত্রে একটি বেলজার বসাইয়া, উহার মধ্যে ম্যাগনেসিয়াম, গন্ধক বা ফসফরাস প্রজ্বলিত করিলে, বায়ুর সব অক্সিজেনটুকু উক্ত পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয় এবং জারের মধ্যে পড়িয়া থাকে কেবল নাইট্রোজেন।

এই গ্যাসও অক্সিজেনের মত স্বচ্ছ, বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন। ইহা জলে দ্রব হয় না। জ্বলন্ত পাটকাঠি বা জ্বলন্ত গন্ধকটুকরা ইহার

মধ্যে ধরিলে উহা নিভিয়া যায়। অক্সিজেনের সহিত নাইট্রোজেনের পার্থক্য এইখানে।

এইবার অঙ্গারাম্ল গ্যাস বা কারবন ডাই-অক্সাইড গ্যাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

কাঠ বা কয়লা পোড়াইলে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। যদি একটি **পরীক্ষা-নলে** খানিকটা মার্বেল পাথরের গুঁড়া বা খড়ির-গুঁড়া লইয়া খুব উত্তাপ দেওয়া যায়, তবে উহা হইতে এই অঙ্গারাম্ল গ্যাস বাহির হইয়া যায় এবং পরীক্ষা-নলে পড়িয়া থাকে খানিকটা. চূণ। খড়িমাটি পোড়াইয়া বা ঘুটিঙ পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করা হয়, একথা তোমরা শুনিয়াছ। চূণ প্রস্তুতের সময়ও, অঙ্গারাম্ল· গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পরীক্ষাগারে নিম্নলিখিতভাবে অঙ্গারাম্ল গ্যাস প্রস্তুত হইয়া থাকে। উপরের দিকে দুই মুখ বিশিষ্ট একটি বোতলে কিছু মার্বেল পাথরের
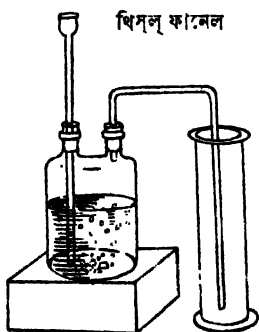
টুকরা লও। বোতলের একটি মুখে লম্বা নল বিশিষ্ট একটি **ফানেল** (thistle funnel) পরাও। ঐ ফানেলের নল যেন বোতলের তলদেশ স্পর্শ

করে। অপর মুখে একটি বাঁকা কাচের নল পরাও। এইবার ফানেলের মধ্যে কিছু জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড ঢাল। দেখিবে সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেছে। অঙ্গারাম্ল গ্যাস বোতলের মুখে যে বাঁকা কাচের নল আছে, তাহা দিয়া বাহিরে আসিতেছে। উহা সংগ্রহ করিবার জন্য একটি গ্যাস জার টেবিলের উপর সোজা করিয়া বসাও এবং বাঁকা কাচের নলটি গ্যাস জারের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও (চিত্র দেখ)। কিছুক্ষণ পরেই ঐ জার অঙ্গারাম্ল গ্যাসে পূর্ণ হইবে। এই গ্যাস বায়ু অপেক্ষা ভারি। সুতরাং জারের মধ্যে যখন বাঁকা নলটি প্রবেশ করান হইল, তখন ভারি বলিয়া অঙ্গারাম্ল গ্যাস নীচের দিকে নামিয়া গ্যাস জারটিকে পূর্ণ করিল এবং বায়ু অপেক্ষাকৃত লঘু বলিয়া ঊর্ধ্বপথে বাহিরে চলিয়া গেল।

এই অঙ্গারাম্ল গ্যাসও বর্ণহীন ও ঈষৎ গন্ধযুক্ত এবং কিছু পরিমাণে জলে দ্রব হয়। তোমরা সোডা লেমনেড পান করিয়াছ। সোডা লেমনেডের বোতলের মুখ খুলিবামাত্র এই গ্যাস বোতল হইতে বাহির হইয়া আসে। অধিক চাপ প্রয়োগে, এই গ্যাস অধিক মাত্রায় বোতলের জলে দ্রবীভূত ছিল। বোতলের মুখ খুলিবামাত্র চাপ কমিয়া যাওয়ায়, খানিকটা গ্যাস জোরে বাহির হইল।

তোমরা বুঝিতে পারিলে, যে গ্যাস জলে দ্রবীভূত হয়, বেশি চাপ প্রয়োগ করিলে উহা আরও অধিকমাত্রায় দ্রব হয়; এবং চাপ কমিলেই ঐ অতিরিক্ত অংশ জল হইতে বাহির হইয়া যায়। এক্ষেত্রে মনে রাখিবে, জলের তাপ বৃদ্ধির সহিত কঠিন পদার্থও অধিকমাত্রায় জলে দ্রব হয়, আবার জলের তাপ কমিলেই ঐ অধিক অংশটুকু জলের তলায় জমে। অবশ্য দু'এক ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। পরন্তু তাপ বৃদ্ধির সহিত জলের বায়বীয় পদার্থ দ্রব করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়।

এখন একটু পরিষ্কার চূণের জল এক জার অঙ্গারাম্ল গ্যাসের মধ্যে ঢাল। দেখিবে চূণের জল খড়িগোলা জলের মত সাদা হইয়াছে। মনে রাখিবে, অঙ্গারাম্ল গ্যাসের ইহাই বিশেষ পরীক্ষা এবং এই পরীক্ষা দ্বারা অন্যান্য গ্যাস হইতে ইহাকে পৃথক করা যায়।

একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া (নীচের চিত্র দেখ) একটি অঙ্গারাম্ল গ্যাসপূর্ণ গ্যাস জার বাতির শিখার উপর কাত করিয়া ধর। দেখিবে বাতি নিভিয়া যাইবে। অতএব প্রমাণ হইল যে অঙ্গারাম্ল গ্যাসে জ্বলন্ত শিখা নিভিয়া যায়।
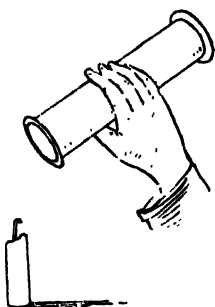
অঙ্গারাম্ল গ্যাসে প্রজ্বলিত মোমবাতির শিখা নিভিয়া গেল
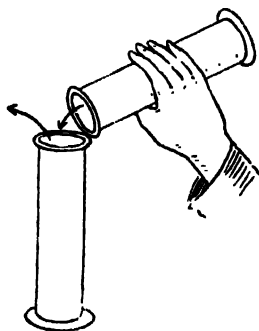
গ্যাস জারের মধ্যে অঙ্গারাম্ল গ্যাস ঢালা হইতেছে

আর একটি খালি গ্যাস জারের মুখের কাছে অঙ্গারাম্লপূর্ণ একটি জার কাত করিয়া ধর (উপরের চিত্র দেখ) এবং কিছুক্ষণ পরে ঐ খালি গ্যাস জারের মধ্যে চূণের জল দিয়া নাড়িতে থাক ; দেখিবে চূণের জল সাদা হইয়া গিয়াছে। উহাতে পূর্বে অঙ্গারাম্ল গ্যাস ছিল না, তবে আসিল কিরূপে ? নিশ্চয় অঙ্গারাম্ল গ্যাসের জার কাত করিয়া ধরার জন্য। দেখিলে, যেমন এক গ্লাস জল অপর গ্লাসে ঢালিতে হয়, ঠিক সেইভাবে

অঙ্গারাম্ল গ্যাসও পাত্রান্তর করা যায়। বায়ু অপেক্ষা ভারি বলিয়াই এইভাবে ঢালা সম্ভব হইল।

এই অঙ্গারাম্ল গ্যাস বায়ুতে থাকার জন্য পৃথিবীর ত্বকের অর্থাৎ উপরের স্তরের ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিতেছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয় কিছু কিছু বর্ণিত হইবে।

প্রশ্নমালা

(১) একটি কাচপাত্রে কিছু ম্যাগনেসিয়াম চূর্ণ পুরিয়া, পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া পাত্রটি ওজন করা হইল। উহাকে উত্তপ্ত করার পর আবার ওজন করা হইল, এইবার পাত্রের মুখ খুলিয়া তৃতীয়বার পাত্রটি ওজন করা হইল। কোন্ ক্ষেত্রে ওজনের পরিবর্তন হইবে এবং কোন্ ক্ষেত্রে হইবে না, তাহা কারণ দিয়া বুঝাইয়া দাও। (২) অক্সিজেন গ্যাস সাধারণত কিরূপে প্রস্তুত করা হয়? (৩) তোমাকে তিন জার গ্যাস দেওয়া হইল, তুমি পরীক্ষা দ্বারা কিরূপে স্থির করিবে কোন্‌টিতে অক্সিজেন, কোন্‌টিতে নাইট্রোজেন এবং কোন্‌টিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে? (৪) কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের ধর্ম কি? উহা যে বায়ু অপেক্ষা ভারি কিরূপে প্রমাণ করিবে?

হাইড্রোজেন ও জল

দুই মুখ খোলা একটি লম্বা (পর পৃষ্ঠার চিত্র) পোরসিলেন নলের (ক) মধ্যে কিছু লৌহচূর্ণ রাখিয়া উহার উভয় মুখে এক একটি সছিদ্র ছিপি লাগাইয়া দাও। ঐ পোরসিলেন নলের এক মুখের ছিদ্রে একটি কাচের নল পরাইয়া, কাচের নলের অপর প্রান্ত ছিপিবদ্ধ একটি কাচের ফ্লাস্কের (খ) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও। পোরসিলেন নলের অপর মুখের

ছিদ্রে আর একটি কাচের নল লাগাইয়া, ইহার অপর প্রান্ত এক জলপূর্ণ পাত্রে (গ) ডুবাইয়া রাখ। এখন পোরসিলেন নলটি প্রজ্বলিত উনানের (furnace) উপর বসাইয়া বেশ করিয়া উত্তপ্ত কর। এইবার ফ্লাস্কে (খ) কিছু জল লইয়া প্রজ্বলিত বুনসেন দীপ সাহায্যে জলকে বাষ্পে পরিণত কর। এই বাষ্প (steam) পোরসিলেন নলের মধ্যে অত্যুত্তপ্ত লৌহচূর্ণের সংস্পর্শে আসিয়া এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ উৎপন্ন করিবে এবং ইহা বুদ্‌বুদ আকারে জলপাত্র হইতে উঠিতে থাকিবে। নলের লৌহ আর লৌহ থাকিবে না—উহা জলীয় বাষ্পের (steam) অক্সিজেনের
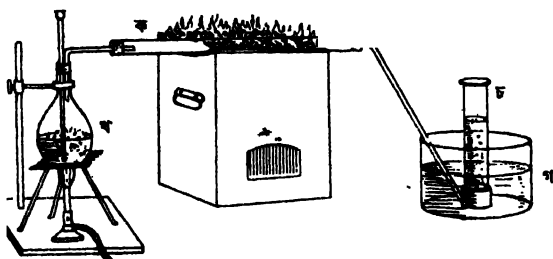
সহিত সংযুক্ত হইয়া এক প্রকার কঠিন অক্সাইডে পরিণত হইবে। জলপাত্রে বুদ্‌বুদ আকারে যে বায়বীয় পদার্থ বাহির হইতেছে, উহা সংগ্রহ করিবার জন্য একটি জলপূর্ণ গ্যাস জার (চ) জলপাত্রে উপুড় করিয়া ধর। দেখিবে, এক প্রকার বর্ণহীন স্বচ্ছ গ্যাস জারে জমিতেছে। এই গ্যাসের মধ্যে একটি প্রজ্বলিত কাঠি ধর। প্রজ্বলিত কাঠিটি নিভিয়া যাইবে, কিন্তু গ্যাস জ্বলিতে থাকিবে। এই গ্যাসই **হাইড্রোজেন**; এবং জল হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে **উদযান**ও বলা হয়।

এইবার উপরের দিকে দুই মুখ বিশিষ্ট বোতলে কিছু দস্তার টুকরা লও এবং একটি মুখে একটি **লম্বা নল বিশিষ্ট ফানেল** এবং অপর

মুখে একটি বাঁকা নল সছিদ্র কর্কে পরাইয়া দাও। ঐ ফানেলের নলটি যেন বোতলের তল স্পর্শ করে এবং প্রত্যেক মুখেই যেন কর্ক দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে (চিত্র দেখ)। এখন ফানেলের মুখ দিয়া অল্প অল্প
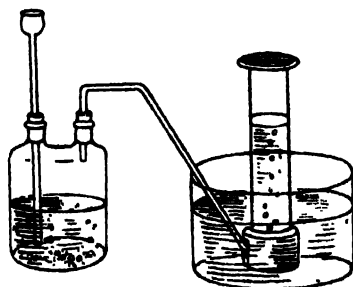
দস্তার উপর সালফিউরিক এসিড দেওয়া হইল

করিয়া জল মিশ্রিত **সালফিউরিক এসিড** ঢাল ও বাঁকা নলের মুখটি একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ডুবাইয়া রাখ। দেখিবে, বোতলের মধ্য হইতে গ্যাস আসিয়া জলে বুদবুদ সৃষ্টি করিতেছে। কয়েকটি গ্যাস জার জলে পূর্ণ করিয়া যেখানে গ্যাসের বুদবুদ উঠিতেছে, সেই স্থানে উপুড় করিয়া ধর। গ্যাস জার শীঘ্রই এই গ্যাসে পূর্ণ হইবে এবং জল নিম্ন মুখে জার হইতে নামিয়া আসিবে। জারগুলি গ্যাসে পূর্ণ হইলে, উহাদের মুখে ঢাকনি দিয়া জল হইতে তুলিয়া টেবিলের উপর বসাও।

এখন একটি জারের মধ্যে প্রজ্বলিত কাঠি ধর, দেখিবে ঐ প্রজ্বলিত কাঠির শিখাটি নিভিয়া যাইবে, কিন্তু গ্যাস জ্বলিতে থাকিবে। তবেই বুঝিলে, কাঠ, কয়লা বা তৈলের মত, এই গ্যাস দাহ্য পদার্থ এবং নাইট্রোজেন বা অঙ্গারাম্ল গ্যাসে যেমন শিখাটি নিভিয়া যায়—এক্ষেত্রেও তাই। অতএব ইহা দহনের সহায় নহে। এই গ্যাসটি কি বুঝিলে? ইহা হাইড্রোজেন গ্যাস। সালফিউরিক এসিডে দস্তা, লৌহ কিম্বা ম্যাগনেসিয়াম সংযোগ করিলে, ইহা উৎপন্ন হয়।

ইহা স্বাদহীন, গন্ধহীন ও বর্ণহীন এবং জলে অতি সামান্য মাত্রায় দ্রব হয়। যতপ্রকার বায়বীয় পদার্থ আমাদের জানা আছে, তন্মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা লঘু এবং লঘু বলিয়াই বেলুন, হাইড্রোজেন গ্যাসে পূর্ণ করিলে, আকাশে উড়িয়া যায়।

বায়ুতে এই গ্যাস জ্বলে অর্থাৎ জ্বলিবার সময় এই গ্যাস হইল দাহ্য বস্তু এবং বায়ুর অক্সিজেন হইল দহনের সহায়। দহনের সময় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উভয়ে মিলিত হইয়া উৎপাদন করে জল। বায়ুতে হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বলিবার সময় তাপ উৎপন্ন হয় (রাসায়নিক ক্রিয়ার একটি লক্ষণ)। কিন্তু যদি অক্সিজেন গ্যাসের মধ্যে হাইড্রোজেন জ্বালান হয়—তাহাতে এত তাপ উদ্ভূত হয় যে, সেই তাপে লোহা ও অন্যান্য ধাতু অতি সহজেই গলিয়া যায়।

এখন একটি শক্ত বোতল (সোডার বোতল হইলেই ভাল হয়) জলপূর্ণ করিয়া উহার ⅓ অংশ অক্সিজেন ও অপর ⅔ অংশ হাইড্রোজেন
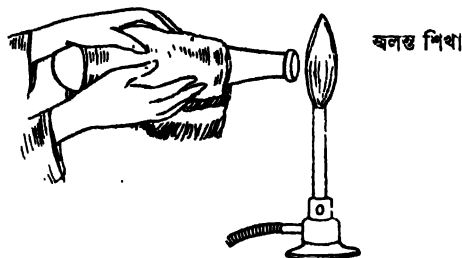
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ২ : ১ অনুপাতে পুরিয়া বোতলটি শিখার সম্মুখে ধরায়, জোরে শব্দ হইল

দ্বারা পূর্ণ কর। এখন বোতলের মুখে ছিপি দিয়া, উহাকে জল হইতে তোল এবং ছিপিটি খুলিয়া বোতলের মুখ প্রজ্বলিত শিখার সম্মুখে ধর, (উপরের চিত্র দেখ) তৎক্ষণাৎ খুব জোরে শব্দ হইবে। হাইড্রোজেন

ও অক্সিজেন ২:১ আয়তনে সংযুক্ত হইয়া এইরূপ শব্দ হইল এবং কিছু জলও হইল, তবে জলের পরিমাণ এত সামান্য যে তাহা লক্ষ্য হইবে না।

জল

বায়ু যেমন আমাদের জীবনধারণের জন্য অতি আবশ্যকীয় বস্তু, জলও সেইরূপ। আমাদের পৃথিবীর উপরিভাগের প্রায় $\frac{৩}{৪}$ অংশ জল দ্বারা বেষ্টিত।

প্রকৃতি আমাদিগকে নানা উপায়ে জল দান করিতেছেন। সমুদ্রের জল সূর্যের তাপে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়, এই জলীয় বাষ্প লঘু বলিয়া বায়ুর উচ্চ স্তরে উঠে। সেখানে শৈত্যের প্রভাবে জলীয় বাষ্প মেঘে পরিণত হয়—মেঘ বৃষ্টি দান করিয়া তৃষিত পৃথিবীকে শীতল করে; মাটি বৃষ্টিতে সিক্ত হইয়া শস্য উৎপাদনের উপযোগী হয় এবং শস্য আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। মেঘ হইতে যে বৃষ্টিধারা নামে, তাহার কতকাংশ মাটি শোষণ করে, অবশিষ্টাংশ মাটির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া পুষ্করিণী, নদ-নদীকে জলপূর্ণ করে। নদনদী আবার সমুদ্রের জলের পরিমাণ বাড়াইয়া তোলে। বৃষ্টির যে অংশ মাটির নীচে চলিয়া যায়, তাহা মাটির নীচের কোন কঠিন স্তরে বাধা পাইয়া, ঘুরিতে ফিরিতে প্রস্রবণের আকারে আবার ধরার পৃষ্ঠে দেখা দেয়। আমরা কূপ হইতে যে জল পাই, তাহাও সেই জল।

আমরা প্রকৃতির ভাণ্ডারে এই যে নানা উপায়ে জল পাই, তাহার মধ্যে বৃষ্টির জল সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার। ইহাতে দ্রবীভূত ও ভাসমান কঠিন পদার্থ নাই বলিলেই চলে; তবে কিছু কিছু বায়বীয় পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। বায়ুতে অঙ্গারাম্ল গ্যাস থাকার জন্য বৃষ্টির জলেও এই গ্যাস কিছু পরিমাণে দ্রব থাকে। বৃষ্টির জল এই অঙ্গারাম্ল গ্যাস বহন করিয়া মাটি, বালি, প্রস্তর, খড়িমাটি ও মার্বেল প্রস্তরের উপর দিয়া যাইতে

যাইতে অবশেষে নদীতে পড়ে এবং জলের সহিত মাটি, বালি প্রভৃতি গিয়া নদীর জলকে কর্দমাক্ত করে। সেইজন্য বর্ষাকালে পুষ্করিণী ও নদীর জল এত ময়লা হয়। এইগুলিই হইল নদী প্রভৃতি জলাশয়ের জলের ভাসমান ময়লা। আবার জলে অনেক বস্তু দ্রব হয় বলিয়া, কতকগুলি কঠিন দ্রাব্য পদার্থও নদীর জলে মিশিয়া থাকে। আর একটি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে খড়িমাটি বা মার্বেল-প্রস্তর জলে দ্রব হয় না, তাহাও জলে অঙ্গারাম্ল গ্যাস থাকার জন্য ধীরে ধীরে দ্রব হয়। এইরূপে জল ও অঙ্গারাম্ল গ্যাসের সাহায্যে কঠিন পাষাণ স্তূপও ধীরে ধীরে দ্রব হইয়া ধরাপৃষ্ঠের নিয়তই পরিবর্তন করিতেছে।

খড়িমাটি বা মার্বেলকে ইংরেজিতে বলে **কেলসিয়াম কার্বনেট**। জলে ইহা দ্রব নহে, কিন্তু অঙ্গারাম্ল গ্যাসের উপস্থিতিতে ইহাও জলে দ্রব হয়। কেলসিয়াম কার্বনেট হইতে উৎপন্ন এই দ্রব পদার্থকে বলা হয় **কেলসিয়াম বাই-কার্বনেট** (Calcium bi-carbonate)। ইহা জলে দ্রব থাকিলে জল পরিস্রুত জলের মতই স্বচ্ছ দেখায়; কিন্তু এই জল ফুটাইলে অঙ্গারাম্ল গ্যাস বাহির হইয়া যায়, তজ্জন্য জল হইতে পুনরায় সাদা অদ্রাব্য কেলসিয়াম কার্বনেট (Calcium carbonate) পৃথক হয়। তোমরা হয়ত দেখিয়া থাকিবে, কূয়ার জল ফুটাইয়া থিতাইতে দিলে, পাত্রের তলায় চূণের মত এক প্রকার পদার্থ জমিয়া যায়—এই পদার্থই হইল কেলসিয়াম কার্বনেট। জল ফুটাইবার পূর্বে ইহা কেলসিয়াম বাই-কার্বনেট আকারে জলে দ্রবীভূত ছিল।

প্রস্রবণের জল, খনিজ জল ও বাতান্বিত জল

প্রস্রবণের জলে কোনরূপ ভাসমান ময়লা থাকে না; কারণ মাটির বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় জল আপনা হইতেই পরিস্রুত হইয়া আসে। কিন্তু এই জলে নানাবিধ বায়বীয় পদার্থ ও কঠিন পদার্থ

দ্রব অবস্থায় থাকিতে পারে। অঙ্গারাম্ল গ্যাস, সোডিয়াম বাই-কার্বনেট, কেলসিয়াম বাই-কার্বনেট প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থ প্রস্রবণের জলে গলিত থাকে। কোন কোন প্রস্রবণের জলে আবার রেডিয়াম জাতীয় (Radio-active substances) পদার্থ বর্তমান থাকে। এই সকল পদার্থ জলে দ্রব থাকার জন্য, ঐ সকল প্রস্রবণের জল, স্নান ও পান করার পক্ষে উপকারী।

প্রস্রবণের জলে যদি অধিক মাত্রায় দ্রব পদার্থ থাকে, তবে ঐ জলকে **খনিজ জল** (mineral water) বলে। এইরূপ প্রস্রবণের জল বেশ করিয়া ফুটাইয়া উহার সহিত সামান্য লবণ, সোডিয়াম বাই-কার্বনেট ও অন্যান্য পদার্থ মিশাইয়া পরিষ্কার বোতলের মধ্যে পোরা হয় এবং অধিক চাপ প্রয়োগে অঙ্গারাম্ল গ্যাস ঐ জলে দ্রবীভূত করিয়া বোতলের মুখ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করা হয়। অঙ্গারাম্ল গ্যাস দ্রবীভূত থাকিলে কঠিন পদার্থগুলিও জলে দ্রব থাকে। সোডার জল বা লেমনেড জল এই জাতীয়। ইহাকে বলা হয় **বাতান্বিত জল** (aerated water)। সোডার বোতল খুলিবার সময় বুঝিতে পার, কিরূপ চাপ প্রয়োগে অঙ্গারাম্ল গ্যাস জলে দ্রবীভূত ছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে নদীর জল সমুদ্রে পড়ে। এই কারণে সমুদ্রের জলে দ্রব পদার্থের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশি। আবার এই দ্রব পদার্থের মধ্যে লবণের অংশই অধিক। এজন্য সমুদ্রের জল অত্যন্ত লবণাক্ত এবং পানের অনুপযোগী। সমুদ্রের জল পানীয়রূপে ব্যবহার করিতে হইলে, পাতন প্রক্রিয়া দ্বারা ইহা হইতে সমস্ত দ্রব পদার্থ পৃথক করিয়া ফেলিতে হয়। আবার দ্রব পদার্থ অধিক মাত্রায় থাকার জন্য, সাধারণ জল অপেক্ষা সমুদ্রের জলের ঘনত্ব বেশি এবং এইজন্য নদীতে সাঁতার দেওয়া অপেক্ষা সমুদ্রে সাঁতার দেওয়া সহজ কারণ ঘন জল দেহকে অনেকটা ভাসাইয়া রাখে।

কঠিন ও কোমল জল (Hard and Soft Water)

জলে সাবান ঘষিলে ফেনা হয়, একথা তোমরা সকলেই জান। কোন কোন কূপের বা প্রস্রবণের জলে সাবান ঘষিলে সহজে ফেনা হয় না। যে জলে সাবান ব্যবহার করিলে সহজে ফেনা হয় না, তাহাকে **কঠিন জল** (hard water) বলে এবং যে জলে সাবান ব্যবহার করিলে সহজেই ফেনা হয়, তাহাকে **কোমল জল** (soft water) বলে।

পূর্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি, বৃষ্টির জলে অঙ্গারাম্ল গ্যাস আছে বলিয়া মার্বেল বা খড়িমাটি ঐ জলে দ্রব হয়। দ্রবীভূত অবস্থায় এই মার্বেল বা খড়িমাটি কেলসিয়াম বাই-কার্বনেটে পরিবর্তিত হয়; সেইরূপ অঙ্গারাম্ল গ্যাসের সাহায্যে অদ্রাব্য ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট (Magnesium carbonate) নামক পদার্থও, জলে দ্রব হইয়া ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট (Magnesium bi-carbonate) রূপে জলে গলিয়া যায়। এই সকল পদার্থ ব্যতীত চুণঘটিত এবং ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত অন্যান্য বস্তুও নদীর জলে বা কূপের ও প্রস্রবণের জলে বর্তমান থাকে, যথা—**জিপসাম** অর্থাৎ **কেলসিয়াম সালফেট** (Calcium Sulphate), **কেলসিয়াম ক্লোরাইড** (Calcium chloride) প্রভৃতি। জলে সাবান ঘষিলে যদি ফেনা না হয়, তবে বুঝিতে হইবে শেষোক্ত পদার্থ সকল অল্প বা অধিক মাত্রায় জলে দ্রবীভূত আছে। কেলসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত পদার্থগুলি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে, সাবানের সহিত সংযুক্ত হইয়া, এক প্রকার অদ্রাব্য পদার্থ উৎপন্ন করে; ফলে এই হয় যে, জলের মধ্যে সাবান থাকিতে পায় না। সাবানের সবটুকুই কতকগুলি অদ্রাব্য পদার্থ গঠন করিয়া জল হইতে পৃথক হইয়া যায়। সুতরাং জলে সাবানই যদি না রহিল, ফেনা হইবে কিরূপে?

কোন কোন জল ফুটাইলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ জলে চুণের মত এক প্রকার পদার্থ জমিয়া যায়। এই সাদা কঠিন পদার্থ হইল কেলসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট। অঙ্গারাম্ল গ্যাসের সাহায্যে ইহা বাই-কার্বনেট রূপে (bi-carbonate of calcium and bi-carbonate of magnesium) জলে গলিয়া ছিল। জল ফুটাইয়া অঙ্গারাম্ল গ্যাস দূরীভূত হইল এবং এই বাই-কার্বনেটগুলিও কার্বনেটরূপে জল হইতে পৃথক হইল। এখন ঐ জল পরিস্রুত করিলে, উহাতে আর বাই-কার্বনেট থাকিবে না। এই কেলসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেট জলে গলিয়া থাকিলে, ঐ জলে সহজে ফেনা হয় না; কিন্তু ঐ জল ফুটাইলে উক্ত পদার্থগুলি জল হইতে পৃথক হইয়া পড়ে; এবং পৃথক হওয়ার পর সাবান ব্যবহার করিলে, সেই জলে সহজেই ফেনা হয়। অতএব পূর্বে যে জল কঠিন ছিল, এখন তাহা কোমল হইল। এইরূপ সহজ উপায়েই যদি জলের কাঠিন্য দূর করা যায়, তাহা হইলে ঐ কাঠিন্যকে অস্থায়ী কাঠিন্য (temporary hardness) বলে। জলের অস্থায়ী কাঠিন্যের কারণ —উহাতে কেলসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম বাই-কার্বনেটের উপস্থিতি।

কিন্তু জলে কেলসিয়াম সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট বা কেলসিয়াম ক্লোরাইড দ্রব থাকিলে, জলের কাঠিন্য সহজে দূর করা যায় না। ইহাকে বলা হয় জলের স্থায়ী কাঠিন্য (permanent hardness)। স্থায়ী কাঠিন্য দূর করিতে হইলে, জলের সহিত কিছু সোডা মিশাইতে হয়। কেলসিয়াম সালফেট বা কেলসিয়াম ক্লোরাইড সোডার সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে, অদ্রাব্য কঠিন বস্তুরূপে জলের তলায় জমিয়া যায়। এখন এই জল পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায় কোমল জলে পরিণত হইবে।

কাপড় ধৌত করিবার জন্য যে জল ব্যবহার করা হয়, তাহা কোমল হওয়া আবশ্যক। নতুবা কঠিন জল ব্যবহারে ধৌত কার্যে অধিক সাবান লাগে।

জলের গঠন

তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি জল হইতে হাইড্রোজেন পাওয়া যায়; অতএব ইহা জলের একটি উপাদান। তোমরা আরও শিখিয়াছ হাইড্রোজেন গ্যাস জ্বালাইলে, ইহা বায়ুর অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া, জল উৎপাদন করে। অতএব জলের অপর একটি উপাদান অক্সিজেন। এখন ইহারা কি অনুপাতে জলে বর্তমান আছে, তাহা তোমাদিগকে বলিব।

বড় একটি ফানেলের নলের দিকটা কাটিয়া ফেলিলে যেরূপ দেখায়, সেইরূপ একটি পাত্র লইতে হইবে। ইহার সরু দিকটায় একটি
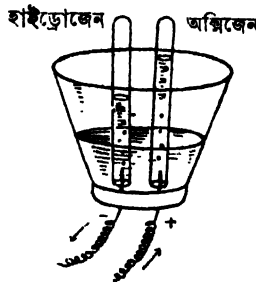
জলের তড়িৎবিশ্লেষণ

কর্ক দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করিয়া, কর্কের মধ্যে দুইটি ছিদ্র করিয়া উহাতে দুইটি প্লাটিনামের পাত প্রবেশ করাইতে হইবে। প্লাটিনামের পাত দু'টির বাহিরের দিকের অগ্রভাগ দুইটিকে দু'টি তামার তারের সহিত যোগ করিতে হইবে; এবং কর্কে সরু ছিদ্র থাকার জন্য ভিতরের দিকে মোম গালাইয়া ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে। এইরূপে **ভলটামিটার** প্রস্তুত হইল (চিত্র দেখ)।

এই পাত্র প্রস্তুত করিয়া উহাতে কিছু জল ঢাল। বিশুদ্ধ জলের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চলে না। সেইজন্য এই জলে দু' চার ফোঁটা

সালফিউরিক এসিড দাও এবং প্লাটিনামের পাত দু'টির উপর দু'টি সম আয়তনের পরীক্ষা-নল জলপূর্ণ করিয়া উপুড় করিয়া বসাও। এখন বাহিরের তামার তার দুইটি, ব্যাটারি বা তড়িৎকোষের (cell) **পজিটিভমেরু** (+) ও **নেগেটিভমেরুর** (−) সহিত সংযুক্ত কর। দেখিবে সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক প্লাটিনামের পাতের গায়ে গ্যাস বুদবুদ আকারে উঠিয়া পরীক্ষা-নলে জমিতেছে। এইভাবে কিছুক্ষণ তড়িৎ-প্রবাহ চলিলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক পরীক্ষা-নলে কিছু কিছু গ্যাস জমিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক গ্যাসের আয়তন সমান নহে। একটির আয়তন অপরটির দ্বিগুণ। যাহার আয়তন বেশি, তাহা হাইড্রোজেন এবং যাহার আয়তন কম, তাহাই অক্সিজেন। তবেই দেখা গেল, জলকে **তড়িৎবিশ্লেষণ** (Electrolysis) করিলে, উহা হইতে দুইটি গ্যাস পাওয়া যায় ; একটি হাইড্রোজেন এবং অপরটি অক্সিজেন। আরও দেখা গেল, হাইড্রোজেনের আয়তন অক্সিজেনের দ্বিগুণ। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই দু'টি গ্যাস জল হইতে আসিয়াছে, না যে দু'ফোঁটা এসিড দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে আসিয়াছে ? সহজেই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, যতটুকু এসিড জলে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সবটুকুই জলে বিদ্যমান আছে ; উহার কিছুই ব্যয় হয় নাই। তবে ইহা জলের তড়িৎবিশ্লেষণ কার্যে সাহায্য করে, এইমাত্র।

প্রশ্নমালা

(১) কিরূপে হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করা হয় ? ইহার ধর্ম বর্ণনা কর। ইহা যে জলের একটি উপাদান, কিরূপে প্রমাণ করিবে ?

(২) আমরা প্রকৃতির ভাণ্ডারে কি কি উপায়ে জল পাইয়া থাকি, এবং কোন্ কোন্ জলে কিরূপ ময়লা থাকে বল।

(৩) তড়িৎবিশ্লেষণ কাহাকে বলে? জলে যে ২ ভাগ হাইড্রোজেন ও ১ ভাগ অক্সিজেন, কি উপায়ে প্রমাণ করিবে?

(৪) জলে অঙ্গারাম্ল গ্যাস দ্রব থাকিলে, উহা মার্বেলপ্রস্তর দ্রব করিতে পারে—ইহার কারণ কি? মার্বেল দ্রব করিয়া, ঐ জল ফুটাইলে কি হয়?

(৫) মার্বেলপ্রস্তর উত্তপ্ত করিলে, উহা হইতে কোন্ গ্যাস উৎপন্ন হয়? সেই গ্যাস বায়ুতে আছে কি? চূণের জলে সেই গ্যাস দ্রব করিলে কি হয়?

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন; যৌগিক পদার্থ

(Physical and Chemical Change; Chemical Compound)

একখণ্ড লৌহ আগুনে উত্তপ্ত করিলে লাল হইয়া যায় এবং আরও উত্তপ্ত করিলে নরম হয়, কিন্তু আবার শীতল হইলে যে লৌহ সেই লৌহই থাকে। তবেই শীতল লৌহে ও উত্তপ্ত লৌহে বিশেষ পার্থক্য নাই—দুইই এক পদার্থ, তবে কোনটিতে তাপের মাত্রা কম, কোনটিতে বেশি। একখণ্ড বরফ হাতে লইয়া দেখ, উহা সাদা কঠিন পদার্থ; উত্তাপ দিলে উহা জলে পরিণত হয়, আরও উত্তাপ দিলে বায়বীয় আকার ধারণ করে। এখন সেই বাষ্পকে পুনরায় জলে কিংবা বরফে পরিণত করা যায়। বরফে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন আছে, জলেও তাই এবং বাষ্পেও তাই। তবে

আমরা জলকে যে তিন অবস্থায় দেখিতে পাই—ঐ বিভিন্ন অবস্থার মূল হইতেছে তাপের তারতম্য ; অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে তাপের মাত্রা কম বেশি বলিয়া, ইহারা তিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং জলের এই তিন প্রকার পরিবর্তন বাহ্যিক।

একখণ্ড লৌহের উপর চুম্বক ঘষিলে, লৌহও চুম্বকের শক্তি প্রাপ্ত হয়। এখানেও লৌহের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না ; উহা পূর্বের মত শক্ত ও উজ্জ্বল থাকে এবং উহার বর্ণেরও কোন পার্থক্য ঘটে না। উহার উপর জলমিশ্রিত সালফিউরিক এসিড দিলে, হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় এবং উত্তাপে নরম করিয়া ঐ লৌহ হইতে ছুরি, কাটারি প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু এই লৌহ জলবায়ুতে কিছুদিন রাখিয়া দাও ; উহার উপর লাল গুঁড়া গুঁড়া মরিচা পড়িবে ; এই মরিচা কিছু দিয়া ঘষিয়া পৃথক করিতে পার। দেখিবে, ইহা লৌহের মত শক্ত ও উজ্জ্বল নহে এবং ইহার বর্ণ লৌহ হইতে পৃথক। মরিচার মধ্যে লৌহ আছে সত্য, কিন্তু লৌহ ও মরিচা কি একই বস্তু ? মরিচা উত্তপ্ত হইলে শীঘ্র নরম হয় না এবং ছুরি কাটারিও ইহা হইতে প্রস্তুত করা যায় না এবং মরিচার উপর সালফিউরিক এসিড দিলে, হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় না। তবেই বুঝিলে, মরিচা ধরার পর লৌহের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে; লৌহের যে গুণাগুণ ছিল—মরিচার গুণাগুণ তাহা হইতে অনেক পৃথক। সুতরাং লৌহের এই পরিবর্তন আভ্যন্তরিক।

আবার দেখ এক টুকরা কাগজ আগুনে ধরিলে, উহা পুড়িয়া কাল হইয়া যায়। এখন এই কাল পদার্থ হইতে কাগজ ফিরিয়া পাওয়া যায় কি ? নিশ্চয়ই না। আগুনে ধরিলে কাগজ আর কাগজ থাকে না, উহা কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গারে পরিণত হয়। কিন্তু একখণ্ড লৌহ আগুনে গালাইলেও লৌহ লৌহই থাকে। এখানে কাগজের পরিবর্তন আভ্যন্তরিক—বাহ্যিক নহে।

মোম উত্তপ্ত করিলে গলিয়া যায়, শীতল করিলে আবার কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মোমবাতি জ্বালাইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, উহা হইতে অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। প্রথম ক্ষেত্রে মোমের পরিবর্তন বাহ্যিক, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মোমের পরিবর্তন আভ্যন্তরিক—কারণ জ্বালানর পর মোম যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইতে উহাকে মোমের অবস্থায় ফিরান সহজ নয়।

আবার দেখ জল, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ ও জল, একই বস্তু নহে। জলের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ দিলে, জল ভাঙ্গিয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে জলের যে পরিবর্তন ঘটিল, তাহা আভ্যন্তরিক পরিবর্তন—কারণ জলের ধর্ম, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

সুতরাং যে পরিবর্তনের ফলে কোন পদার্থের আমূল বা আভ্যন্তরিক পরিবর্তন ঘটে, ও সেই পরিবর্তনের ফলে, পদার্থের গুণাগুণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া যায়, তাহাকে বলে **রাসায়নিক পরিবর্তন** (chemical change)। আর যে পরিবর্তন ক্ষণিক এবং যে পরিবর্তনে পদার্থের গুণাগুণের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না, এবং যে পরিবর্তনে রূপান্তরিত পদার্থটি সহজেই পূর্বের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বলে **বাহ্যিক** বা **ভৌতিক পরিবর্তন** (physical change)।

লৌহে মরিচা ধরা, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন জলে পরিণত হওয়া, কাঠ কিম্বা কাগজ জ্বলিয়া অঙ্গার অথবা অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হওয়া— এইগুলি রাসায়নিক পরিবর্তনের ফল। শক্ত লৌহকে তরল করা, বা জলকে বরফ ও বাষ্পে পরিণত করা—এইগুলি পদার্থের বাহ্যিক বা ভৌতিক পরিবর্তনের ফল।

মিশ্র ও যৌগিক পদার্থের পার্থক্য

কিছু লৌহচূর্ণ ও গন্ধকচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিলে দেখা যাইবে—

(ক) মিশ্রিত পদার্থের বর্ণ—লৌহ ও গন্ধকের বর্ণের মাঝামাঝি।

(খ) লেন্স (Lens) দিয়া মিশ্র পদার্থটির মধ্যে দেখা যাইবে, লৌহের গুঁড়া ও গন্ধকের গুঁড়া পাশাপাশি আছে।

(গ) উহার উপর একটি চুম্বক স্পর্শ করিলে, লৌহচূর্ণ চুম্বকে উঠিয়া আসিবে এবং গন্ধক নীচে পড়িয়া থাকিবে।

(ঘ) একটি পরীক্ষা-নলে ঐ মিশ্র পদার্থ রাখিয়া, কার্বন ডাই-সাল্‌ফাইড (carbon di-sulphide) নামক তরল পদার্থ দিয়া নাড়িলে, গন্ধক সেই তরল পদার্থে দ্রব হইবে, লৌহ দ্রব হইবে না এবং পরিস্রাবণ ক্রিয়ায় লৌহচূর্ণ গন্ধক-দ্রাবণ হইতে পৃথক করা যাইবে।

(ঙ) একটি পরীক্ষা-নলে সেই মিশ্র পদার্থ লইয়া, উহাতে জলমিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিলে, হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হইবে এবং ক্রমে লৌহ এসিডের সহিত মিলিয়া যাইবে, কিন্তু গন্ধক তলায় পড়িয়া থাকিবে।

তোমরা জান চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, কিন্তু গন্ধককে আকর্ষণ করে না, কার্বন ডাই-সালফাইডে গন্ধক দ্রব হয়, লৌহ হয় না এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিডে লৌহ দিলে, হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় ও লৌহ এসিডে দ্রব হয়, কিন্তু গন্ধকের কোন পরিবর্তন হয় না। এক্ষেত্রে দেখিলে, লৌহ ও গন্ধকের মিশ্রণে প্রত্যেক পদার্থটির নিজ নিজ ধর্ম বর্তমান আছে।

মিশ্র পদার্থে প্রত্যেক উপাদানের ধর্মের পরিবর্তন হয় না, একটি অপরটি হইতে পৃথক করা যায় এবং ঐ সকল উপাদান যে কোন অনুপাতে মিশিয়া থাকিতে পারে।

এখন দেখা যাউক লৌহ ও গন্ধকের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ (chemical union) ঘটাইলে, ঐ যৌগিক পদার্থে প্রত্যেক উপাদানের ধর্ম বজায় থাকে কি না।

গন্ধক ও লৌহের মিশ্র পদার্থটি একটি পরীক্ষা-নলে লইয়া খুব উত্তপ্ত কর; পরে পরীক্ষা-নলটি ভাঙ্গিয়া ভিতরের পদার্থটি বাহির কর।

(ক) এখন দেখা যাইবে, এই পদার্থটির বর্ণ কাল হইয়াছে এবং উহা লৌহ ও গন্ধকের বর্ণের মাঝামাঝি নয়।

(খ) লেন্স (Lens) সাহায্যে লৌহ ও গন্ধকের পার্থক্য চিনিবার উপায় নাই; সবটাই একই পদার্থ বলিয়া মনে হইবে।

(গ) চুম্বক দ্বারা এখন লৌহ-চূর্ণ আকৃষ্ট হইবে না।

(ঘ) কার্বন ডাই-সালফাইডে গন্ধক দ্রব হইবে না।

(ঙ) ঐ পদার্থের উপর হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিলে, অতি দুর্গন্ধ এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ উদ্ভূত হইবে—ঐ বায়বীয় পদার্থ নিশ্চয়ই হাইড্রোজেন নয়, কারণ হাইড্রোজেন গন্ধহীন; এবং অধিক এসিড দিলে দেখিবে, পদার্থের সবটাই দ্রব হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং এক্ষেত্রে ইহা আর লৌহ ও গন্ধকের মিশ্রণ নহে। উত্তাপ করার ফলে, লৌহ ও গন্ধক মিলিত হইয়া এমন পদার্থ হইয়াছে, যাহাতে লৌহ বা গন্ধকের ধর্ম নাই এবং যাহা বিভিন্ন ধর্ম পাইয়াছে। যৌগিক পদার্থের ধর্ম, উহার উপাদানের ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

তবে বুঝিলে, যৌগিক পদার্থের ধর্ম উহার উপাদানের ধর্ম হইতে পৃথক। উহার উপাদানগুলি সহজে পৃথক করা যায় না। দুই বা ততোধিক পদার্থ মিলিত হইয়া যৌগিক পদার্থ গঠনের সময়, তাপের পরিবর্তন হয়। অঙ্গার বা তৈল জ্বলিবার সময়, অঙ্গার অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয় এবং এই সময়ে যথেষ্ট তাপ উদ্ভূত হয়, একথা

সকলেই জান। সেইরূপ হাইড্রোজেন গ্যাস অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া জল গঠন করিবার সময়ও, তাপ উদ্ভূত হইয়া থাকে।

আরও এক কথা স্মরণ রাখিবে যে, যৌগিক পদার্থে উহার উপাদানগুলি এক নির্দিষ্ট অনুপাতে বর্তমান থাকে। পৃথিবীতে নানা উপায়ে জল পাইয়া থাকি ; যদি এই সকল জল পরীক্ষা করা যায় তবে দেখা যাইবে, উহাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের আয়তনের অনুপাত ২ : ১। এই অনুপাতের কোন পরিবর্তন ঘটে না। যদি সম আয়তনের হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস হইতে জল প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যে আয়তনের অক্সিজেন লওয়া হইয়াছিল তাহার অর্ধেক পড়িয়া আছে। সেইরূপ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে, উপরে বর্ণিত লৌহ ও গন্ধকের যৌগিক পদার্থে লৌহ ও গন্ধক ৭ : ৪ অনুপাতে মিলিত হইয়াছে।

এখন বায়ু যৌগিক পদার্থ, কি মিশ্র পদার্থ, এ বিষয়ে তোমাদিগকে দু'এক কথা বলিব।

যৌগিক পদার্থে উহার উপাদানগুলি এক নির্দিষ্ট অনুপাতে থাকে ইহাই নিয়ম, এবং মিশ্র পদার্থে উহার উপাদানগুলি যে কোন অনুপাতে থাকিতে পারে। বায়ুতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত যদিও মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে একই—কিন্তু সূক্ষ্ম বিচার করিলে দেখা যায়, স্থান বিশেষে ঐ দুইটি গ্যাসের অনুপাতের সামান্য কমবেশি হইয়া থাকে। আবার বায়ুর ধর্ম, অক্সিজেনের ও নাইট্রোজেনের ধর্মের অনেকটা মাঝামাঝি। এই দু'টি গ্যাসের কোন গন্ধ নাই, বায়ুরও গন্ধ নাই। কোন দাহ্য বস্তু অক্সিজেনে তীব্রভাবে জ্বলে, নাইট্রোজেনে একেবারেই জ্বলে না ; কিন্তু বায়ুতে ঐ দাহ্য বস্তু সাধারণভাবে জ্বলে। আবার বায়ুর উপাদানগুলি অতি সহজেই পৃথক করা যায়। সুতরাং বুঝিতে পারিলে, বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ।

প্রশ্নমালা

(১) যৌগিক পদার্থ কাহাকে বলে? মিশ্র পদার্থের সহিত ইহার পার্থক্য কি? উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

(২) জল যৌগিক পদার্থ এবং বায়ু মিশ্র পদার্থ, তাহা কি উপায়ে প্রমাণ করিতে পার?

(৩) রাসায়নিক পরিবর্তনে বস্তুর কি প্রকার পরিবর্তন ঘটে?

(৪) নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোন্‌গুলিতে রাসায়নিক পরিবর্তন ও কোন্‌গুলিতে ভৌতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দাও :—

(ক) চিনি জলে দ্রব করা হইল।

(খ) জলকে শৈত্য প্রভাবে বরফে পরিণত করা হইল।

(গ) একখণ্ড কাঠ আগুনে রাখা হইল, পরে উহা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল।

(ঘ) লৌহ ভিজা বায়ুতে রাখিয়া দিয়া দেখা গেল, উহার উপর এক প্রকার লাল পদার্থ জমিয়াছে।

(ঙ) সোডিয়াম ধাতু জলে দেওয়া হইল।

(চ) চূণের জলে অঙ্গারাম্ল গ্যাস যোগ করা হইল।

জ্যোতির্বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

গ্রহ ও নক্ষত্র (Planets and Stars)

রাত্রিকালে নির্মল নির্মেঘ আকাশের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিবে, অসংখ্য উজ্জ্বল আলোকবিন্দুতে আকাশ ছাইয়া রহিয়াছে। ইহাদের কতকগুলি উজ্জ্বল—যেন দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। কতকগুলি কম উজ্জ্বল—যেন মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। কতকগুলি অত্যন্ত ম্লান। তোমার চোখের তেজ খুব বেশি হইলেই কেবল শেষের গুলি দেখিতে পাইবে। ভাল করিয়া যদি লক্ষ্য কর, দেখিবে, ইহাদের রঙ সবগুলির আবার একরকম নহে। কতকগুলি হলদে, কতকগুলি লাল, আবার কতকগুলি একেবারে সাদা। আকাশের আর একদিকে দেখ, কতকগুলি আলোকবিন্দু মিশিয়া যেন মালা গাঁথা হইয়াছে। অন্যদিকে তাকাও, এইরূপ অসংখ্য আলোকবিন্দু মিলিয়া একত্রে এক বিরাট জটলা পাকাইয়াছে। আবার অন্যদিকে তাকাইলে হয়ত দেখিবে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকবিন্দু মিলিয়া আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একটি সাদা পথের সৃষ্টি করিয়াছে। এই শেষোক্ত পথকে **ছায়াপথ** (Galaxy) বলে।

এই যে অসংখ্য আলোকবিন্দু, ইহাদিগকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) **গ্রহ** ও (২) **নক্ষত্র**। আপাত দৃষ্টিতে নক্ষত্রগুলি দপ্ দপ্, বা মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলে—কিন্তু গ্রহগণের আলো স্থির, অচপল।

এত যে নক্ষত্র, তোমরা বোধ করি মনে কর ইহাদের গণিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু পণ্ডিতেরা সত্যই গণিয়াছেন। খালি চোখে তাঁহারা গণিয়াছেন ছয় হাজার নক্ষত্র। তোমরা সবাই জান—অত্যন্ত ছোট জিনিষ আমরা কিছু দূর হইতে দেখিতে পাই না। আবার খুব বড় জিনিষও যদি দূরে থাকে, তাহাকে অপেক্ষাকৃত ছোট দেখায়। যতদূরে থাকিবে, তাহাকে তত ছোট দেখাইবে, যদি অত্যন্ত দূরে থাকে আমরা দেখিতেই পাই না। নক্ষত্রগুলি আকারে অত্যন্ত বড়, তবে অত্যন্ত দূরে আছে বলিয়া অত ছোট দেখায়। অনেকগুলি এতদূরে আছে যে, তাহাদের খালি চোখে দেখাই যায় না। তাহাদের দেখিতে গেলে ফটোগ্রাফীর ও দূরবিনের সাহায্য লইতে হয়। ইহাদের সাহায্যে প্রায় চল্লিশ কোটি নক্ষত্র দেখা যায়।

গ্রামের বাহিরে উন্মুক্ত মাঠে যদি কোনও দিন খেলিতে যাও, লক্ষ্য করিয়া দেখিবে তুমি গ্রামের যে দিকে দাঁড়াইয়া আছ, সেই দিক ছাড়া অন্য সব দিকে গাছগুলি এক রেখায় দাঁড়াইয়া আছে। তোমরা সবাই বুঝিতে পার, গাছগুলি বাস্তবিক ঐরূপে নাই। কতকগুলি গাছ হয়ত এক শ্রেণীতে আছে। কিন্তু অধিকাংশ গাছ অগ্রপশ্চাৎ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। কতকগুলি গাছ হয়ত' পঞ্চাশ হাত আগে, কতকগুলি হয়ত' পাঁচশত হাত পিছনে, আবার কতকগুলি হয়ত' আধ মাইল আরও পিছনে এইরূপে রহিয়াছে। কিন্তু তুমি অতি দূরে অবস্থিত আছ বলিয়া সব গাছগুলিকেই একই সারিতে দেখ। সেইরূপ আমরা অত্যন্ত দূরে আছি বলিয়া নক্ষত্রগুলিকে একই সমতলে দেখি—যেন একখানি অতি বিশাল নীল চাঁদোয়ার গায়ে অসংখ্য ছোট বড় জোনাকি পোকা জ্বলিতেছে। নক্ষত্রগুলি পরস্পর অতি দূরে রহিয়াছে। তাহাদের আয়তনও অতি বৃহৎ। দুই একটি নক্ষত্রের আয়তনের ও পৃথিবী হইতে তাহাদের দূরত্বের, আভাষ দিতেছি।

ভূগোল পড়িয়া তোমরা পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু আভাষ পাইয়াছ। পৃথিবী একটি গ্রহ, ইহা দেখিতে প্রায় গোলাকার। ইহার পরিধি প্রায় ২৫০০০ মাইল। আর দিনের বেলায় আকাশের গায়ে যে গোল একখানি থালার মত সূর্যকে দেখ, উহা একটি নক্ষত্র। উহা কত বড় শুনিবে? প্রায় তের লক্ষটি পৃথিবী একত্র মিলিলে তবে সূর্যের আয়তনের সমান হয়, অর্থাৎ সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়। বুঝিতে পারিতেছ সূর্য কত বড়?

আর ঐ যে আকাশের গায়ে ছোট ছোট নক্ষত্র দেখ, উহাদের দুই একটির আয়তন শুনিবে? কোনটি হয়ত সূর্যের চেয়ে হাজার গুণ বড়, কোনটি হয়ত লক্ষ গুণ বড়, কোনটি হয়ত সূর্যের চেয়ে কোটি গুণ বড়।

এইবার নক্ষত্রগুলি কতদূরে আছে তাহার কিছু আভাষ দিই। সূর্য পৃথিবী হইতে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে। বোধ করি ঠিক আভাষ পাইলে না। আর এক উপায়ে আভাষ দিতেছি। ঘরে আলো জ্বালিলেই তোমরা তাহা দেখিতে পার। তোমরা পরস্পর এত নিকটে আছ যে, মুহূর্ত যাইতে না যাইতেই বুঝিতে পার আলো জ্বলিয়াছে। কিন্তু যদি আলো দূরে থাকে? তখন কিন্তু মুহূর্ত মধ্যেই জানিতে পার না। যদি অত্যন্ত দূরে থাকে, তখন কিছু সময় লাগে। অর্থাৎ আলোর গতি আছে। আলোর গতি কত শুনিবে? এক সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল। সূর্যের আলো পৃথিবীতে আসিতে লাগে ৮ মিনিট ১৮ সেকেণ্ড। অনেকগুলি নক্ষত্র আছে, মাইল দ্বারা তাহাদের দূরত্ব মাপা যায় না।

পৃথিবী হইতে সূর্য ব্যতীত সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তারকা হইল **আলফা সেণ্টার** (Alpha-Centauri)।

পূর্বে বলিয়াছি সব নক্ষত্রগুলি সমান দূরে নাই, আবার ইহাও বলিয়াছি নক্ষত্রগুলির আয়তনও সমান নহে। নক্ষত্রগুলি পৃথিবী হইতে

সমান দূরে নহে বলিয়া এবং তাহাদের আয়তনের তারতম্য আছে বলিয়া সব নক্ষত্রগুলিকে সমান উজ্জ্বল দেখি না। পৃথিবী হইতে উহাদের উজ্জ্বলতা অনুসারে নক্ষত্রগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যে সব নক্ষত্র খুবই উজ্জ্বল, তাহাদিগকে প্রথম শ্রেণীতে ফেলা হয়। তাহার চেয়ে কম উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলা হয়। এইরূপে চতুর্দশ শ্রেণীতে অসংখ্য নক্ষত্রের স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। তোমার চোখের তেজ যদি খুবই বেশি হয়, তবে মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীর নক্ষত্র পর্যন্ত খালি চোখে দেখিতে পাইবে। প্রথম হইতে চতুর্দশ শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি। ইহা ছাড়া এমনও নক্ষত্র রহিয়াছে যাহাদের আলো এত ক্ষীণ যে, শক্তিশালী ক্যামেরাতেও (Camera) তাহা ধরা পড়ে না। অনেক নক্ষত্র আছে যাহাদের আলো এখনও পৃথিবীতে আসিয়া পৌছায় নাই। তাই বলিতেছিলাম আকাশে অসংখ্য তারকা রহিয়াছে—কত তারকা আছে আমরা তাহার অনুমানই করিতে পারি না।

এই এত যে নক্ষত্র, ইহাদের সবগুলিকেই কি চিনিয়া রাখা সম্ভব ? না, একেবারেই সম্ভব নয়। তবে যে নক্ষত্রগুলি বেশি উজ্জ্বল, কেবলমাত্র সেইগুলিকেই চিনিতে পারি। এই স্থানে মাত্র কয়েকটি নক্ষত্রের পরিচয় দিতেছি।

ভূ-গোলকে (globe) পৃথিবীর মধ্য দিয়া একটি শলাকা গিয়াছে, লক্ষ্য করিয়াছ। পৃথিবীর মধ্য দিয়া এইরূপ একটি রেখা গিয়াছে কল্পনা করা হয়। ইহাকে **মেরুরেখা বা ধ্রুবরেখা** (axis) বলে। অবশ্য এ সবই কল্পনা। এই মেরুরেখা উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে সোজা বাড়াইয়া দাও। এতদূর বাড়াইয়া দাও যে, ইহার দুই প্রান্ত যেন আকাশে গিয়া ঠেকে। এই মেরুরেখা যে দুই স্থানে আকাশে ঠেকিল, উহাদিগকে বলে **উত্তর মেরু** (North Pole) ও **দক্ষিণ মেরু** (South Pole)।

অন্ধকার রাত্রে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাকাইলে বুঝিতে পারিবে যে, সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রগুলি পূর্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিতেছে; কিন্তু উত্তর আকাশে একটি প্রায় নিশ্চল অল্পোজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিতে পাইবে—উহা প্রায় নিশ্চল থাকে বলিয়া উহাকে **ধ্রুবতারা** বলে (১৫০ পৃষ্ঠার চিত্র) এবং উত্তর মেরুর অতি সন্নিকটে অবস্থিত বলিয়া উহাকে ইংরেজীতে Polaris বা Pole-Star বলে। দক্ষিণ মেরুতে অনুরূপ একটি নক্ষত্র আছে, তাহাকে **হ্যাডলীর অকট্যাণ্ট** (Hadley's Octant) বলে। যতই উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ধ্রুব নক্ষত্রকে ততই মাথার দিকে আসিতে দেখা যায় এবং পৃথিবীর উত্তর মেরুতে যাইলে উহাকে ঠিক মাথার উপর দেখা যাইবে। আবার যতই দক্ষিণে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই উহাকে নীচুতে নামিতে দেখা যাইবে এবং নিরক্ষ রেখার উপর যাইলে উহাকে ঠিক দিগন্তে মিশিয়া থাকিতে দেখা যাইবে। নিরক্ষ-রেখার আরও দক্ষিণে যাইলে উহাকে আর দেখা যাইবে না। পৃথিবী আপন মেরুরেখার চতুর্দিক ঘুরিতেছে বলিয়া, অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রকে পূর্ব-পশ্চিমে ঘুরিতে দেখা যাইলেও, ঐ মেরুরেখার অগ্রভাগে অবস্থিত বলিয়া ধ্রুবতারাকে ঘুরিতে দেখা যায় না, এবং মনে হয় যেন ধ্রুব তারার চতুর্দিকে গ্রহ নক্ষত্রসকল বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে।

ধ্রুব তারা ব্যতীত আরও কতকগুলি বিখ্যাত নক্ষত্রের পরিচয় দিতেছি। পৃথিবীকে মহাদেশ, দেশ, প্রদেশ, মহাসাগর, সাগর ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হইয়াছে। পণ্ডিতগণ সেইরূপ আকাশকে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক অংশের পৃথক পৃথক নাম দিয়াছেন। এই ছোট ছোট অংশগুলিকে বলে **নক্ষত্রমণ্ডল** (Constellation); এই নক্ষত্রমণ্ডলের এক একটি বিশিষ্ট আকৃতি কল্পিত হইয়াছে। এক এক নক্ষত্রমণ্ডলের অন্তর্গত নক্ষত্রগুলি মিলিয়া যে আকৃতি পায়, সেই আকৃতি অনুসারেই নক্ষত্রমণ্ডলকে চিহ্নিত করা হয়।

উত্তরাকাশে সাতটি দ্বিতীয় শ্রেণীর উজ্জ্বল নক্ষত্র মিলিয়া একটি নক্ষত্রমণ্ডল রচনা করিয়াছে। এই সাতটি নক্ষত্রের চারিটি মিলিয়া একটি চতুর্ভুজ রচিত হইয়াছে এবং ঐ চতুর্ভুজের এক কোণে আর তিনটি নক্ষত্র একটি রেখায় অবস্থিত রহিয়াছে। প্রাচীনকালে এদেশের জ্যোতির্বিদেরা উহাদিগকে সাতজন ঋষির নাম অনুসারে (পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ ও মরীচি) **সপ্তর্ষিমণ্ডল** নাম

সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবতারা

দিয়াছেন। ইংরেজেরা ইহাকে ভল্লুকের আকার কল্পনা করিয়া Great Bear নাম দিয়াছেন। এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের দুইটি তারাকে (পুলহ ও ক্রতুকে) এক সরল রেখার দ্বারা যোগ করিয়া বর্ধিত করিলে ধ্রুবতারার নিকট দিয়া যায়। অতএব সপ্তর্ষিমণ্ডলকে ভালরূপে চিনিয়া রাখিলে ধ্রুবতারাকে বাহির করা সহজ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের বশিষ্ঠ নামক নক্ষত্রের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখা যায়, উহাকে **অরুন্ধতী** (Alcor) বলে। চৈত্র বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার সময় সপ্তর্ষিমণ্ডলকে উত্তর আকাশে দেখিতে পাইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে একটু পশ্চিমে হেলিয়া থাকে।

এইরূপ হেলিতে হেলিতে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে নীচে চলিয়া যায়। পৌষ মাস হইতে উত্তর-পূর্ব কোণ দিয়া আবার ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে থাকে।

ধ্রুব নক্ষত্রের নিকটে আরও ছয়টি নক্ষত্র মিলিয়া একটি **নক্ষত্রমণ্ডল** গঠিত হইয়াছে ; ইহাদের মধ্যে চারিটি একটি চতুর্ভুজের আকারে এবং বাকি দুইটি চতুর্ভুজের এক কোণ হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্যন্ত রেখা টানিলে তাহার মধ্যে পড়ে। ইহাদিগকে **লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল** (The Little Bear) বলে।

ধ্রুব তারার যেদিকে সপ্তর্ষি-মণ্ডল, আকাশে ঠিক তাহার বিপরীত দিকে **ক্যাসিওপিয়া** (Cassiopeia) নামে একটি নক্ষত্রমণ্ডল আছে। ঠিক বিপরীত দিকে থাকার ফলে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল নীচে নামিয়া যায়, তখন এই নক্ষত্রমণ্ডলকে ধ্রুব তারার উপর দিকে দেখা যায়। পাঁচটি নক্ষত্র লইয়া ক্যাসিওপিয়া নক্ষত্রমণ্ডল। এই নক্ষত্রগুলি এমন ভাবে সজ্জিত আছে যেন একটি ইংরেজি অক্ষর W অথবা M।

ক্যাসিওপিয়া

ক্যাসিওপিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকে তিনটি নক্ষত্রমণ্ডল রহিয়াছে। উপরের চারিটি নক্ষত্র মিলিয়া যেন একটি চতুর্ভুজ গঠন করিয়াছে। এই নক্ষত্রমণ্ডলকে **পেগাসস** (Pegasus) মণ্ডল বলে। পেগাসসের তিন কোণে তিনটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। তাহাদের নাম উত্তরভাদ্রপদ (Alpheratiz), পূর্বভাদ্রপদ (Markab) এবং গোপদ (Algenib)। চতুর্ভুজের এক কোণ দিয়া নিম্ন দিকে রেখা টানিলে তিনটি নক্ষত্র পাওয়া যায়। এই তিনটি নক্ষত্র লইয়া যে নক্ষত্রমণ্ডল, তাহাকে **এনড্রোমিডা** (Andromeda) মণ্ডল বলা হয়। খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিবে, পেগাসস ও এনড্রোমিডা নক্ষত্রমণ্ডল মিলিয়া একখানি ঘুড়ির

আকার ধারণ করিয়াছে। পেগাসস হইল ঘুড়ি, আর এনড্রোমিডা হইল ইহার লেজ। লেজের সর্বশেষে যে নক্ষত্র, তাহার নিকটে কতকগুলি নক্ষত্র একত্রে রহিয়াছে। ইহাকে বলে **পারস্থুস** (Perseus) মণ্ডল। পারস্থুসমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত উজ্জ্বল তারকাটির নাম **আলগল** (Algol)। আলগল অর্থ হইতেছে দৈত্য-তারা। তারাটি অত্যন্ত উজ্জ্বল। তাহা ছাড়া, ইহা রক্ত বর্ণের। রক্ত চক্ষু মেলিয়া যেন তোমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। প্রায় তিন দিন অন্তর অন্তর তারকাটির উজ্জ্বলতা যেন একটু কমিয়া যায়।
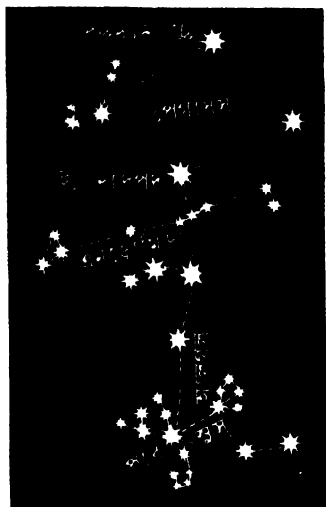
পেগাসস, এনড্রোমিডা ও পারস্থুসমণ্ডল

আলগল তারকাটির কিয়দ্দূরে সাতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারা একত্রে রহিয়াছে। ইহাদিগকে বলে **সাতভাই** (Pleiades) ; ইহাদিগকে **কৃত্তিকা**ও বলে।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে ও পৌষ মাসের প্রথমভাগে সন্ধ্যার পর পূর্বাকাশের বিখ্যাত নক্ষত্রমণ্ডল **কালপুরুষ** (Orion) ; (পর পৃষ্ঠায় চিত্র দেখ)। এই মণ্ডলে কয়েকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, তাহাদের মধ্যে আর্দ্রা (Betelgeux), বাণরাজা (Rigel) এবং কার্ত্তিকেয় (Bellatrix) প্রধান। নক্ষত্রগুলিকে কাল্পনিক রেখার দ্বারা যোগ করিয়া দিলে একটি মানুষের মত দেখায়, হাতে ধনুক, কোমরে কোমরবন্ধ, তাহাতে তলোয়ার ঝুলানো। শীতকালে ভোরবেলা এই নক্ষত্রমণ্ডলকে পশ্চিম আকাশে অস্ত যাইতে দেখা যায়। পৌষ মাসে সন্ধ্যার পর কালপুরুষের ডান পায়ের নিকটে একটি উজ্জ্বল তারকা দেখা যায়। ইহার নাম **লুব্ধক** (Sirius)। পৃথিবী

হইতে এক হাজার কোটি মাইল দূরে অবস্থিত থাকিয়াও ইহাকে এত উজ্জ্বল দেখা যায়। এই তারকাটি **বৃহৎ কুকুরমণ্ডলের** (Canis major) অন্তর্গত। ইহাই আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। প্রাচীন পণ্ডিতগণ ইহাকে কালপুরুষের শিকারী কুকুর মনে করিতেন।

কালপুরুষের পূর্বদিকে আর একটি উজ্জ্বল তারা দেখা যায়। ইহার নাম **সরমা** (Procyon)। ইহা **ক্ষুদ্র কুকুরমণ্ডলের** (Canis minor) অন্তর্গত। ক্ষুদ্র কুকুরমণ্ডলের দক্ষিণে একটি বড় নক্ষত্রমণ্ডল আছে। এই মণ্ডলটির নাম **আর্গোনেভিস** (Argo-navis)। এই মণ্ডলের উজ্জ্বল নক্ষত্রটির নাম **অগস্ত্য** (Canopus)।

কালপুরুষ

তোমরা সকলেই জান পৃথিবী স্বীয় মেরু রেখার চতুর্দিকে ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরিয়া আইসে, আবার ৩৬৫¼ দিনে সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করিয়া আইসে। এই দুই প্রকার গতির ফলে আমাদের মনে হয় সূর্য যেন আকাশপথে পূর্ব হইতে পশ্চিমে, দিনে একবার ঘুরিয়া আসে। আবার ৩৬৫¼ দিনে বা এক বৎসরেও ঠিক এইরূপ একবার ঘুরিয়া আসে। নক্ষত্র ও সূর্য এতদূরে অবস্থিত যে উহাদিগকে একই সমতলে দেখায়। তাই মনে হয় সূর্য যাইবার সময় এক এক নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্য দিয়া যায়। আকাশে যে পথ দিয়া সূর্য এক বৎসরে একবার যায়, তাহাকে পণ্ডিতগণ **রাশিচক্র** বা **ক্রান্তিবৃত্ত** (ecliptic) বলেন। সূর্য বার মাসে এই পথটি ভ্রমণ করে। তাই এই পথকে বারটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, এরূপ এক একটি ভাগের নাম **রাশি** (Sign)।

প্রাচীনকালের লোকেরা এক এক রাশির নক্ষত্রমণ্ডলের আকৃতির সহিত নানাপ্রকার জীব-জন্তুর সাদৃশ্য কল্পনা করিতেন। ইহাদের আকৃতির সহিত মিলাইয়া এক এক রাশির নাম হইয়াছে। বারটি রাশির নাম এইরূপ—

১। মেষ (Aries—The Ram), ২। বৃষ (Taurus, The Bull), ৩। মিথুন (Gemini, The Twins), ৪। কর্কট (Cancer, The Crab), ৫। সিংহ (Leo, The Lion), ৬। কন্যা (Virgo, The Virgin), ৭। তুলা (Libra, The Scales), ৮। বৃশ্চিক (Scorpio, The Scorpion), ৯। ধনু (Sagittarius, The Archer), ১০। মকর (Capricornus, The Goat), ১১। কুম্ভ (Aquarius, The Water Carrier), ১২। মীন (Pisces, The Fisher)।

প্রকৃতপক্ষে রাশিগুলির নক্ষত্রমণ্ডলের সহিত এই এই জীবের সাদৃশ্য বাহির করা কঠিন। তবে অতি পূর্ব হইতে এই যে নাম দেওয়া হইয়াছে সেই নামই এখনও চলিয়া আসিতেছে।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের ক্রতু ও পুলহকে যোগ করিয়া রেখাটি বাড়াইয়া দিলে ধ্রুব নক্ষত্রকে পাওয়া যায়। বৈশাখ মাসে এই রেখাটিকে যদি আরও উপরদিকে বাড়াইয়া দাও, কতকগুলি ছোট তারকার গুচ্ছ দেখিতে পাইবে। এই ছোট তারকার গুচ্ছকে বলে **লঘু সিংহমণ্ডল** (Leominor)। ঐ রেখাকে আরও উপরদিকে বাড়াইয়া দাও, দেখিবে রেখাটি একটি বড় নক্ষত্র মণ্ডলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে।

সিংহ রাশি

এই নক্ষত্রমণ্ডলের নাম **সিংহ রাশি**। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে সিংহের

সহিত ইহার কিছু মিল দেখিবে। সিংহের পায়ের গোড়ায় যে নক্ষত্রটি উজ্জ্বল হইয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে, তাহার নাম **মঘা** (Regulus), আর লেজের দিকে যে নক্ষত্রটি উজ্জ্বল, তাহার নাম **উত্তরফল্গুনী** (Denebola)।

সিংহ রাশির পশ্চিমদিকের ঈষৎ নীচে, লক্ষ্য করিয়া দেখ, দুইটি প্রথম শ্রেণীর তারা রহিয়াছে। ইহাদের উপরটির নাম **পোলাক্স** (Pollux) ও নীচেরটির নাম **ক্যাষ্টর** (Castor)। এই দুইটি তারার আর এক নাম **পুনর্বসু**। ইহারা মিথুন রাশির মধ্যে আছে। ক্যাষ্টর ও

মিথুন রাশি

পোলাক্সকে যদি দুইটি মানুষের মাথা বলিয়া ধরা যায়, তবে মনে হইবে, দুইটি মানুষ মুখোমুখী রহিয়াছে। তাই এই রাশিকে **মিথুন** (যুগল মানুষ) রাশি বলে।

সিংহ ও মিথুন রাশির প্রায় মধ্যে **কর্কট** রাশি। ইহার মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র বেশি নাই। **পুষ্যা** ইহার বিখ্যাত নক্ষত্র।

এদিকে, সিংহমণ্ডলের ঠিক পূর্বদিকে **কন্যা রাশি**। এই রাশির মধ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর তারা রহিয়াছে—নাম **চিত্রা** (Spica)। লক্ষ্য করিয়া দেখ, এই মণ্ডলের কয়েকটি তারা মিলিয়া একটি ত্রিভুজ রচনা করিয়াছে।

কন্যা রাশির পূর্বে **তুলা রাশি**। তুলা রাশিতে খুব উজ্জ্বল নক্ষত্র নাই। একমাত্র **বিশাখা** নক্ষত্র উহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ইহা একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র।

কন্যা রাশির নীচের দিকে তাকাইলে ঠিক একটি চতুর্ভুজের আকৃতি-বিশিষ্ট দুইটি নক্ষত্রমণ্ডল দেখিবে। ইহাদের নাম **কার্ভস** (Corvus) ও **ক্রেটার** (Crator)।

কার্ভস ও ক্রেটারমণ্ডলের নীচ দিয়া প্রায় কর্কটমণ্ডল পর্যন্ত বিরাট সাপের আকারে একটি নক্ষত্রমণ্ডল রহিয়াছে লক্ষ্য করিবে। ইহা

হাইড্রামণ্ডল

হইতেছে বিখ্যাত **হাইড্রামণ্ডল** (Hydra—জলীয় সাপ) এই মণ্ডলে **অশ্লেষা** নামে একটি নক্ষত্র আছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব আকাশে প্রায় শেষ রাত্রিতে **বৃশ্চিক রাশিকে** দেখিতে পাইবে (পর পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। তুলা রাশির ঠিক নীচেই বৃশ্চিক রাশি। ইহার অন্তর্গত **জ্যেষ্ঠা** (Antares) নক্ষত্র দেখিতে খুব সুন্দর। ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র। নক্ষত্রটির পাশেই একটি ছোট তারা রহিয়াছে—ইহার রঙ সবুজ। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রকে তাই **যুগল** নক্ষত্র বলে।

বৃশ্চিক রাশির ঈষৎ পূর্বে **ধনু রাশি**। ইহার উত্তরদিকে আকুইলা মণ্ডলের (Aquila) ভিতর একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়। ইহার নাম

বৃশ্চিক রাশি

শ্রবণা (Altair)। লক্ষ্য করিলে দেখিবে ধনু-রাশির কিয়দংশ ছায়াপথের মধ্যে রহিয়াছে। ধনু রাশির পূর্বে **মকর রাশি**, মকরের পূর্বে **কুম্ভ রাশি**। মকর ও কুম্ভকে আষাঢ়ের শেষভাগে দেখিতে পাইবে। **শতভিষা** নক্ষত্র কুম্ভ রাশির অন্তর্গত।

পূর্বে তোমাদিগকে এন্‌ড্রোমিডামণ্ডলের কথা বলিয়াছি। ইহারই পূর্বদিকে ভাদ্রমাসের শেষভাগে একটি ত্রিভুজাকৃতি নক্ষত্রমণ্ডল দেখিবে। ইহার নাম **ট্রাঙ্গুলাম** (Triangulum)। ট্রাঙ্গুলামের পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটি তারা লইয়া যে নক্ষত্রমণ্ডল রচিত হইয়াছে তাহাই হইতেছে **মেষ রাশি**। ইহার তিনটি তারার মধ্যটির নাম **অশ্বিনী**।

কুম্ভ ও মেষ রাশির মধ্যে **মীন রাশি**। ইহা দেখিতে যেন অনেকটা ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের মত—কেবলমাত্র সিংহল দ্বীপটি নাই। মীন রাশিতে কোন প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র নাই।

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি মধ্যরাত্রে পূর্ব আকাশে **বৃষরাশি** দেখিতে পাইবে। বৃষ রাশির উপরদিকে সেই সাতভাই বা কৃত্তিকা নক্ষত্র। কৃত্তিকার নীচে **রোহিণী** নক্ষত্র।

বৃষ রাশির কিছু উত্তর-পূর্বে ছায়াপথ দেখিতে পাইবে। ইহার উপর **আরিগা** (Auriga) বা **প্রজাপাত** মণ্ডল। **ব্রহ্মহৃদয়** (Capella) ইহার উজ্জ্বল তারা।

নক্ষত্রগুলিকে যেরূপ সহজে চেনা যায়, গ্রহগুলিকে সেইরূপে চেনা যায় না। কারণ গ্রহগুলি আকাশে স্থির হইয়া থাকে না। ইহারা সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেইজন্য অনবরত স্থান পরিবর্তন করে। পাঁজি দেখিয়া কোন্ গ্রহ কোন্ গ্রহ, কোন্ মাসে কোন্ রাশিতে থাকে, তাহা জানিয়া লইলে বিখ্যাত গ্রহগুলি সহজে চিনিতে পারিবে।

গ্রহগুলির বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে।

প্রশ্নমালা

(১) গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য কি ?

(২) নক্ষত্রগুলিকে একই সমতলে অবস্থিত দেখায় কেন ?

(৩) ধ্রুব নক্ষত্রকে চিনিবে কিরূপে ?

(৪) নক্ষত্রমণ্ডল কাহাকে বলে ? কয়েকটি বিখ্যাত নক্ষত্রমণ্ডলের নাম, সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবস্থানের বিষয় যাহা জান বল।

(৫) রাশি ও রাশিচক্র কাহাকে বলে ?

(৬) সিংহ রাশির বিস্তৃত বিবরণ দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সৌরজগৎ

পূর্ব অধ্যায়ে তারকা ও নক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। অসংখ্য তারকার মধ্যে সূর্য একটি তারকা। সূর্য অপেক্ষা বহু গুণ বড়, বহু কোটি মাইল দূরে অবস্থিত তারকাও রহিয়াছে। তারকাগণের মধ্যে সূর্য পৃথিবী হইতে অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থিত বলিয়া সূর্যকে আমরা অত বড় দেখি।

সৌরজগৎ

সূর্য এবং যে সকল গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া অবিরাম ঘুরিতেছে, ইহাদের সকলকে লইয়া **সৌরজগৎ** বা সৌর পরিবার।

সৌর পরিবারে চারি শ্রেণীর জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাওয়া যায়—(ক) **সূর্য**, (খ) **গ্রহ**, (গ) **উপগ্রহ**, (ঘ) **ধূমকেতু** ও **উল্কাপুঞ্জ**। সৌরজগতের সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সূর্য হইতে উদ্ভূত এবং সূর্যের আকর্ষণের ফলে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া সূর্যের চতুর্দিকে অবিরাম ঘুরিতেছে। ইহা ছাড়া অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রত্যেকে প্রত্যেককে আকর্ষণ করিতেছে।

সূর্য ; ইহার আয়তন ; পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব
(The Sun ; its dimension and distance from the Earth)

সূর্যের সহিত আমাদের যেরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয়, ব্রহ্মাণ্ডের আর কোন বস্তুর সহিত তত নহে। সূর্য হইতেই পৃথিবী তাপ ও আলোক পাইয়া থাকে। তাই সূর্য আমাদের জীবন—সমস্ত শক্তি ও আহার্য আমরা সূর্য হইতেই পাইয়া থাকি। সূর্য না থাকিলে বায়ু বহে না, নদী প্রবাহিত হয় না, আকাশ হয় মেঘশূন্য—ফলে বৃষ্টিও হয় না। সূর্যের অভাবে জগৎ হইতে প্রাণিজগৎ নিমেষে নিশ্চিহ্ন হইবে। চন্দ্র হাসিবে না, পৃথিবী আলোকিত হইবে না। ফলে পৃথিবীতে চির অন্ধকার বিরাজ করিবে।

পূর্বে পণ্ডিতগণের ধারণা ছিল যে, সূর্য অন্যান্য নক্ষত্র লইয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কোপার্নিকাস (Copernicus) প্রথমে প্রচার করেন যে, সূর্য পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে না—পৃথিবীই সূর্যকে পরিক্রমণ করে। এই মত এখনও চলিয়া আসিতেছে। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর নিয়মিত পরিক্রমণের ফলে শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু পরিবর্তন হইয়া থাকে।

এই যে পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে, ইহা কেবলমাত্র সূর্যের আকর্ষণের ফলে।—না জানি সূর্য তবে কত বড়? ইহার কিঞ্চিৎ আভাষ অবশ্য পূর্বে দিয়াছি।

সূর্য পৃথিবী হইতে তের লক্ষ গুণ বড়, অর্থাৎ তের লক্ষটি পৃথিবী একত্র করিয়া তাহাকে যদি গোল আকার দেওয়া যায়, তবে তাহা প্রায় সূর্যের সমান হইবে। আমরা জানি পৃথিবীর ব্যাস প্রায় আট হাজার মাইল। কিন্তু সূর্যের ব্যাস প্রায় ৮৬ লক্ষ মাইল—পৃথিবীর ব্যাসের ১১০ গুণ।

সূর্যের ওজন পৃথিবীর ওজন অপেক্ষা ৩৪ লক্ষ গুণ বেশি। ইংরেজ বৈজ্ঞানিক হেনরি ক্যাভেনডিস (Henry Cavendish) ১৭৯৭—৯৮ সালে পৃথিবীর ওজন নির্ণয় করিয়াছেন ১২,৫০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড, সংক্ষেপে $১'৮ \times ১০^{২৩}$ মণ। সুতরাং সূর্যের ওজন প্রায় ৬×১০^{২৮} মণ। এত বেশি ওজন হইলেও সূর্য পৃথিবীর ন্যায় কঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত নয়। ইহা জলন্ত গ্যাসীয় (Gaseous) পদার্থের একটি গোলক। উহার ঘনত্ব পৃথিবীর চারি ভাগের এক ভাগ।

সূর্য পৃথিবী হইতে কত দূরে? বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়াছেন যে, সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। যে ট্রেণ ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে যায়, এমন ট্রেণে সূর্যে যাইতে লাগে প্রায় ২৪০ বৎসর।

এত অধিক দূরে থাকে, অথচ তাহার উত্তাপেই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুরে আমাদের কি ভীষণ কষ্টই না হয়? তবে না জানি সূর্যের উত্তাপ কত? সেণ্টিগ্রেড থার্মোমিটারের ০° ডিগ্রীতে জল জমিয়া বরফ হয়, আর ১০০° ডিগ্রীতে জল ফুটিতে আরম্ভ করে—ইহা তোমরা সকলেই জান। সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতা ৬০০০° ডিগ্রী, আর ভিতরের উষ্ণতা ৭ কোটি ডিগ্রী। বোধ করি কিছু অনুমান করিতে পারিলে না। মনে কর, পৃথিবী হইতে সূর্য পর্যন্ত এই ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল জোড়া একটি বরফের পথ রহিয়াছে। পথটি ২৪ মাইল চওড়া। এখন সূর্যের সমস্ত তাপ একত্র করিয়া ইহার উপর পড়িল। ১ সেকেণ্ডে বরফপথ গলিয়া জল হইয়া যাইবে। এখন সূর্যের তাপের অনেকটা অনুভূতি হইল।

পৃথিবীর উপরে যেমন বায়ুমণ্ডল আছে এবং মধ্যে মধ্যে মেঘের স্তর দেখা যায়, সূর্যেও সেইরূপ কয়েকটি আবরণ আছে। সেখান হইতে আলোক চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। সূর্যের বাহিরের আবরণকে **আলোকমণ্ডল** (Photosphere) বলে। আলোকমণ্ডলে মধ্যে মধ্যে ঝড় হয়। পৃথিবীর ঝড় যেমন স্বল্পকালস্থায়ী, এখানকার ঝড় কুড়ি পঁচিশ দিন,

এমন কি এক মাস অবধি থাকে এবং লক্ষ লক্ষ মাইল ব্যাপিয়া এই ঝড় বহিয়া থাকে।

আলোকমণ্ডলের একটি প্রদীপ্ত রক্তবর্ণ আবরণ আছে। ইহাকে **বর্ণমণ্ডল** (Chromosphere) বলে। যে গ্যাসীয় পদার্থ সূর্যকে ঘিরিয়া অনবরতই জ্বলিতেছে, এই বর্ণমণ্ডল সেই আগুনের শিখা। মধ্যে মধ্যে এক একটি শিখা হাজার হাজার মাইল উচ্চ হইয়া থাকে। বর্ণমণ্ডলকে ঘিরিয়া আবার বহুদূর ব্যাপিয়া একটি সাদা স্তর আছে, তাহাকে বলে **ছটামণ্ডল** (Corona)। বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল পূর্ণ সূর্যগ্রহণ না হইলে দেখা যায় না।
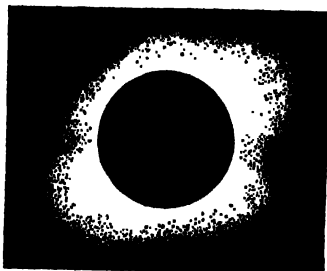
ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে সূর্যের মধ্যে কতকগুলি কাল কাল বিন্দু দেখা যায়। ইহাদের আকৃতি সব এক প্রকারের নহে এবং সব সময় আবার একরূপ থাকে না। এই কাল বিন্দুগুলিকে **সৌরকলঙ্ক** (Sun-spot) বলে (পর পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। সাধারণত ১০ হইতে ১১ বৎসর পর পর এই কলঙ্কগুলি অত্যন্ত বাড়ে। অনেকে বলেন, এই কলঙ্কগুলি অত্যন্ত বাড়িলে পৃথিবীতে প্রায়ই অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানা দৈব উপদ্রবের লক্ষণ দেখা যায়। দূরবিনের সাহায্যে এইগুলিকে সৌর কলেবরের নানা অংশে গোলাকার কাল চিহ্নের ন্যায় দেখায় এবং ইহাদিগকে প্রায়ই সৌর গোলকের নানা অংশে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখা যায়। কোন কোন সৌর কলঙ্কের অধিকৃত স্থান পৃথিবীর চারি পাঁচ গুণ। আবার কতকগুলির স্থান ৪০,০০০ বর্গ মাইল অপেক্ষাও অধিক। আধুনিক পণ্ডিতেরা সৌর আলোকমণ্ডলের চাঞ্চল্যকেই কলঙ্কের মূল কারণ বলিয়া অনুমান করেন।

তাপের পরিবাহন ক্রিয়ায় সূর্যের উত্তপ্ত অংশবিশেষ উপরে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং উপরে আসায় উহার তাপ অপেক্ষাকৃত কমিয়া যায়; তাহার
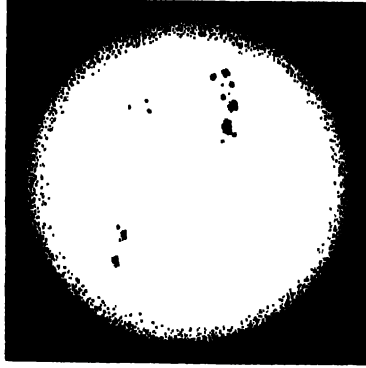
সৌরকলঙ্ক

ফলে পার্শ্বস্থ অত্যুজ্জ্বল অংশের তুলনায় ঐ অংশবিশেষ অনুজ্জ্বল হয় এবং দূর হইতে উহাকে কাল দেখায়। এই অনুজ্জ্বল অংশকেই আমরা কলঙ্কাকারে দেখি।

প্রশ্নমালা

(১) সৌর-জগৎ বলিতে কি বুঝায়?

(২) সূর্যের আয়তন ও ওজন সম্বন্ধে যাহা জান বল।

(৩) সৌর-কলঙ্ক কাহাকে বলে ও ইহার বিষয় কি জান?

(৪) আলোকমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল কাহাকে বলে?

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রহ, উপগ্রহ (Planetary System)

সৌর জগতে অবস্থিত যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আমরা আকাশে দেখিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে গ্রহগণকেই স্থির-জ্যোতি বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক গ্রহের দুই প্রকার গতি আছে—(১) **আবর্তন** (rotation) ও (২) **পরিক্রমণ** (revolution)। সৌর জগতে থাকিয়া গ্রহগুলি নিজেকে একবার স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর ঘুরাইয়া আনে—এই প্রকার গতিকে **আবর্তন গতি** এবং নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করিয়া আসে—এইরূপ গতিকে **পরিক্রমণ গতি** বলে। কোন কোন গ্রহের চারিদিকে এক বা একাধিক অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক ঘুরিতে দেখা যায়। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কগুলিকে **উপগ্রহ** বলে।

পৃথিবী একটি গ্রহ। পৃথিবী ব্যতীত আরও নয়টি গ্রহ রহিয়াছে। সূর্য হইতে দূরত্ব হিসাবে **বুধ** (Mercury), **শুক্র** (Venus), **পৃথিবী** (Earth), **মঙ্গল** (Mars), পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **গ্রহাণুপুঞ্জ** (Asteroids), ইহার পরে **বৃহস্পতি** (Jupiter), **শনি** (Saturn), **ইউরেনস** (Uranus), **নেপচুন** (Neptune) এবং **প্লুটো** (Pluto) অবস্থিত।

বুধ

বুধ সূর্যের নিকটতম গ্রহ। ইহা সূর্য হইতে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। কোনও এক বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, বুধ সূর্যের সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান। সর্ব-কনিষ্ঠ সন্তানকে মা যেমন সব সময় কাছে কাছে রাখেন, সূর্য সেইরূপ এই ক্ষুদ্রতম গ্রহ বুধকে সর্বাপেক্ষা নিকটে রাখেন। সূর্যের

নিকটে থাকে বলিয়া রাত্রিতে সূর্য অস্ত যাইবার অনেক পর ইহাকে আকাশে দেখা যায় না। ইহাকে কচিৎ দেখা যায়—কারণ খুব বেশি উজ্জ্বল নয়। সূর্যাস্তের অল্প পরেই ইহা অস্ত যায়। সুতরাং ইহাকে সূর্যাস্তের অল্প পরেই পশ্চিম আকাশে কিংবা সূর্যোদয়ের অল্প আগে পূর্ব আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। উপবৃত্তাকার পথে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন ইহা পৃথিবীর নিকটে আইসে, তখন ইহার অন্ধকার দিকটা পৃথিবীর দিকে থাকে, তাহার ফলে আর ইহাকে দেখা যায় না। পৃথিবী হইতে যখন দূরে যাইতে থাকে, তখন ক্রমশ দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। সূর্যের ঠিক অপর দিকে চলিয়া গেলে ইহাকে পরিষ্কাররূপে দেখা যায়। তখন দূরত্ব অত্যন্ত বেশি হয় বলিয়া ইহাকে খুব ক্ষুদ্র দেখায়। সুতরাং বুধ যখন পৃথিবী এবং সূর্যকে লইয়া সমকোণ উৎপন্ন করে, তখন ইহাকে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দেখায়। উপবৃত্তপথে সূর্যকে পরিক্রমণ করিতে বুধের ৮৮ দিন লাগে। তাই বৎসরে আটবার কখনও ঊষা-তারকা, কখনও সন্ধ্যা-তারকা হিসাবে আমরা বুধকে দেখিয়া থাকি। চন্দ্রের ন্যায় বুধেরও কলার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। বুধের কোন উপগ্রহ নাই।

শুক্র

দূরত্ব হিসাবে বুধের পরেই শুক্র। ইহা সূর্য হইতে ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা প্রায় ২২৫ দিনে সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করে। অন্যান্য গ্রহের তুলনায় পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ বলিয়া ইহা উজ্জ্বলতম। ইহার আয়তন বুধ অপেক্ষা বড়, কিন্তু পৃথিবী অপেক্ষা ছোট। ইহার ব্যাস ৭৬৬০ মাইল। ইহার ওজন প্রায় পৃথিবীর $\frac{4}{5}$। বুধের ন্যায় শুক্রেরও কলার হ্রাস বৃদ্ধি দেখা যায়। ইহা পূর্বাকাশে ঊষার **শুকতারা** বা প্রভাতী-তারারূপে এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যা-তারা রূপে দেখা যায়। দিবা-

ভাগেও ইহাকে কখন কখন দেখা যায়। ইহার ভ্রমণপথ বৃত্তাকার। বুধের ন্যায় ইহারও কোন উপগ্রহ নাই।

পৃথিবী

পৃথিবীর আয়তন শুক্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। ইহা সূর্য হইতে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিনে একবার সূর্যকে পরিক্রমণ করে। ইহার আকার গোল, তবে উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। ইহার বৃহত্তম ব্যাস ৭৯২৬ মাইল, ক্ষুদ্রতম ব্যাস ৭৯০০ মাইল। ইহার পরিধি প্রায় ২৫০০০ মাইল। অন্যান্য গ্রহের ন্যায় ইহার দুই প্রকার গতি আছে। আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবীতে দিন ও রাত্রি হয় এবং বার্ষিক গতির জন্য শীত গ্রীষ্মাদি ঋতুভেদ হয়। অন্যান্য গ্রহের তুলনায় আমরা পৃথিবী সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা বেশি জানি। কারণ আমরা ইহার মধ্যে বাস করি। পৃথিবীর মাত্র একটি উপগ্রহ—**চন্দ্র**।

বুধ ও শুক্র, পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া, বুধ ও শুক্রকে **অন্তর্কক্ষ** গ্রহ এবং অন্যান্য গ্রহগুলি পৃথিবী হইতে দূরে বলিয়া, তাহাদিগকে **বহির্কক্ষ** গ্রহ বলে।

মঙ্গল

পৃথিবীর পরেই দূরত্ব হিসাবে মঙ্গলগ্রহ। ইহার ব্যাস ৪২০০ মাইল এবং আয়তনে উহা পৃথিবীর সাতভাগের একভাগ মাত্র। ইহা উপবৃত্ত পথে সূর্যকে ৬৮৭ দিনে একবার পরিক্রমণ করে। পরিক্রমণ পথ উপবৃত্তের ন্যায় বলিয়া মঙ্গলগ্রহ যখন সূর্যের নিকটে আসে, তখন ইহার দূরত্ব ১২ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল এবং যখন খুব দূরে চলিয়া যায়, তখন ইহার দূরত্ব ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। পূর্বোক্ত কারণে মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর খুব নিকটে আসে, তখন পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব ৩ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল। আর যখন খুব দূরে থাকে, তখন ইহার দূরত্ব

২৩ কোটি ৪৫ লক্ষ মাইল হয়। ইহার আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা ছোট। ইহা দেখিতে ঈষৎ লাল রঙের, তবে শুক্রের মত উজ্জ্বল নহে। দূরবিনের সাহায্যে দেখিলে ইহার উপর কতকগুলি দাগ দেখা যায়।

মঙ্গল

বৈজ্ঞানিকেরা ইহাদিগকে খাল বলিয়া ধারণা করেন। ইহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, মঙ্গলে মানুষের মত জীবের বসতি আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনও সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পৃথিবীর যেমন একটি উপগ্রহ আছে, মঙ্গলের সেইরূপ দুইটি উপগ্রহ আছে। মঙ্গলের দুইটি উপগ্রহের নাম **ডীমস** (Deemos) ও **ফোবাস** (Phobas)।

গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids)

মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে ব্যবধান অন্যান্য গ্রহের তুলনায় বেশি। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে **গ্রহাণুপুঞ্জ** বৃত্তাকারে ছড়াইয়া আছে। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে দেখাই যায় না, দূরবিন দিয়া দেখিতে হয় ইহাদের সংখ্যা অনুমান বার শত।

বৃহস্পতি

গ্রহগুলির মধ্যে বৃহস্পতি আয়তনে বৃহত্তম। ইহা পৃথিবীর প্রায় ১৩০০ গুণ বড় এবং ওজনে ৩১৭ গুণ। শুধু তাই নয়, সমস্ত গ্রহগুলি একত্র করিলেও ইহার সমান হয় না। আকাশে ইহাকে অতি উজ্জ্বল

বৃহস্পতি

দেখায়। দূরত্ব হিসাবে ইহা ৪৮ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরে। ইহা প্রায় ১২ বৎসরে সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করে। বৃহস্পতির উপগ্রহ নয়টি। ব্যাস ৯০,০০০ মাইল—পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১ গুণ।

শনি

দূরত্ব হিসাবে বৃহস্পতির পরেই শনির স্থান। আয়তনেও ইহার স্থান বৃহস্পতির পরে। সূর্য হইতে দূরত্ব ৮৮ কোটি ৬৮ লক্ষ মাইল। পৃথিবী অপেক্ষা আকারে ৭৪০ গুণ বড়। দূরবিনের সাহায্যে ইহাকে অতি সুন্দর দেখায়। শনিগ্রহ একটি বিরাট গোলপিণ্ড। তিনটি জ্যোতির্ময় বলয় ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহার নয়টি উপগ্রহ। **টাইটান**

(Titan) সব চেয়ে বড় এবং **মাইমস** (Mimos) সকলের চেয়ে কাছে।

শনি

সব চেয়ে দূরে শনির যে উপগ্রহ আছে, তাহার নাম **ফিব** (Phoebe)। সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করিতে ইহার প্রায় ৩০ বৎসর লাগে।

ইউরেনস

ইউরেনস পৃথিবীর প্রায় ৬৪ গুণ বড়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হার্শেল এই গ্রহ আবিষ্কার করেন। ৮৪ বৎসর ২৮ দিনে ইহা সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করিয়া আসিতেছে। ইহার চারিটি উপগ্রহ।

নেপচুন

আকারে নেপচুন ইউরেনস-এর প্রায় সমান। ১৮৪৬ সালে ইংলণ্ডে আডামস (Adams) এবং ফ্রান্সে লেভেরিয়ার (Leverrier) একই সময়ে এই গ্রহ আবিষ্কার করেন। ইহা ১ শত ৬৬ বৎসরে সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করে।

প্লুটো

এতদিন পর্যন্ত নেপচুনই শেষ গ্রহ বলিয়া জানা ছিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্লুটোগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ২৪৬ বৎসর ২১৩ দিনে সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করে। ইহা শীতলতম এবং দূরতম গ্রহ।

সূর্যের নিকটবর্তী গ্রহগুলি অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং দূরবর্তী গ্রহগুলি অত্যন্ত শীতল। পৃথিবী নাতিশীতোষ্ণ গ্রহ। পৃথিবী তাই জন্তু ও উদ্ভিদের আবাস-ভূমি। অন্যান্য গ্রহে জন্তু ও উদ্ভিদ বাস করে কিনা তাহা সঠিক জানা যায় নাই।

প্রশ্নমালা

(১) গ্রহ ও উপগ্রহের পার্থক্য কি? কোন্ কোন্ গ্রহের কয়টি উপগ্রহ আছে?

(২) বৃহত্তম গ্রহ কোন্‌টি? ইহার সম্বন্ধে কি জান?

(৩) কোন্‌টি উজ্জ্বলতম গ্রহ? ইহার সম্বন্ধে যাহা জান বল।

(৪) শনিগ্রহের বৈশিষ্ট্য কি?

চতুর্থ অধ্যায়

চন্দ্র ও তাহার কলা—চান্দ্রবৎসর

(The moon and its phases—lunar year)

আকাশে যতগুলি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আছে, চন্দ্রই উহার মধ্যে পৃথিবীর নিকটতম। পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল।

চন্দ্র একটি উপগ্রহ। পূর্বে বলিয়াছি, উপগ্রহ স্ব স্ব গ্রহকে পরিক্রমণ করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকেও পরিক্রমণ করে। চন্দ্র তাহার আবর্তন গতিবশত স্বীয় মেরুরেখার চতুর্দিকে অনবরত ঘুরিতেছে। পরিক্রমণ গতিবশত নিজের গ্রহ পৃথিবীকে নির্দিষ্ট সময়ে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে অনবরত পরিক্রমণ করিতেছে এবং এই পরিক্রমণ গতিবশতই পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সূর্যকেও অনবরত পরিক্রমণ করিতেছে।

খালি চোখে চন্দ্রকে দেখিলে ইহার মধ্যে বহু কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দাগগুলিকে **চন্দ্রের কলঙ্ক** বলে। কলঙ্ক সত্ত্বেও চন্দ্রকে একটি সুন্দর বস্তু বলিয়াই সকলে কল্পনা করেন। ইহার মধুর সৌন্দর্যে শিশুরা পর্যন্ত আত্মহারা হয়।

চন্দ্রের আয়তন পৃথিবীর তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। ইহার ব্যাস ২০০০ মাইল—পৃথিবীর প্রায় চারিভাগের একভাগ। পৃথিবী অপেক্ষা চন্দ্রের ওজন অপেক্ষাকৃত অনেক কম। সুতরাং যে প্রবল শক্তিতে পৃথিবী

চাঁদের পাহাড়

সমস্ত পদার্থকে আকর্ষণ করে, চন্দ্র তাহার অপেক্ষা অনেক কম শক্তিতে সমস্ত পদার্থকে আকর্ষণ করে। ফলে পৃথিবীতে তোমরা যদি আড়াই হাত উঁচু লাফাইতে পার, চন্দ্রলোকে যদি কোনও প্রকারে যাইতে পার, তাহা অপেক্ষা অনেক উঁচুতে লাফাইতে পারিবে। পৃথিবীর উপরিভাগ

অপেক্ষা চন্দ্রের উপরিভাগ খুবই অসমান। চন্দ্রের মধ্যে বহু অতিকায় পর্বত এবং বহু নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি আছে (আগেকার পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। চাঁদের তিনটি বিখ্যাত আগ্নেয়গিরির নাম **টাইকো** (Tycho), **কোপার্নিকস** (Copernicus) এবং **কেপ্লার** (Kepler)। মধ্যে মধ্যে বিরাট গর্তও রহিয়াছে, গর্তগুলি আগ্নেয়গিরির মুখ মাত্র। পর্বতগুলির মধ্যে কতকগুলি ২০,০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু। এই তুলনায় পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেষ্ট ২৯০০২ ফুট উঁচু। ইহা ছাড়া বৃহৎ সমভূমিও রহিয়াছে। যে সকল স্থানে উচ্চ পর্বতাদির ছায়া পড়ে, সেই সকল ছায়াযুক্ত স্থানকেই আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলি। চন্দ্রের আবহাওয়া বড়ই অদ্ভুত ধরণের। চন্দ্রের যে দিক সূর্যের নিকটে, সেই অংশ অত্যন্ত উত্তপ্ত। আর যে অংশ সূর্য হইতে দূরে, সেই অংশ অত্যন্ত শীতল। চন্দ্রে জল নাই, বায়ু নাই, সুতরাং প্রাণী নাই, উদ্ভিদও নাই।

চন্দ্রের আলোক আমাদের সকলেরই প্রিয়—সকলেরই নিকট অতি মধুর। কিন্তু এই আলোক ধার করা। গ্রহগণের ন্যায় চন্দ্রও সূর্যের নিকট হইতে আলোক প্রাপ্ত হয়। সূর্যের আলোক চন্দ্রের উপর পতিত হয়। এই আলোকে ইহাকে আলোকিত দেখায়। বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ইত্যাদি গ্রহের আলোক আমরা পাইয়া থাকি। চন্দ্রের আলোকও পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে (পর পৃষ্ঠার চিত্র দেখ)। এখন, পৃথিবীর আলোক কি চন্দ্র এবং অন্যান্য গ্রহগণের উপর পতিত হয়? নিশ্চয়ই হয়। চন্দ্রের উপর যে পৃথিবীর আলো পড়ে, তাহা একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে। তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী প্রভৃতির চাঁদ সরু কাস্তের মত। কিন্তু লক্ষ্য করিয়া দেখিবে, ইহার বাকি অংশও ঈষৎ আলোকিত। এইরূপ হইবার কারণ, সূর্যের আলো পৃথিবীর উপর পতিত হইয়া উহা প্রতি-ফলিত হইয়া চন্দ্রকেও আলোকিত করে। শেষের তিথিগুলিতে চন্দ্রের উজ্জ্বলতা যখন খুবই বাড়ে, তখন আর পৃথিবীর আলো দেখা যায় না।

পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র। পৃথিবী চন্দ্রকে তাই আকর্ষণ করে। চন্দ্রও কিন্তু পৃথিবীকে আকর্ষণ না করিয়া ছাড়ে না। চন্দ্রের এইরূপ আকর্ষণের ফলে সমুদ্রে জোয়ার ও ভাটা হয়।
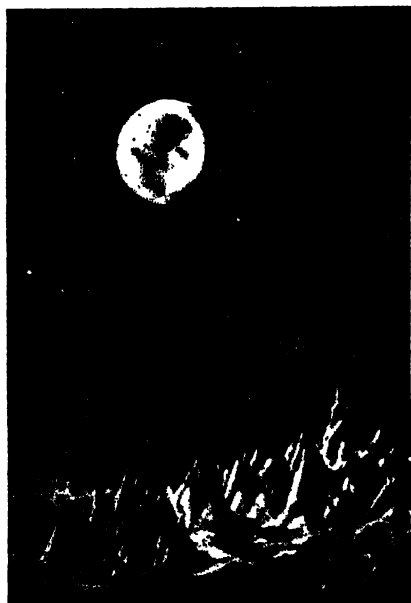
চাঁদের উপর পৃথিবীর আলো

পূর্বে বলিয়াছি চন্দ্র পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সূর্যকেও একবার পরিক্রমণ করিয়া আইসে। যখন এইরূপ পরিক্রমণ করিতে করিতে সূর্য যে-রাশি এবং যে-নক্ষত্রে আছে, চন্দ্র ঠিক সেই রাশি ও সেই নক্ষত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন হয় **অমাবস্যা**। এই দিন চন্দ্রের উজ্জ্বল সূর্যমুখী পৃষ্ঠ পৃথিবীর বিপরীতদিকে থাকে, এবং চন্দ্রের অন্ধকার অংশ পৃথিবীর সম্মুখদিকে থাকে, ফলে সেই দিন চন্দ্রকে আর

পৃথিবীর লোক দেখিতে পায় না। সূর্যের গতি চন্দ্রের গতির তুলনায় অতি ধীর। সূর্য প্রতি মাসে মাত্র একটা রাশি করিয়া আগাইয়া চলে। সুতরাং সমস্ত রাশিচক্রকে ঘুরিতে সূর্যের লাগে এক বৎসর। চন্দ্রের গতি অতি দ্রুত। সমস্ত রাশিচক্র মাত্র ২৭$\frac{১}{৩}$ দিনে পরিক্রমণ করিয়া আসে। সুতরাং অমাবস্যার পরেই চাঁদ সূর্যকে পিছাইয়া ফেলিতে আরম্ভ করে। এইরূপ পিছাইয়া ফেলিতে ফেলিতে চন্দ্র যখন সূর্য হইতে ১৮০° ডিগ্রী তফাতে আসিয়া পড়ে, তখন **পূর্ণিমা** হয়। এই সময় চন্দ্র ও সূর্য দুই রাশিচক্রের বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করে। এই দিন চন্দ্রের উজ্জ্বল সূর্যমুখী পৃষ্ঠ পৃথিবীর সম্মুখে থাকে এবং অন্ধকার অংশ বিপরীত দিকে থাকে। সুতরাং পৃথিবীর লোক উজ্জ্বল চন্দ্র দেখিতে পায়। চাঁদ ২৭$\frac{১}{৩}$ দিনে রাশিচক্র ঘুরিয়া আসিলেও ২৭$\frac{১}{৩}$ দিনে এক চান্দ্রমাস হয় না। ইহার কারণ এক অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্যের মিলনের পর চন্দ্র দ্রুতগতির জন্য প্রায় ২৭$\frac{১}{৩}$ দিন পরে ঠিক সেই স্থানে আসিয়া সূর্যকে দেখিতে পায় না। কারণ সূর্য আপাত-গতি বশত কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া যায়। এই পথটুকু ধরিতে চন্দ্রের আরও প্রায় ২$\frac{১}{৬}$ দিন সময় লাগে। সুতরাং এক অমাবস্যার পর আর এক অমাবস্যা হইতে ২৭$\frac{১}{৩}$ দিন না লাগিয়া প্রায় ২৭$\frac{১}{৩}$+২$\frac{১}{৬}$=প্রায় ২৯$\frac{১}{২}$ দিন লাগে। এইজন্য এক চান্দ্রমাস প্রায় ২৯$\frac{১}{২}$ দিনে (২৯·৫৩ দিনে) হইয়া থাকে। এই ২৯$\frac{১}{২}$ দিনে তাই একবার পূর্ণিমা ও একবার অমাবস্যা হয়। এক পূর্ণিমা হইতে পরবর্তী পূর্ণিমা বা এক অমাবস্যা হইতে পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত তাই এক **চান্দ্রমাস**। এক পূর্ণিমা হইতে পরবর্তী পূর্ণিমা পর্যন্ত, পূর্ণিমান্ত চান্দ্রমাস, আর এক অমাবস্যা হইতে পরবর্তী অমাবস্যা পর্যন্ত অমান্ত চান্দ্রমাস। ভারতবর্ষে নর্মদা নদীর উত্তরে সমস্ত অঞ্চলে পূর্ণিমান্ত চান্দ্রমাস এবং দক্ষিণে সমস্ত অঞ্চলে অমান্ত চান্দ্রমাস মানিয়া চলে।

পূর্বে বলিয়াছি, ২৯½ দিনে এক চান্দ্রমাস হয়। সুতরাং ৩৫৪ দিনে এক **চান্দ্র বৎসর**। কিন্তু তোমরা জান ৩৬৫¼ দিনে এক সৌর বৎসর হয় অর্থাৎ ৩৬৫¼ দিনে পৃথিবী একবার সূর্যকে পরিক্রমণ করিয়া আসে। এই সময়কে এক **সৌর বৎসর** বলে। এই হিসাবে চান্দ্র বৎসরে ও সৌর বৎসরে ১১।১২ দিন করিয়া পার্থক্য হয়। তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ, হিন্দুদের পূজা পার্বণ এবং মুসলমানদের উপবাস, পার্বণাদি প্রতি বৎসর ১১।১২ দিন করিয়া আগাইয়া চলে। এবৎসর যেদিন দুর্গাপূজা আরম্ভ, পর বৎসব তাহার ১১।১২ দিন আগে দুর্গাপূজা আরম্ভ হইবে। এবৎসর যেদিন মহরম আরম্ভ, তাহারও ঠিক ১১।১২ দিন পূর্বে পর বৎসর মহরম আরম্ভ হইবে। মুসলমানদের মহরমাদি পর্বের তারিখ এইরূপ ১১।১২ দিন আগাইতে আগাইতে বৎসরের প্রত্যেক মাস ঘুরিয়া যায়। কিন্তু হিন্দুদের বেলায় ঠিক তাহা হয় না। হিন্দুরা এই পার্থক্য এক মাসের বেশি কখনও হইতে দেন না। যেমনি এইরূপ পার্থক্য একমাস পার হইবার উপক্রম হয়, অমনি যে মাসে দুইটি অমাবস্যা পড়ে, সেই বৎসর সেই মাসে পূজা পার্বণাদি সমস্ত পুণ্য অনুষ্ঠান বাদ দিয়া দেন, এই মাসকে **মলমাস** বলে।

তোমরা সকলেই তিথির বিষয় জান। পূর্ণিমা একটি তিথি, অমাবস্যাও একটি তিথি। পূর্ণিমার পর প্রতিপদ, দ্বিতীয়া করিয়া চতুর্দশীর পরে অমাবস্যা এবং অমাবস্যার পরেও এইরূপ প্রতিপদ, দ্বিতীয়া করিয়া চতুর্দশীর পরে পূর্ণিমা। সুতরাং এক চান্দ্রমাসে বা ২৯½ দিনে ত্রিশটি তিথি। এইজন্য এক একটি তিথির পরিমাণ ২৪ ঘণ্টার কম। পূর্ণিমার পরের প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত এই পনরটি তিথি মিলিয়া **কৃষ্ণপক্ষ** এবং ইহাদিগকে কৃষ্ণপক্ষের তিথি বলে, আর অমাবস্যার পর হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই পনরটি তিথি মিলিয়া **শুক্লপক্ষ** এবং ইহাদিগকে শুক্লপক্ষের তিথি বলে।

তোমরা জানিয়াছ অমাবস্যা তিথিতে সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবধান ০° ডিগ্রী, আর পূর্ণিমা তিথিতে ১৮০° ডিগ্রী। এই ১৫ তিথিতে তাই সূর্য ও চন্দ্রের ব্যবধান ১৮০° ডিগ্রী। সুতরাং এক তিথিতে ব্যবধান ১২° ডিগ্রী। অমাবস্যা ছাড়িয়া যেই ব্যবধান ১২° ডিগ্রী হইয়া গেল, অমনি প্রতিপদ ছাড়িয়া গেল। যেই ১২×২=২৪° ডিগ্রী ব্যবধান হইয়া গেল, অমনি দ্বিতীয়া ছাড়িয়া গেল, এইরূপ।

অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রকে মোটেই দেখা যায় না। কিন্তু উল্লিখিত ব্যবধান যতই বাড়িতে থাকে, চন্দ্রকেও অল্প অল্প করিয়া দেখা যাইতে থাকে। শুক্লপক্ষের প্রতিপদের দিন ঠিক সন্ধ্যার সময় অতি সরু
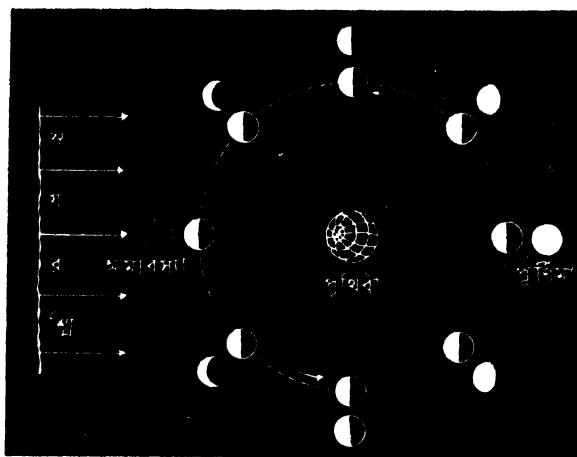
চন্দ্রকলা

একখানা কাস্তের মত চন্দ্রকে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য পশ্চিম আকাশে দেখা যায়। দিনের পর দিন ইহার আয়তন বাড়িতে থাকে এবং স্থিতি কালও দীর্ঘ হইতে থাকে। পূর্ণিমা তিথিতে ব্যবধান

সর্বাপেক্ষা বেশি, এবং শুক্লপক্ষে চন্দ্রের স্থিতি প্রত্যহ গড়ে ৪৮ মিনিট করিয়া বাড়িয়া বাড়িয়া চলে বলিয়া তাই এইদিন সারারাত্রি ধরিয়া ইহার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আয়তন দেখা যায়। ইহার পর হইতে ব্যবধান কমিতে থাকে, আয়তন কমিতে থাকে এবং স্থিতি কালও কমিতে থাকে। এইরূপে কৃষ্ণপক্ষে প্রত্যহ গড়ে ৪৮ মিনিট করিয়া দেরিতে চন্দ্র উদয়ের ফলে এবং অমাবস্যায় উল্লিখিত ব্যবধান ০° ডিগ্রী বলিয়া, অমাবস্যার চন্দ্র মোটেই দেখা যায় না। ইহাকে **চন্দ্র কলার হ্রাস বৃদ্ধি** বলে। আগেকার পৃষ্ঠার চিত্র হইতে বুঝা যাইবে, চন্দ্রের আলোকিত অংশ কোন্ দিন কতটা দেখা যাইবে। চিত্রে চন্দ্রকক্ষে চন্দ্রের ৮টি অবস্থান দেখান হইয়াছে। অতিদূর হইতে সূর্য-রশ্মি সমান্তরাল ভাবে পড়িতেছে। প্রত্যেক অবস্থাতেই চন্দ্রের অর্ধেকটার উপর সূর্যালোক পড়িতেছে এবং অর্ধেকটাতে পড়িতেছে না। যে অংশে আলো পড়িতেছে সে অংশ সাদা ও যে অংশে আলো পড়িতেছে না সে অংশকে কালো দেখান হইয়াছে। চন্দ্র বর্তুলাকার কিন্তু কোন সময়েই পৃথিবী হইতে আমরা এই বর্তুলের অর্ধাংশের অধিক দেখিতে পাই না। যদি এই অর্ধাংশ সূর্যালোকে আলোকিত হয়, তবে পৃথিবী হইতে চন্দ্রকে বৃত্তাকারে দেখা যাইবে। চিত্রে লক্ষ্য করিয়া দেখ, চন্দ্রের যে অবস্থানে পূর্ণিমা দেখান হইয়াছে সে অবস্থানে যে অর্ধাংশে সূর্যের আলো পড়িতেছে, সেই অর্ধাংশই পৃথিবী হইতে দেখা যায়। এইজন্যই পূর্ণিমাতে আমরা চন্দ্রবৃত্তের সমগ্রটা আলোকিত দেখিতে পাই। এইবার চিত্রে পূর্ণিমার কয়েকদিন পরে যে অবস্থান দেখান হইয়াছে তাহা লক্ষ্য কর। স্পষ্টই দেখা যায়, যে অর্ধাংশ পৃথিবীর দিকে মুখ করা তাহার সবটাই সাদা নয় অর্থাৎ সূর্যালোকে আলোকিত নয়। তবে বেশির ভাগই আলোকিত। এইজন্য এ অবস্থায় চন্দ্রবৃত্তের সম্পূর্ণটা আলোকিত দেখিতে পাই না, কিন্তু বেশীর ভাগই আলোকিত

দেখি। ঠিক তার পরের অবস্থানে দেখ, চন্দ্রের যে অর্ধাংশ পৃথিবী হইতে দেখা যায় তার অর্ধাংশে মাত্র সূর্যের আলো পড়িতেছে। এই জন্য চন্দ্রবৃত্তের অর্ধাংশকে শুধু আলোকিত দেখা যায়। চতুর্থ অবস্থানে দেখ, পৃথিবীর দিকে মুখ করা অংশের বেশির ভাগই কালো—সামান্য অংশে আলো পড়িতেছে। এই অবস্থায় চন্দ্রবৃত্তের আলোকিত অংশকে দেখা যাইবে একখানা সরু কাস্তের মত। তার পরের অবস্থানেই হইতেছে অমাবস্যা। এই অবস্থানে চন্দ্রের যে অর্ধাংশ পৃথিবী হইতে দেখা যায়, তার সম্পূর্ণটাই কালো—অর্থাৎ কোন অংশেই আলো পড়িতেছে না। এই অবস্থায় চন্দ্রবৃত্তের কোন অংশই আলোকিত দেখা যাইতে পারে না। অমাবস্যার পরে আবার কি করিয়া আস্তে আস্তে পূর্ণচন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়, এবার তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিবে।

তোমরা সকলেই জানিয়াছ, রাশিচক্র ২৭টি নক্ষত্রে বিভক্ত। ইহাদের নামগুলি পাঁজিতে দেখিতে পাইবে। বাংলা মাসের নাম এই নক্ষত্র হইতে ঠিক করা হইয়াছে। চন্দ্র যে মাসের পূর্ণিমায় যে নক্ষত্রে থাকে, সেই মাসের নাম সেই নক্ষত্র হইতে রাখা হইয়াছে। বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার চন্দ্র বিশাখা নক্ষত্রে থাকে বলিয়া, ঐ মাসের নাম বৈশাখ হইয়াছে; এইরূপ জ্যেষ্ঠা, পূর্বাষাঢ়া, শ্রবণা, ভাদ্রপদ, অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, মঘা, ফাল্গুনী ও চিত্রা হইতে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ (মার্গশীর্ষ), পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র নাম হইয়াছে।

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদে সাধারণত চান্দ্র বৎসর আরম্ভ হয়। এই হিসাব ধরিলে চৈত্রমাস প্রথম মাস, বৈশাখ দ্বিতীয় মাস —এইরূপে ফাল্গুন চান্দ্র বৎসরের শেষ মাস।

প্রশ্নমালা

(১) চন্দ্র কলঙ্ক কাহাকে বলে? চাঁদের উপরিভাগ বর্ণনা কর।

(২) চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির কারণ কি? অমাবস্যা ও পূর্ণিমা কেন হয়?

পঞ্চম অধ্যায়

ধূমকেতু ও উল্কা

(Comets and Meteors)

গ্রহ, উপগ্রহ ছাড়া সৌর জগতে আর এক প্রকার জ্যোতিষ্ক দেখা যায়। ইহারা **ধূমকেতু**। ইহাদের আকৃতি ও ভ্রমণপথ গ্রহ উপগ্রহ হইতে একেবারেই স্বতন্ত্র রকমের। ধূমকেতুর মধ্যেও আবার আকারের বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এমন কি একই ধূমকেতু বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। ইহাদিগকে সচরাচর দেখা যায় না। কতকগুলি ধূমকেতু নির্দিষ্ট সময় অন্তর দর্শন দেয়, আর কতকগুলি একবার মাত্র দেখা দিয়া চিরকালের মত অদৃশ্য হয়।

ইহাদের মধ্যে কতকগুলির ভ্রমণপথ উপবৃত্তাকারের (ellipse) ন্যায়, কিন্তু অনেকগুলির ভ্রমণপথ অধিবৃত্ত (parabola) ও পরাবৃত্তের (hyperbola) নামে সূচিত হয়। যাহাদের ভ্রমণপথ উপবৃত্তাকার, তাহারা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ফিরিয়া আসে। কিন্তু অধিবৃত্ত ও পরাবৃত্তের ন্যায় যাহাদের ভ্রমণপথ, তাহারা আর কখনও দেখা দেয় না। সাধারণত ইহারা হঠাৎ আকাশে দেখা দেয়। কয়েক সপ্তাহ বা মাস আকাশে অবস্থান করিয়া ইহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। সূর্যের নিকটে আসিলে ইহাদের গতিবেগ অতি দ্রুত হয়।

সূর্যের নিকট আসিলে ইহাদের পুচ্ছ প্রলম্বিত হয়। এই পুচ্ছ হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত লম্বা হয়। ইহা খুবই হাল্কা। খুব সম্ভব ইহা বায়বীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। ইহা দেখিতে ঠিক ঝাঁটার মত। পুচ্ছ মধ্য দিয়া অন্য নক্ষত্রও অনেক সময় দেখা যায়। পুচ্ছ সব সময় সূর্যের

বিপরীত দিকে থাকে। শিরোদেশ কিন্তু পুচ্ছের ন্যায় পাতলা নহে। ইহা উল্কাপিণ্ডের সমষ্টি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। সাধারণত ধূমকেতুর একটি করিয়া পুচ্ছই থাকে। তবে বহু পুচ্ছ বিশিষ্ট ধূমকেতুও দেখা গিয়াছে। ধূমকেতু যতই সূর্য হইতে সরিয়া যাইতে থাকে, ততই
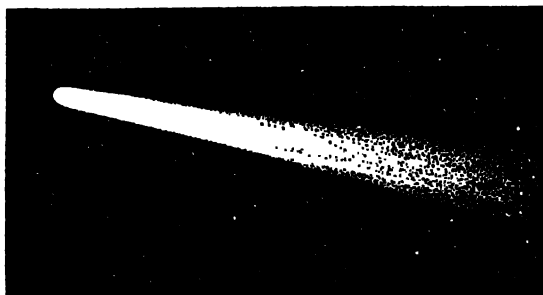
হেলির ধূমকেতু

ইহাদের লেজ ছোট হইতে থাকে। শেষে ইহাদের লেজ প্রায় থাকে না। এ যাবৎ যতগুলি ধূমকেতুর কথা জানা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে **হেলির ধূমকেতু** (Halley's Comet) অতি বিখ্যাত। ইহা প্রায় ৭৫ বৎসর অন্তর দৃষ্টিগোচর হয়। গত ১৯১০ সালে ইহাকে দেখা গিয়াছিল।

উল্কা

গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু ছাড়া, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ সৌর জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পদার্থ অতি তীব্র বেগে চলা ফেরা করে। পৃথিবী যেদিকে অনবরত ঘুরিতেছে, ঠিক তাহার বিপরীত দিকে এইগুলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অতি তীব্র গতিতে প্রবেশ করে। তখন বায়ুর সহিত সংঘর্ষে ইহারা জ্বলিয়া উঠে। পৃথিবীতে পড়িবার

পূর্বে, অনেক সময় ইহারা জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। যেগুলির গতিবেগ অতি ক্ষিপ্র নহে, সেগুলি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইবার পূর্বে পৃথিবীতে পড়িয়া যায়। ইহাদিগকে **উল্কাপিণ্ড** কহে। কলিকাতা মিউজিয়মে অনেক উল্কাপিণ্ড আছে।

উল্কাপিণ্ড

অনেকে বলেন, ধূমকেতু আকাশ পথে চলিতে চলিতে কোনও গ্রহের টানে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায়। বায়েলার (Byeler) ধূমকেতু এইরূপে গুঁড়া হইয়া যায়। গুঁড়াগুলি এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ধূমকেতু ছাড়াও কঠিন পদার্থের টুকরা আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়।

যে কঠিন টুকরাগুলি পৃথিবীতে পড়িয়াছে, সেইগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহারা নিকেল, লৌহ ইত্যাদি ধাতু দ্বারা গঠিত। ইহাদের কোন আলোক নাই।

উল্কা আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায়। বেড়াইতে বেড়াইতে কোন কারণে যদি ইহা পৃথিবীর আকর্ষণক্ষেত্রের সীমার ভিতরে আসিয়া পড়ে, তবেই উল্কাপাত হয়। সাধারণ লোকে ইহাকে তারা-খসা বলে। কতকগুলি উল্কার ঝাঁক আছে, যেগুলি পৃথিবীর কক্ষে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে

ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার ফলে বৎসরের যে যে সময়ে পৃথিবী ঐ সকল স্থানের ভিতর দিয়া যায়, সেই সেই সময় উল্কাপাতের পরিমাণ খুব বেশি হয়। সাধারণত ২১শে এপ্রিল, ৯ই—১১ই আগষ্ট হইতে ১২—১৪ই এবং ২৭শে ও ২৯শে নভেম্বর, বহু উল্কাপাত দেখা যায়।

প্রশ্নমালা

(১) ধূমকেতু কাহাকে বলে? ধূমকেতুর আকার বর্ণনা কর।

(২) উল্কা কাহাকে বলে? উল্কাপাতের কারণ কি? কোন্ সময়ে উল্কাপাত বেশি দেখা যায়?

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ
(Eclipses of Moon and Sun)

আলোকরশ্মির ধর্ম হইতেছে যে, ইহা আঁকা বাঁকা পথে চলিতে পারে না, সোজা পথে চলে। যখন তোমরা রাত্রে পড়াশুনা কর, তোমাদের সম্মুখে যদি কোন লোক আসিয়া দাঁড়ায়, তোমরা আর পড়িতে পার না, অন্ধকারে বই ঢাকা পড়ে। ইহা হইতে বুঝিতে পার, কোন আলোর সম্মুখে একটি অস্বচ্ছ পদার্থ থাকিলে, তাহার পশ্চাৎ দিকে আলোকরশ্মি পড়ে না। গ্রহ ও উপগ্রহ সূর্য হইতে আলোক পাইয়া থাকে। উহাদের নিজের কোন আলোক নাই—উহারা দীপ্তিহীন অস্বচ্ছ গোলক। সূর্যের আলোক ইহাদের উপর পড়িলে ইহাদিগকে আলোকিত দেখায়। যদি কোনওক্রমে অস্বচ্ছ পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে আসিয়া পড়ে, তবে সূর্যের আলো চন্দ্রের উপর পড়িতে পারে না। আবার যদি

অস্বচ্ছ চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আসিয়া পড়ে, তবে সূর্যের আলো আর পৃথিবীতে পড়িতে পারে না।

মনে কর, একটি বৃত্ত আঁকিয়া ঠিক ইহার কেন্দ্রস্থলে একটি আলোক রহিয়াছে। একটি লম্বা সূতায় একটি ঢিল বাঁধিয়া, মাথার উপর দিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে, ঠিক বৃত্ত পথ দিয়া, তুমিও হাঁটিয়া যাইতেছ। এখন, আলোক হইল সূর্য্য, তুমি হইতেছ পৃথিবী, আর ঢিল হইল চন্দ্র। পৃথিবী ঠিক এইরূপে সূর্যকে পরিক্রমণ করিতেছে। আর ঢিলের ন্যায় চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্যকে পরিক্রমণ করিতেছে।

এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র যখন পৃথিবী ও সূর্যের ঠিক মাঝখানে আসিয়া পড়ে, তখন আর চাঁদের আলো দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ, চন্দ্রের আলোকিত অংশ আমাদের দিকে না থাকিয়া অন্ধকার অংশটি আমাদের দিকে থাকে। এই সময়কার চাঁদকে অমাবস্যার চাঁদ বলে। আবার যখন ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র ঠিক উল্টা দিকে থাকে, তখন চন্দ্রের আলোকিত অংশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই সময়কার চাদকে পূর্ণিমার চাঁদ বলে।

চন্দ্রগ্রহণ

পূর্ণিমার সময় চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়িলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে, প্রতি পূর্ণিমায় কেন চন্দ্রগ্রহণ হয় না ? এখন কথা হইতেছে এই, প্রতি পূর্ণিমাতেই চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য পর পর থাকে সত্য, কিন্তু প্রতি পূর্ণিমাতেই ইহারা একই সরল রেখায় থাকে না। যে পূর্ণিমায় ইহারা পর পর থাকিয়া একই রেখায় থাকে, সেই পূর্ণিমাতেই মাত্র চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে। একই রেখায় থাকার অর্থ হইতেছে এই যে, পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট সমতল ক্ষেত্রে সূর্যকে পরিক্রমণ করিতেছে; আর, চন্দ্র আর একটি স্বতন্ত্র সমতল ক্ষেত্রে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিক্রমণ

করিতেছে। এই দুই সমতল ক্ষেত্র এক না হইয়া পরস্পর একটু কাৎ হইয়া প্রায় ৫° ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করিয়া আছে। এই দুই সমতল ক্ষেত্র দুইটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে। আমাদের পুরাণে এই দুইটি বিন্দুর নাম **রাহু ও কেতু**। এই দুইটি ছেদ-বিন্দুর উপরে যেদিন চন্দ্র আসে এবং সেদিন যদি পূর্ণিমা তিথি হয়, তবে সেই পূর্ণিমাতেই
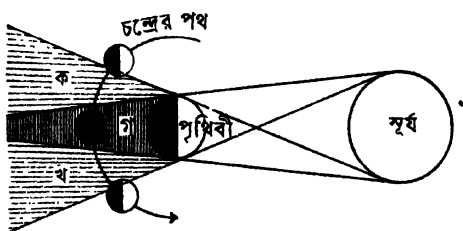
চন্দ্রগ্রহণ

কেবল চন্দ্রগ্রহণ হইতে পারে। চন্দ্র ও সূর্যকে সংযোগ করিলে, যদি সেই রেখা রাহু কিংবা কেতুর উপর দিয়া যায়, তবে চন্দ্রের পূর্ণগ্রহণ হয়। নিকটবর্তী স্থান দিয়া গেলে আংশিক গ্রহণ হইয়া থাকে। কোন পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী এই রেখার উপরে কিংবা নীচে থাকিলে, আর গ্রহণ হয় না।

উপরের চিত্রে মধ্যের কালো 'গ'-এর স্থানে কোন আলোকরশ্মি আসিতেছে না। সুতরাং উহা ঘনান্ধকার—এইরূপ ছায়াকে **প্রচ্ছায়া** (umbra) বলে, আর অপর দুই পার্শ্বে 'ক' ও 'খ'-এর স্থানে মাত্র কিয়ৎ-পরিমাণ আলোকরশ্মি পড়িয়াছে। এই দুই স্থান স্বল্প আলোকিত। এইরূপ ছায়াকে **উপচ্ছায়া** (penumbra) বলে। পৃথিবী গোলাকার বলিয়া উহার ছায়া শঙ্কুবৎ হইবে। চন্দ্র আপন কক্ষে ভ্রমণকালে যদি এই প্রচ্ছায়া শঙ্কুতে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করে, তবে ঐ গ্রহণকে পূর্ণ গ্রহণ বলে (Total Eclipse) এবং আংশিকভাবে প্রচ্ছায়ায় ও আংশিকভাবে

উপচ্ছায়ায় থাকে, তবে তাহাকে আংশিক গ্রহণ (Partial Eclipse) বলে। যে অংশটি প্রচ্ছায়ায় পড়ে, শুধু সেই অংশেরই গ্রহণ হয়। চন্দ্রের সমগ্র অংশ যখন উপচ্ছায়ায় থাকে, তখন কিন্তু কোন গ্রহণ হয় না; কেবল উহার উজ্জ্বলতা কমিয়া যায়।

সূর্যগ্রহণ

চন্দ্র ও পৃথিবী আপন আপন কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে, চন্দ্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর ঠিক মাঝে আসিয়া পড়ে অর্থাৎ উহারা যখন একই সরল রেখায় আসিয়া পড়ে (সুতরাং চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়িবে), তখনই সূর্যগ্রহণ হয়। অতএব অমাবস্যাতেই সূর্যগ্রহণ হইবে। যে কারণে প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না, সেই কারণেই প্রতি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না।

সূর্যগ্রহণ তিন প্রকার—

(১) পূর্ণগ্রহণ, (২) আংশিক গ্রহণ ও (৩) বলয় গ্রহণ।

চন্দ্রের তুলনায় সূর্য অনেক বড়, আবার পৃথিবীও চন্দ্র অপেক্ষা বড়। কাজেই চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবীর সকল স্থানে পড়ে না। অতএব

১ম চিত্র
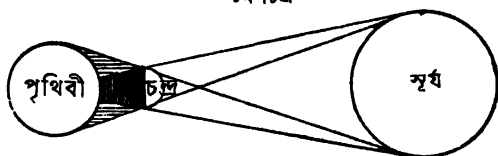
সূর্যগ্রহণ (পূর্ণ ও আংশিক)

পূর্ণচন্দ্রগ্রহণে যেমন পৃথিবীর প্রচ্ছায়া-শঙ্কুতে চন্দ্র সম্পূর্ণ প্রবেশ করে এবং সেই পূর্ণগ্রহণ পৃথিবীর যে গোলার্ধে রাত্রি তাহার সকল স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়, পূর্ণ সূর্যগ্রহণ কিন্তু পৃথিবীর যে গোলার্ধে দিন তাহারও সকল স্থান হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না।

পূর্ব পৃষ্ঠার ১ম চিত্রে চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবীর উপর যে স্থানে পড়িয়াছে সেই স্থান (অধিকতর কাল স্থানটি) হইতে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ দেখা যায়, কিন্তু উপচ্ছায়া যে স্থানে পড়িয়াছে (অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম কাল) সেই স্থান হইতে সূর্যের আংশিক গ্রহণ দেখা যায়।

২য় চিত্র
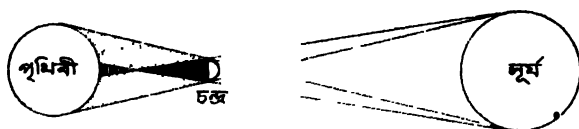
সূর্যগ্রহণ (বলয় ও আংশিক)

২য় চিত্রে চন্দ্রের প্রচ্ছায়া-শঙ্কুটি বর্ধিত করায় উৎপন্ন বিপরীত শঙ্কুতে পৃথিবী আসিয়া পড়িয়াছে এবং এই ছায়া হইতে সূর্যকে বলয় আকারে দেখা যাইবে অর্থাৎ সূর্যের এইরূপ গ্রহণকে **বলয়গ্রহণ** বলে। উপ-চ্ছায়ায় অবস্থিত স্থানসমূহ হইতে সূর্যের আংশিক গ্রহণ দেখা যাইবে। নিম্নের চিত্রে তিন প্রকার সূর্যগ্রহণের ছবি দেখান হইল।
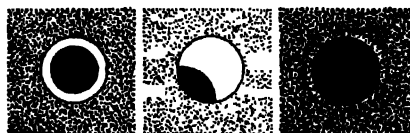
বলয় গ্রাস আংশিক গ্রাস পূর্ণ গ্রাস

পৃথিবীর কক্ষটি প্রকৃতপক্ষে একটি বৃত্ত নয়, চন্দ্রেরও তাহাই। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের ও সূর্যের দূরত্বের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। সেইজন্য চন্দ্র-বৃত্তের ও সূর্যবৃত্তের আকারও কখন বড় কখন ছোট হয়। চন্দ্র যখন পৃথিবীর নিকটে আসে, আর সূর্য দূরে চলিয়া যায়, সেই সময়ে সূর্যগ্রহণ হইলে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ দেখা সম্ভব হয় (১ম চিত্র দেখ)। আবার চন্দ্র পৃথিবী হইতে দূরে চলিয়া গেলে, আর সূর্য নিকটে আসিলে,

তখন যদি সূর্যগ্রহণ হয়, তবে সেই গ্রহণকে বলয় গ্রহণরূপে দেখা সম্ভব হয়। এই দুই গ্রহণ ব্যতীত যে স্থান হইতে সূর্যের অংশবিশেষ দেখা যায়, সেই স্থানেই সূর্যের আংশিক গ্রহণ ঘটে।

উভয় চিত্রেই দেখান হইয়াছে যে উপচ্ছায়া-শঙ্কুটি পৃথিবীকে ঘিরিয়া আছে, কিন্তু কখন কখন উপচ্ছায়াটি পৃথিবীকে ঘিরিয়া ফেলিতে পারে না, তখন পৃথিবীর যে স্থানে উপচ্ছায়া পতিত হয় না, সেই স্থান হইতে সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় অর্থাৎ সেই স্থানে কোন গ্রহণই হয় না।

ইহা যেন স্মরণ থাকে, সূর্যের গ্রহণে সূর্যের উপর যে কাল দাগ দেখিতে পাও তাহা অস্বচ্ছ চন্দ্রই, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণে চন্দ্রের উপর কাল দাগটি পৃথিবীর ছায়ামাত্র।

প্রশ্নমালা

(১) প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না কেন? চন্দ্রগ্রহণ কিরূপে হয়?

(২) সূর্যগ্রহণ কয় প্রকারের? কোন্‌টি কিরূপে হয় চিত্রের সাহায্যে উহা বুঝাইয়া দাও।

(৩) সারা পৃথিবীতে একই সময়ে পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ হইতে পারে না কেন?

সপ্তম অধ্যায়

সৌরবৎসর ও ঋতু
(Solar year and Seasons)

পৃথিবীর আবর্তন গতি বশত দিন ও রাত্রি হইয়া থাকে। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার স্বীয় মেরুরেখার চতুর্দিকে নিজেকে আবর্তন করায়। এই ২৪ ঘণ্টায় এক **সৌরদিন** হয়। সেইজন্য এই গতির আর এক নাম **আহ্নিক গতি**। আহ্নিক গতি ছাড়াও পৃথিবীর আর এক

প্রকার গতি আছে—ইহা পৃথিবীর **বার্ষিক গতি**। এই গতি বশত পৃথিবী নির্দিষ্ট উপবৃত্ত পথে সূর্যের সহিত একই সমতলে থাকিয়া প্রায় ৩৬৫¼ দিনে সূর্যকে একবার পরিক্রমণ করিয়া আসে। ইহাই আমাদের এক **সৌর বৎসর**।

সূর্য হইতে আমরা আলোক ও তাপ পাইয়া থাকি। সূর্যরশ্মি যে স্থানে লম্বভাবে কিরণ দেয়, সেই স্থান উষ্ণতর। সূর্যের চতুর্দিকে পরিক্রমণের সময়, পৃথিবীর স্থানে স্থানে সূর্যকিরণ লম্বভাবে, স্থানে স্থানে তির্যক্‌ভাবে পড়ে। এই সকল স্থান আবার অনবরতই পরিবর্তিত হইতেছে। এই সকল কারণে ভূত্বকের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে তাপের তারতম্য হইয়া থাকে। ইহার ফলে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতেছে। এই আবহাওয়ার পরিবর্তন অনুসারে বৎসরের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক বিভাগ করা যায়, তাহাকে আমরা **ঋতু** বলি। ঋতু প্রধানত চারিটি—গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্ত। আমাদের বাংলাদেশে আরও দুইটি ঋতু আমরা লক্ষ্য করি। গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতুর মধ্যে বর্ষা ঋতু এবং শরৎ ও শীত ঋতুর মধ্যে হেমন্ত ঋতু।

একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছ—গ্রীষ্মকালে দিন বড়, রাত্রি ছোট এবং শীতকালে দিন ছোট, রাত্রি বড় হয়। কিন্তু কেন এরূপ হয়?

লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিবে, ভূগোলকের মেরুদণ্ড ঈষৎ হেলান-ভাবে থাকে। পৃথিবীর কল্পিত মেরুরেখাও এইরূপ হেলান রহিয়াছে। কক্ষের সহিত মেরুরেখা ৬৬½° ডিগ্রী কোণ করিয়া আছে। পরিক্রমণের সময়েও সদা ঠিক এইরূপভাবে হেলান থাকে। ইহার ফলেই দিবা রাত্রির তারতম্য হয়।

পৃথিবী যখন ক-চিহ্নিত স্থানে (২১শে জুন তারিখে) থাকে, পৃথিবীর মেরুরেখা উত্তর গোলার্ধে সূর্যের নিকটে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্যের দূরে পড়ে। এই সময় সূর্যকে কর্কটক্রান্তির উপরে দেখা যায়।

ফলে উত্তর গোলার্ধ তাপ অধিক পায়, দক্ষিণ গোলার্ধ তাপ কম পায়। সেইজন্য উত্তর গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল। আর, উত্তর গোলার্ধে দিন বড়, রাত্রি ছোট; দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক ইহার বিপরীত ভাব।
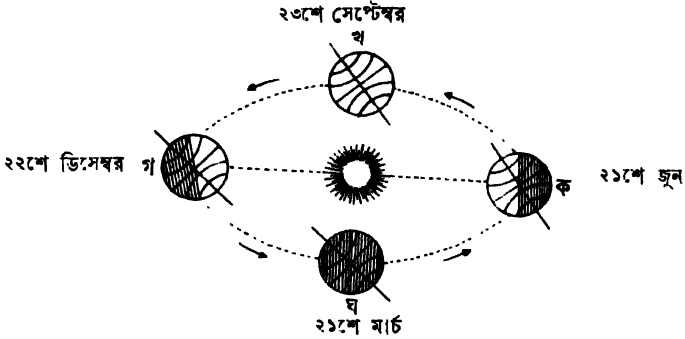
পৃথিবী যখন খ-চিহ্নিত স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন আপাত গতিপথে সূর্যের দক্ষিণ দিকে যাত্রা সুরু হয়। এই সময় হইতে তাই **দক্ষিণায়ন** আরম্ভ (অয়ন=গতি)। এই সময় উত্তর গোলার্ধে দিন সংক্ষিপ্ত, আর রাত্রি দীর্ঘতর হইতে থাকে। অবশেষে যখন খ-চিহ্নিত স্থানে (২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে) আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সূর্যকে বিষুবরেখার উপর দেখা যায়। এই সময় সারা পৃথিবীতে দিন ও রাত্রি সমান দীর্ঘ হয়। উত্তর গোলার্ধে এই সময় শরৎকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল।

আপাত গতিপথে সূর্য মকরক্রান্তির দিকে চলিতে থাকে এবং পৃথিবী গ-চিহ্নিত স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময় উত্তর গোলার্ধে ক্রমশ রাত্রি বড় ও দিন ছোট হইতে থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। অবশেষে পৃথিবী যখন গ-চিহ্নিত স্থানে (২২শে ডিসেম্বর তারিখে) আসিয়া পৌছায়, সূর্যের

দক্ষিণায়ন গতি শেষ হয়। সূর্যকে তখন মকরক্রান্তির উপরে দেখা যায়। উত্তর গোলার্ধে তখন শীতকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। আর তখন উত্তর গোলার্ধে দিবামান সংক্ষিপ্ততম ও রাত্রিমান দীর্ঘতম। দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক ইহার বিপরীত ভাব।

এই সময় হইতে আপাত গতি পথে **উত্তরায়ণ** আরম্ভ হয় এবং পৃথিবী খ-চিহ্নিত স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময় উত্তর গোলার্ধে দিবামান দীর্ঘতর ও রাত্রিমান সংক্ষিপ্ততর হইতে থাকে। অবশেষে খ-চিহ্নিত স্থানে (২১শে মার্চ তারিখে) সূর্যকে পুনরায় বিষুব-রেখার উপর দেখা যায়। তাই এই সময় পৃথিবীর সর্বত্রই দিবামান ও রাত্রিমান সমান দীর্ঘ। উত্তর গোলার্ধে এই সময় বসন্তকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল।

পরিক্রমণ গতির বিরাম নাই। পৃথিবী যতই ক-চিহ্নিত স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, উত্তর গোলার্ধে দিবামান দীর্ঘতর ও রাত্রি-মান সংক্ষিপ্ততর হইতে থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। অবশেষে পৃথিবী ক-চিহ্নিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। আপাত গতিপথে সূর্য্যকেও এই সময় কর্কটক্রান্তির উপরে দেখা যায় এবং উত্তরায়ণ গতি শেষ হয়।

যদি পৃথিবীর মেরুরেখা কক্ষপথের সহিত ৯০° ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করিয়া থাকিত, তবে সর্বত্র দিবা ও রাত্রি সমান হইত ও একস্থানে এক ঋতু হইলে, চিরকাল ধরিয়া ঐ একই ঋতু চলিত।

প্রশ্নমালা

(১) ঋতুভেদ কেন হয়?

(২) সৌর বৎসর কাহাকে বলে? সৌর ও চান্দ্র বৎসরে পার্থক্য কি?

(৩) উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বলিতে কি বুঝায়?

ভূ-বিদ্যা

প্রথম অধ্যায়

পৃথিবীর উৎপত্তি

ভূগোল পড়িলে পৃথিবীর উপরিভাগে অধুনা কত দেশ, মহাদেশ, নদী, হ্রদ, কত রকমের জন্তু ও উদ্ভিদ আছে, তাহার বিষয় আমরা জানিতে পারি। পৃথিবীর আকার, আয়তন, স্থলভাগ ও প্রাকৃতিক বিভাগ সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারি। কিন্তু কিরূপে এই পৃথিবীর উৎপত্তি হইল, যুগে যুগে তাহার কি পরিবর্তন হইয়াছে, ইহার অভ্যন্তরে কি আছে ও তাহা কি অবস্থায় আছে, এই সব প্রাকৃতিক রহস্য অধুনা ভূ-বিদ্যার সাহায্যে উপলব্ধি করিতে পারি। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কি উপায়ে এই সব বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ করিয়াছেন, নিম্নে সেই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সহজভাবে বলা হইল।

পৃথিবীর উপরিভাগে অনেক স্থানে এমন এক প্রকারের পাথর পাওয়া যায়, যাহা মোটেই স্তরীভূত নহে। সেই সব পাথর ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, তাহারা উৎপত্তির সময় গলিত অবস্থায় ছিল। এই পাথরের পরিমাণ এত বেশি যে, মানুষের দ্বারা তাহাদের এই অবস্থান্তর হওয়া অসম্ভব। আর জ্যোতির্বিদ্যা সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই যে, আকাশমণ্ডলে এখনও এমন অনেক **গ্রহ উপগ্রহ** আছে, যাহার উত্তাপ এত বেশি যে, তাহাদের মধ্যে অবস্থিত সকল উপাদানই গলিত বা বাষ্পীয় অবস্থায় আছে। গ্রীষ্মকালে সূর্যের উত্তাপ

G

যখন অসহ্য বোধ হয়, তখন ঐ গ্রহ উপগ্রহের উপরোক্ত কল্পিত অবস্থা প্রকৃত বলিয়া মানিয়া লওয়া সহজেই সম্ভবপর হয়।

আর সাধারণত দেখিতে পাই যে, ধাতু প্রভৃতি হাপরে (furnace) অত্যধিক উত্তপ্ত অবস্থায় ক্রমশ নরম হইয়া তরল হয়, এবং হাপর হইতে বাহিরে আনিলে পুনরায় ঠাণ্ডা ও কঠিন হইয়া যায়। এই সব প্রাকৃতিক ঘটনাবলী দেখিয়া শুনিয়া এবং পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবী গলিত বা বাষ্পীয় অবস্থা হইতে এখনকার এই অবস্থায় আসিয়াছে।

এই সকল অবস্থান্তর কি করিয়া হইয়াছে, সে সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা সময়ে নানা প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল মতের মধ্যে কেবল কয়েকটা মাত্র বিজ্ঞজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। লাপ্লাস ও কাণ্টের (Laplace—Kant) নীহারিকাবাদ (Nebular Hypothesis), এবং আমেরিকান অধ্যাপক চাম্বারলেন ও মুল্টনের গ্রহ-কণিকাবাদ (Planetesimal Hypothesis) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শনিগ্রহকে এখনও দূরবিন দিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে, ইহা একটা নীহারিকার চক্রে (Disc) আবৃত। ছায়ার মত নীহারিকা দিয়া আবৃত বলিয়া, হয়ত আমাদের মুনি ঋষিরা ইহাকে "ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং' বলিয়াছেন। শনিগ্রহের এই অবস্থা দেখিয়া কাণ্টএর মনে গ্রহ ও উপগ্রহের নীহারিকা উৎপত্তিবাদের ধারণা জন্মে। কিন্তু এই নীহারিকা-বাদ ঠিক করেন লাপ্লাস। তিনি নীহারিকাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জ্যোতির্বেদীয় (astrononical) প্রমাণ সংগ্রহ করেন এবং বলিতে গেলে তিনিই সর্বপ্রথমে সাহস করিয়া নীহারিকাবাদ প্রচার করেন। সেইজন্য নীহারিকাবাদ কাণ্ট ও লাপ্লাস দুজনেরই নামে চলে।

নীহারিকাবাদ মতে, আমাদের এই সৌরজগৎ (Solar System) —সূর্য, পৃথিবী এবং অন্য আটটি গ্রহ, চন্দ্র ইত্যাদি উপগ্রহ (Satellites)

এবং **গ্রহকণিকা** (asteroids)—সমস্ত এককালে নীহারিকা অবস্থায় বহুদূরব্যাপী ছিল। এই নীহারিকা ভীষণ গরম, জ্বলন্ত ও ঘূর্ণায়মান বাষ্পপিণ্ড।

আকাশে কোটি কোটি বৎসর ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে এই নীহারিকা-পিণ্ডের বহির্ভাগ ঠাণ্ডা হইতে লাগিল; ঠাণ্ডা হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার আকারও ছোট হইল এবং সেইজন্য তাহার ভ্রমণগতিও (speed) ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। ঠাণ্ডা হইবার দরুণ ঐ পিণ্ডের বিষুবরেখার কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা স্থানে ঘূর্ণায়মান বলয়ের আকারে একটা আবরণের সৃষ্টি হইল, কিন্তু সেই সময়ে ভিতরকার ঘূর্ণায়মান বায়ুময় জ্বলন্ত সূর্যগোলকের নিরক্ষীয় গতি (equatorial speed) উহার বাহিরের বলয়াকারের আবরণের গতি অপেক্ষা অনেক বেশি হওয়ায়, ঐ আবরণ বায়ুময় গোলক হইতে পৃথক হইয়া গেল। ভিতরের অংশ আরও ছোট হইয়া বহু জোরে ঘুরিতে লাগিল। আবরণটিও পৃথক হইয়া ক্রমে ঠাণ্ডা হইতে লাগিল এবং উহার অক্ষের (axis) উপর ঘুরিতে ঘুরিতে চুপ্‌সিয়া (collapse) গেল। ঐরূপ চুপ্‌সিয়া যাওয়ার দরুণ একটি ঘূর্ণায়মান গোলাকার গ্রহের সৃষ্টি হইল। এইরূপে সেই প্রারম্ভিক (original) মহাসূর্য জ্বলন্ত মহা গোলক এপর্যন্ত ক্রমে ক্রমে নয়বার নয়টি বলয়ের মত খোলা ত্যাগ করিয়াছে এবং তাহা হইতে পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি ইত্যাদি নয়টি গ্রহ উৎপন্ন হইয়াছে। সেই প্রথমকার মহাসূর্যের অর্থাৎ জ্বলন্ত নীহারিকাপিণ্ডের শেষ অংশ এখনকার সূর্য।

জিন্স ও জেফ্রিজ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা মনে করেন যে, একটি বিরাট তারকা কোন আকস্মিক কারণে সূর্যের নিকট দিয়া ছুটিয়া যায়। ঐ তারকার প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তির ফলে সূর্যের জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড হইতে

কতক অংশ বিচ্যুত হয়। শেষে এই বিচ্যুত অংশ আবার কয়েকটি টুক্‌রায় ভাঙ্গিয়া যায়। এই টুক্‌রাগুলি তাপ বিকীরণ করিতে করিতে ক্রমশ ঠাণ্ডা হইয়া উপস্থিত গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি হয়। আমাদের পৃথিবী এইরূপ একটি গ্রহ।

গ্রহকণিকা-বাদ (Planetesimal hypothesis)—আকাশে অনেকগুলি সর্পিলাকার (Spiral) গ্রহকণিকা (Asteroids) আমরা
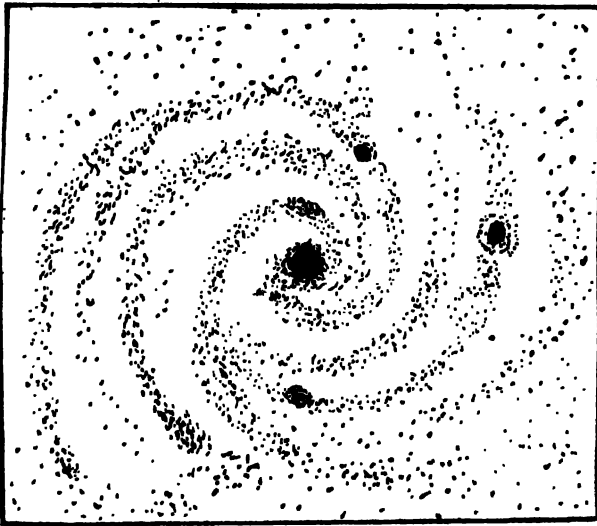
সর্পিল নীহারিকা
ইহাতে কয়েকস্থানে গ্রহকণিকা পুঞ্জীভূত হইয়া গ্রহের সৃষ্টি হইতেছে

দূরবিন সাহায্যে দেখিতে পাই। তাহারা বহু তারকামালায় ও নীহারিকায় গঠিত। সেই তারকাগুলি এত দূরে অবস্থিত যে, তাহাদের এক একটির আলো আমাদের ভূতলে পৌছিতে বহু হাজার বৎসর লাগিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল আমেরিকার ভূ-তত্ত্ববিদ্ চাম্বারলেন এবং জ্যোতির্বিদ্ মুল্টন ধারণা করিয়াছেন যে, সর্পিলাকাররূপ গ্রহকণিকা

হইতেই পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের মতে ঐ সর্পিলাকার গ্রহকণিকাপুঞ্জ গ্যাসীয় ও কঠিন পদার্থে তৈয়ারি। কোনও দুইটি গ্রহের সংঘর্ষণে তাহাদের আংশিক বিধ্বংসের জন্য তাহারা উৎপন্ন হয়। ঐ সব সর্পিলের কেন্দ্রদেশে সকল সময়েই একটা অপেক্ষাকৃত ভারি ও কঠিন অংশ দেখা যায়। সেই কেন্দ্র হইতে দুই দিকে দুই সর্পিল বাহু বাহির হইয়াছে। চাম্বারলেনের মতে ঐ কেন্দ্র হইতেছে ভূতপূর্ব্ব গ্রহের প্রধান অংশ; আর বাহুগুলি সংঘর্ষণের ফলে ধ্বংসাবশেষ দিয়া গঠিত। আকার নির্বিশেষে বাহুর প্রত্যেক কণা (নীহারিকা) আপন আপন নির্দিষ্ট পথে (orbit) ঐ কেন্দ্রের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতেছে। সেই আবর্ত্তনের সময়ে কোন কোন গ্রহকণিকার আবর্তনপথ অন্য কোন কণিকার আবর্ত্তনপথ ছেদ করে। একটি তারকার বা গ্রহ-কণিকার কক্ষ অপর তারকা বা গ্রহকণিকার কক্ষ ছেদ করার জন্য অনেক সময়ে দুইটি তারকার সংঘর্ষণ ঘটে এবং সেই সংঘর্ষণের ফলে এত উত্তাপের সৃষ্টি হয় যে, তারকা দুইটি গলিয়া যায় এবং উভয়ে মিলিয়া একটি তারকা হয়। অনেক সময় আবার ঐরূপ সংঘর্ষণ না হইলেও, একটা ছোট তারা একটা বড় তারার মাধ্যাকর্ষণের ভিতরে আসিয়া পড়িলে বড় তারা ছোট তারাকে টানিয়া লয়। সেই আকর্ষণের ফলে উল্কার মত সেকেণ্ডে শতাধিক মাইল বেগে ঐ ছোট তারা বড় তারার উপর সজোরে আসিয়া লাগিলে সেই সংঘাতে (impact) দুইটি তারা মিশিয়া যায়। কালক্রমে বহু গ্রহকণিকা ও নীহারিকা যাহাদের একের কক্ষ অপরের কক্ষ ছেদ করিয়াছিল অথবা অত্যন্ত নিকটে ছিল, তাহারা পরস্পরের সংঘর্ষণের ফলে মিশিয়া গিয়া এক একটি গ্রহের সৃষ্টি করে এবং সর্পিলের বায়ুমণ্ডল পরিষ্কার হইয়া যাইলে তাহাতে মাত্র কয়েকটি গ্রহ থাকে। কেন্দ্রের কাছের জ্বলন্ত অংশ হইল সূর্য, আর সর্পিলের বাহুর কতকগুলি ছোট

অংশ যাহা গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে আসিয়া পড়া সত্ত্বেও অন্য গ্রহের প্রভাবের জন্য ঠিক সংঘর্ষণ হইয়া মিশিয়া যাইতে পারিল না, তাহারা হইল সেই সব গ্রহের উপগ্রহ। যেমন চাঁদ আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ।

প্রশ্নমালা

(১) পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদিগের কি মত বর্ণনা কর।

(২) নীহারিকা কাহাকে বলে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

পৃথিবীর অভ্যন্তর

পৃথিবীর ভিতরটা যে কি রকম, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে কয়েকটি প্রাকৃতিক ঘটনা, যথা আগ্নেয়গিরি, গরম জলের ঝরণা ইত্যাদি হইতে, পৃথিবীর ভিতরটা যে খুব গরম সে সম্বন্ধে সকলেই একমত।

আমরা যখন খনিতে নামি, তখন দেখি যে, প্রায় প্রত্যেক একশত ফুট নীচে গমন করিলে ভূগর্ভের উষ্ণতা প্রায় ১° ডিগ্রী ফার্ণহাইট হিসাবে বাড়ে। উত্তাপের পরিমাণ জানিয়া যেমন মান-বৈজ্ঞানিকগণ (Meteorologists) আমাদের ভূমণ্ডলের উপরের সমোষ্ণ রেখা (Isothermic lines) জানিতে পারেন, সেইরূপ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ভূগর্ভেরও সমোষ্ণ রেখা কল্পনা করেন। আমাদের দেশে মহীশূর রাজ্যে কোলারের স্বর্ণখনি সর্বাপেক্ষা গভীর। এই খনি প্রায় দেড় মাইল গভীর। এই খনিতে নীচে যেখানে এখন কাজ হইতেছে, সেখানকার উষ্ণতা প্রায় ১২৭° ডিগ্রী ফার্ণহাইট।

এখন পৃথিবীর ব্যাসার্ধ (radius) প্রায় ৪ হাজার মাইল। উপরোক্ত অনুপাতে ভূগর্ভের উষ্ণতা যদি ক্রমশ বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে ৪ হাজার মাইল নীচে পৃথিবীর উষ্ণতা হইবে হাজার হাজার ডিগ্রী। সে উষ্ণতা এত বেশি যে, তাহাতে আমাদের জানা সব পদার্থই গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়। কিন্তু যেমন যত নীচে নামিবে তত উষ্ণতা বাড়িবে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে উপরকার মাটি ও পাথর ইত্যাদির চাপের জন্য ভূগর্ভের চাপও ক্রমশ বাড়িয়া যাইবে এবং সেইজন্য সমস্ত পদার্থের দ্রবণাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক বাড়িয়া যাইবে। পণ্ডিত আরহীনিয়াস্ হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটের উষ্ণতা প্রায় এক লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং তথাকার চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের অপেক্ষা ৩০ লক্ষ গুণ বেশি। আশা করা যায় যে, এই চাপের জন্য, পদার্থ সকলের দ্রবণাঙ্ক (melting point) যতই বাড়ুক, ঐ উষ্ণতায় তাহারা কেহই গলিত অবস্থায় থাকিবে না, সকলেই বাষ্পময় হইয়া যাইবে। কিন্তু সেই প্রচণ্ড চাপের দরুণ তাহারা বাষ্পময় অবস্থা সত্ত্বেও ইস্পাতের অপেক্ষাও দৃঢ় (rigid) বোধ হইবে। একদিকে যেমন অত্যধিক উত্তাপের জন্য ভূগর্ভে, কয়েক মাইল নীচে, সকল পদার্থই গলিত বা বাষ্পীয় অবস্থায় পরিণত হইবে, অপর দিকে উপরের ভীষণ চাপের জন্য ঐ সকল গলিত বা বাষ্পময় পদার্থ কাঠিন্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। বাস্তবিক পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদিও পৃথিবীর উপরের পাথরের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র ২·৭, ইহার ভিতরের অংশের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনেক বেশি—প্রায় ৮। কোন বাষ্পময় দ্রব্যেরই এত আপেক্ষিক গুরুত্ব হইতে পারে না। আমরা জানি, নিকেল এবং লৌহের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ৮; সেইজন্য পণ্ডিতেরা পৃথিবীর মধ্যদেশ লৌহ ও নিকেলময় বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। পর পৃষ্ঠার চিত্রে পৃথিবীর অভ্যন্তরের উপাদান দেখান হইয়াছে।

শুধু আপেক্ষিক গুরুত্বের দিক হইতে নহে, অন্য উপায়েও জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর যদিও খুব উত্তপ্ত কিন্তু ইহা ইস্পাত অপেক্ষাও স্থিতিশীল। এক উপায় হইতেছে পৃথিবীর ভিতর দিয়া ভূমিকম্পের গতি। কোন ভূমিকম্পের কেন্দ্র (centre) হইতে ভূমিকম্প হওয়ার পর বহুদূরবর্তী দেশে যে কম্পন অনুভব করা যায়, তাহা দুই
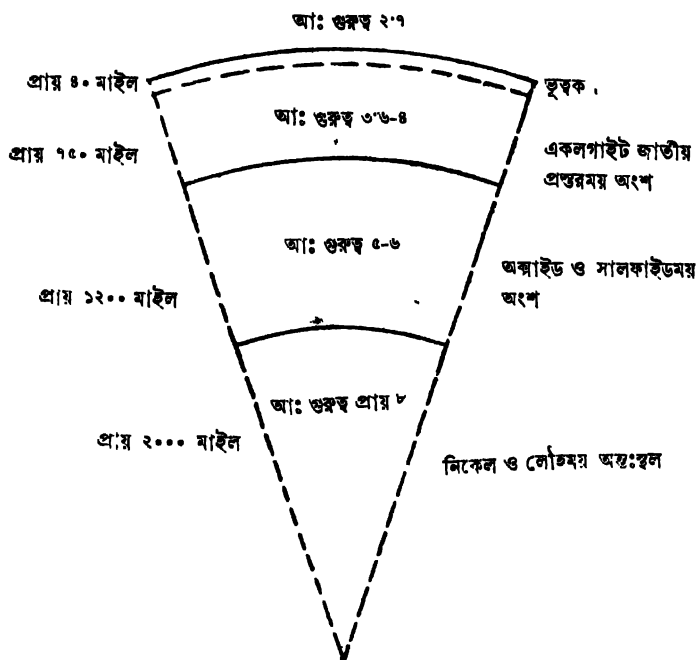
রকমে সেই স্থানে পৌছায়। এক রকম কম্পন পৃথিবীর উপরের স্তর অর্থাৎ ভূত্বক্ দিয়া যায়, আর এক প্রকার কম্পন ভূত্বকের নীচে পৃথিবীর ভিতর দিয়া যায়। যেটা ভিতর দিয়া যায় সেইটারই পথ যদিও হয়ত অনেক সময়ে দুইটার মধ্যে বেশি লম্বা, তথাপি বহুদূরবর্তী দেশে

উহাই আগে পৌছায়। কারণ এই ভূমিকম্পের ঢেউ পৃথিবীর ভিতরের অতিশয় স্থিতিশীল অন্তঃস্থল (core) দিয়া শীঘ্র যায়। এই হইতেছে পৃথিবীর ভিতরের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা।

প্রশ্নমালা

(১) পৃথিবীর অভ্যন্তর বিষয় কি জান বল।

তৃতীয় অধ্যায়

ভূমিকম্প

পৃথিবীর উপরকার নানাবিধ নৈসর্গিক শক্তি যথা সূর্যের উত্তাপ, বায়ু, জোয়ারভাঁটা, সমুদ্র ও নদীর স্রোত, তুষার, বৃষ্টি, ঋতু বিপর্যয় ইত্যাদি অনবরত আমাদের এই ভূমণ্ডলের উপরিভাগে নানা প্রকারের পরিবর্তন আনিতেছে; সেই রকম পৃথিবীর ভিতরকার নানা প্রকার প্রাকৃতিক শক্তি, যথা ভূবীর্যের ক্রিয়া (magmatic activity) এবং ভূসংক্ষোভ বা আন্দোলন (crustal movement) প্রভৃতি ভূত্বকের নানাবিধ পরিবর্তন আনিতেছে। ভূ-সংক্ষোভ সাধারণত আস্তে আস্তে অগ্রসর হয় কিংবা হঠাৎ হইতে পারে। আস্তে আস্তে ভূত্বকের সংক্ষোভ হওয়ায় কোনও কোনও স্থানে ভূত্বক উঁচু হইয়া উঠিতেছে এবং সেইজন্য পাহাড় তৈয়ারি হইতেছে, কিংবা কোনও স্থানে ভূত্বক বসিয়া যাইতেছে এবং সেইজন্য সেই স্থানে হ্রদ বা সমুদ্রের সৃষ্টি হইতেছে।

পৃথিবীর ভিতরে যত রকম শক্তি কায করিতেছে, তাহাদের মধ্যে ভূমিকম্পের ক্রিয়া সর্বাপেক্ষা ভয়ানক এবং বিধ্বংশকারী। আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াও অত্যন্ত ভয়ানক। কিন্তু আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত কেবল খানিকটা

স্থান ধ্বংস করে। ভূমিকম্প বহুদূরব্যাপী ও বহু দেশ ধ্বংস করিয়া দেয়— কত সোণার সংসার, শস্যশ্যামলা জনপদ চক্ষের নিমেষে মরুভূমিতে পরিণত হয়। উপরন্তু আগ্নেয়গিরি পৃথিবীর উপরে কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রদেশে অবস্থিত; কিন্তু ভূমিকম্প যে কোনও প্রদেশে ও যে কোনও সময়ে হইতে পারে। কাজেই যত রকম নৈসর্গিক উৎপাত সম্বন্ধে আমরা জানি, তাহার মধ্যে ভূমিকম্পই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। এই মাত্র সে-দিনের কথা, ১৯৩৪ সালে ১৫ই জানুয়ারি দুপুরে ২টা ১৫ মিনিটের সময়

ভূমিকম্প বিধ্বস্ত রাজবাটী—মুঙ্গের

বিহারের ভূমিকম্পে সমস্ত উত্তর বিহার ও কাটামুণ্ডু-উপত্যকা দুতিন মিনিটের মধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়। হাজার হাজার লোক কাল কবলে পতিত হয় এবং কোটি কোটি টাকার বাড়ী, ঘর নিমেষের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়। ১৯৩৫ সালে ৩১শে মে তারিখে কোয়েটায় যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ২৫ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা যায়।

ভূত্বকের অকস্মাৎ আন্দোলনে ভূমিকম্প হয়। ইহা হওয়ার সময় প্রথমে দূরে মেঘ গর্জন কিংবা কামান গর্জনের মত গুড় গুড় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বিহার ভূমিকম্পের ঠিক পূর্বেই জামালপুরের লোকেরা

বাড়ীর ছাদের উপর দিয়া রেলগাড়ী চলার ন্যায় একটি শব্দ শুনিতে পায়। প্রায় এই আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গেই, ছোট খাট ভূমিকম্পে কেবল বাড়ী, ঘর, দেওয়াল, জানলা, ইলেক্‌ট্রিক পাখা ইত্যাদি দুলে, কিংবা জলে ঢেউ

ভূমিকম্পের জন্য জমিতে ফাটল—মুঙ্গের

হয়ে নিবৃত্ত হয়। কিন্তু ভূমিকম্পের গুরুত্ব অনুসারে খিলান দেওয়াল ইত্যাদি ফাটিয়া যায়, কিংবা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। কোন স্থানে

জমি ফাটিয়া যায়; কোন স্থানে জমি উঠিয়া পড়ে এবং কোন স্থানে বসিয়া গিয়া ছোট বড় স্তরচ্যুতি (fault) (২০৯ পৃঃ চিত্র দেখ) ঘটায়। বিহারের ভূমিকম্পের পরে অনেক স্থান ঐ রকম ফাটিয়া গিয়াছিল এবং অনেক জায়গায় বিশেষত চাষের জমিতে ছোট ছোট আগ্নেয়গিরির মত অসংখ্য ফোয়ারার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল ফোয়ারা দিয়া সাধারণত ঠাণ্ডা জল ও বালি বাহির হইয়াছিল। কোনও কোনও জায়গায় গরম জল ও গন্ধকের গন্ধ বাহির হইবার কথাও শোনা যায়। লক্ষ লক্ষ বিঘা জমি ঐ ফোয়ারা নির্গত বালিতে ভরিয়া গিয়া একেবারে চাষের অনুপযুক্ত হয় এবং লোকের বহু লোকসান হয়।

আগে লোকে মনে করিত যে, কেবল আগ্নেয়গিরির উৎপাতেই ভূমিকম্প হয়, কিন্তু এখন পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ভূমিকম্পের সব চেয়ে মুখ্য কারণ হইতেছে **ভূত্বকের সঙ্কোচন**। বিহার ও বেলুচিস্থানের ভূমিকম্প ঐ কারণেই হয়। গঙ্গার দুই পাশে হিন্দুস্থানে প্রত্যেক বৎসর হিমালয় হইতে গঙ্গা, যমুনা ও তাহাদের শাখা নদী কুশী, গণ্ডকী, স্বরস্বতী ইত্যাদি প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মণ পলি আনিতেছে। ইহাতে হিন্দুস্থানের ক্রমশই ভার অর্থাৎ চাপ বাড়িতেছে এবং সেইজন্য হিন্দুস্থান বসিয়া যাইতেছে, আর হিমালয় পাহাড় উপরে উঠিতেছে। কখনও কখনও ঐ দুইটির নামা উঠার সামঞ্জস্য (equilibrium) থাকে না। একটা দিক নামিতে নামিতে বা উঠিতে উঠিতে কোনও কারণে কিছুদিনের জন্য থামিয়া থাকে; তাহার পর হঠাৎ একদিন একদিক পড়িয়া গিয়া এবং অপর দিক উঠিয়া গিয়া আবার ভূত্বকের সামঞ্জস্য আনে। সেই সময় ভূত্বকের যে ভীষণ আন্দোলন হয়, তাহার ফলেই আমাদের দেশে কত বড় বড় ভূমিকম্প হইয়াছে। বিহারের ১৯৩৪ সালের ভূমিকম্পও ঐ রকম হিমালয়ের হঠাৎ উপরে উঠার এবং হিন্দুস্থানের নীচে যাওয়ার ফলে হয়। এই প্রথম নয়, পূর্বেও উত্তর বিহারে আন্দাজ ১০০ বৎসর আগে

ঐ রকম ভূমিকম্প হইয়াছিল। ১৯০৫ সালের কাংড়ার ভীষণ ভূমিকম্প ও ১৯৩৫ সালের কোয়েটার ভূমিকম্পও, ভূত্বকের আলোড়ন এবং সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য হইয়াছে।

ভূগর্ভের ভিতরে কোন খালি জায়গায় উপরের চাল ভাঙ্গিয়া পড়িলেও ভূমিকম্প হয়। সময় সময় ঐ চাল পড়া (roof fall) অনেক দূরব্যাপী হয় এবং তাহাতে যে ভূত্বকের আলোড়ন হয় তাহাতে ভূমিকম্প হইতে পারে। এই হইল ভূমিকম্পের মোটামুটি তিনটি কারণ।

মজাফ্ফরপুর নিকটস্থ ভূমিকম্প বিধ্বস্ত একটি সেতু—
এই সেতুটি ভূমিকম্পে ঢেউ-এর ন্যায় ঢেউ-খেলান হইয়াছে

ভূমিকম্পের স্পন্দন (vibration) তরঙ্গের মত হয়। যে যায়গায় সেই তরঙ্গ আরম্ভ হয়, তাহাকে ভূমিকম্পের **নাভি** (focus) বা **কেন্দ্র** (centre) বলা হয় এবং ঠিক তাহার উপরিস্থিত ভূপৃষ্ঠের উপরের স্থানকে তাহার **উপকেন্দ্র** (epicentre) বলা হয়। প্রথমে লোক মনে করিত যে, এই কেন্দ্র বৃত্তের কেন্দ্রের মত একটা বিন্দু মাত্র। পরে দেখা গিয়াছে, ভূমিকম্পের স্পন্দন একটা মাত্র বিন্দু হইতে আরম্ভ হয় না, অনেক সময় উহা ভূগর্ভের একটা রেখা ধরিয়া আরম্ভ হইয়াছে।

বিহারের ভূমিকম্পের কেন্দ্র এই রকম কাটামুণ্ড হইতে আরম্ভ হইয়া জামালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ভাঙ্গা রেখায় অবস্থিত।

ভূমিকম্পের স্পন্দন তিন রকমের। প্রাথমিক ছোট স্পন্দন, দ্বিতীয় মাঝারি স্পন্দন এবং শেষে বড় স্পন্দন। এই বড় স্পন্দন সব চেয়ে বেশি অনিষ্টকর।

প্রশ্নমালা

(১) ভূমিকম্পের কারণ কি ?

(২) ভূমিকম্পের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র কাহাকে বলে ?

আগ্নেয়গিরি

আমাদের এই পৃথিবীর উপরে অনেক স্থানে এমন পাহাড় আছে যাহা দিয়া সময় সময় আগুন, গলিত পাথর (lava), ছাই, গন্ধকাম্ল ও অন্যান্য অ্যাসিডের বাষ্প এবং খুব গরম জলীয় বাষ্প বাহির হয়। এইরূপ পাহাড়কে **আগ্নেয়গিরি** বলে। এই পাহাড়ের মাথাটি কাটা শঙ্কুর (conical) মত; সেই মাথার মধ্যভাগ কটাহ আকার ও সেই কটাহের তলায় এক ছিদ্র আছে; অর্থাৎ মাথাটি একটি ফানেলের মত। গলিত শিলা ইত্যাদি এই ছিদ্র দিয়া বাহির হয়। ছিদ্রযুক্ত কটাহকে **জ্বালামুখ** (crater) বলে।

ইটালি দেশের বিখ্যাত ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি প্রত্যেক দুই তিন মিনিট অন্তর একসঙ্গে শত কামানের আওয়াজের মত শব্দ করিয়া অগ্নি-শিলা বর্ষণ করে। সাধারণত এই অগ্ন্যুৎপাতের সময় ছাই ও গলা পাথর ইত্যাদি বাহির হয়। কখন কখন ঐ গলিত পাথর ইত্যাদি বহু

দূর পর্যন্ত যায় এবং তাহাতে নগর গ্রাম ইত্যাদি ডুবিয়া যায়। এইরূপে ভিসুভিয়াস ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যেই হারকিউলেনিয়াম এবং পম্পিয়াই নগর ধ্বংশ করিয়াছিল। আমাদের ভারতবর্ষে সজীব আগ্নেয়গিরি এখন নাই। আন্দামান দ্বীপের দক্ষিণে নরককুণ্ড বলিয়া একটি দ্বীপ আছে। ইহা একটি আগ্নেয়গিরি দ্বীপ। দুই এক শত বৎসর পূর্বে এই আগ্নেয়গিরিকেও অগ্ন্যুৎপাদন করিতে দেখা গিয়াছে। আগ্নেয়গিরির উৎপাতে কেবল গ্রাম সহর ইত্যাদি কবলিত হয় না,
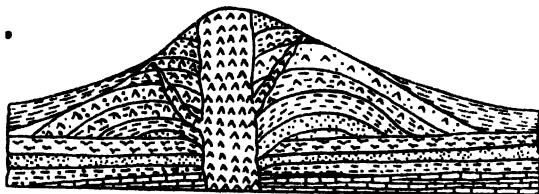
পুরাতন আগ্নেয়গিরির খণ্ডদৃশ্য

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পও হয় এবং নিকটবর্ত্তী সমস্ত দেশ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। আগ্নেয়গিরির প্রক্ষিপ্ত অগ্নি ও ভস্মাদিতে অনেক মানুষ ও পশুপক্ষী মারা যায়।

অগ্ন্যুৎপাত দুই প্রকারের। এক প্রকার কেবল পৃথিবীর ভিতরেই থাকে: তাহার দরুণ উপরোত্থিত ভূ-বীর্য (magma) বাহিরে আসিতে পারে না। ইহার ফলে **প্লুটোনিক** (plutonic) জাতীয় আগ্নেয়শিলা তৈয়ারি হয়। আর এই আগ্নেয়গিরির ভিতর দিয়া বাহিরে আসিয়া পৃথিবীর উপরে সাধারণ উত্তাপ ও চাপে যে আগ্নেয়শিলা তৈয়ারি হয়, তাহাকে **ভলকানিক** জাতীয় আগ্নেয়শিলা বলে। ইহা দেখিতে ধাতুমলের (slag) ন্যায়। প্লুটোনিক জাতীয় শিলা দানাদার গ্রানাইটের মত। আগ্নেয়গিরির ক্রিয়ার দরুণ magmaর ভূমধ্য হইতে ভূত্বকে আসিবার সময় উহা হইতে অনেক বস্তু পৃথক্ হইয়া নিকটস্থ প্রস্তর

মধ্যে সঞ্চারিত (injected) হয় এবং তাহার ফলে নানাপ্রকার আকরের **শিরা** (vein) কিম্বা **ডাইক** (dyke) তৈয়ারি হয়। আগ্নেয়গিরি প্রায়ই সমুদ্রের নিকট দেখা যায়। পৃথিবীর উপর আগ্নেয়গিরিগুলি এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া থাকিতে দেখা যাইলেও প্রকৃতপক্ষে উহারা কতকটা সরল রেখায় সজ্জিত বা শ্রেণীবদ্ধভাবে আছে।

প্রশ্নমালা

(১) আগ্নেয়গিরির কারণ ও প্রকৃতি বর্ণনা কর।

(২) আগ্নেয়গিরিগুলির স্থান মানচিত্রে নির্দেশ কর।

ভূত্বক

এটনা, ভিসুভিয়স প্রভৃতি আগ্নেয়গিরির নাম তোমরা শুনিয়াছ। এই সব আগ্নেয়গিরির **উৎপাত** (eruption) দেখিয়া মনে হয় যে, পৃথিবীর উপরিভাগ আন্দাজ চল্লিশ মাইল মাত্র গভীর পর্যন্ত কঠিন হইয়াছে। এই কঠিন বহিরাবরণটিকে **ভূত্বক** (earth's crust) বলা হয়।

পৃথিবীর ব্যাসের তুলনায় এখনও ভূত্বকের গভীরতা খুব কম। খনি বা ছিদ্র (bore-hole) দ্বারা ভূত্বকের মধ্যে আমরা মাত্র দুই বা তিন মাইল প্রবেশ করিতে পারিয়াছি। অন্যান্য লক্ষণ যথা, উচ্চ পর্বতাদির প্রস্তরের ও গঠনের প্রকৃতি দ্বারাও ভূত্বকের প্রকৃত বিবরণের ধারণা করা হয়। হিমালয় পর্বত প্রায় সাড়ে পাঁচ মাইল উচ্চ। ইহার প্রস্তর ও গঠন হইতে এবং প্রস্তরের মধ্যে সামুদ্রিক জন্তুর **ফসিল** হইতে বুঝা যায় যে, এক যুগে ইহা সমুদ্রগর্ভে ছিল।

সূর্য হইতে পৃথক হইবার পর, পৃথিবী ক্রমশ ঠাণ্ডা হওয়ায় কঠিন ভূত্বক উৎপন্ন হয়। তাহার পরে আবার ভূত্বকের অনেক রকমের আশ্চর্য

আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে। সাধারণত পরিবর্তনগুলি এত আস্তে আস্তে ঘটে যে সহজে বোঝা যায় না, কিন্তু একটু ভাবিলে উহা উপলব্ধি করা যায়। যেমন প্রতিদিনে অট্টালিকার কোনও ক্ষয় পরিলক্ষিত হয় না, কিন্তু কালের ধ্বংস লীলার প্রমাণ পুরাতন সহরে বা গ্রামে আজকাল অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের বা ইতিহাসের ঘটনার হিসাব হয় শতাব্দী দিয়া, কিন্তু বসুমতীর জীবনের মাপ-কাঠি কোটি কোটি বৎসর।
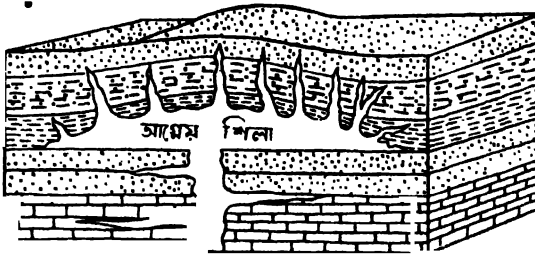
পলল-শিলাস্তর মধ্যে আগ্নেয়শিলার প্রবেশ

ভূত্বকের আধুনিক পরিবর্তন যে ভাবে হইতেছে, তাহা পরিলক্ষণ করিয়াই ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ ধারণা করিয়াছেন যে, পৃথিবীর বয়স ২৫০-৩০০ কোটি বৎসর। এই ধারায় গবেষণা করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, ভূত্বক কঠিন হইবার পর ক্রমশ আরও ঠাণ্ডা হইবার ফলে, উহা শুকনা আম বা কুলের ত্বকের ন্যায় সঙ্কুচিত হইতেছে। তজ্জন্য ভূত্বক স্থানে স্থানে উঁচু নীচু হইয়াছে, এবং পর্বত ও উপত্যকার সৃষ্টি হইয়াছে। অপর দিকে জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা হইয়া আকাশমণ্ডল হইতে শিশির, বৃষ্টি, শিল ও তুষার হইয়া পড়িতে সুরু হইয়াছে। গলিত প্রস্তরাদি হইতে কঠিন ভূত্বক হইবার পরেই, ক্রমাগত বারিপাতের ফলে ঐ সকল **আগ্নেয়শিলা** (igneous rock) চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ক্রমে কাঁকর

বালি ইত্যাদিরূপে নদী, হ্রদ ও সমুদ্রগর্ভে নীত ও সঞ্চিত হইতে লাগিল। জলের নীচে পলিরূপে সঞ্চিত হইয়া ক্রমে এই কাঁকর, বালি প্রভৃতি একত্রে সম্মিলিত ও সংযুক্ত হইল এবং তাহারা নিজের চাপে শক্ত হইয়া এক প্রকার প্রস্তরের সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই প্রস্তরের নাম **পললশিলা** (sedimentary rock)।

ভূত্বক ক্রমশ সঙ্কুচিত হইবার ফলে, পর্বত ও উপত্যকা সৃষ্টির সময় আদি আগ্নেয়শিলা ও পললশিলার উপর খুব চাপ পড়ে এবং তজ্জন্য ও অন্য কারণে উত্তাপও অধিক হয়। চাপ কিম্বা উত্তাপ, অথবা উভয়েরই ফলে আগ্নেয়শিলা ও পললশিলার অনেক পরিবর্তন ঘটে। এই সমুদয় শিলাকে **পরিবর্তিত** (metamorphic) **শিলা** বলা হয়।

এইরূপে মোটামুটি শিলাসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা :—**আগ্নেয়** (igneous), **পলল** (sedimentary) ও **পরিবর্তিত** (metamorphic) **শিলা**। এই তিন শ্রেণীর শিলার মধ্যে আবার বিভিন্ন রূপান্তর পরিলক্ষিত হয় এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন খনিজ, যৌগিক ও মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। অনেক শিলা ও খনিজ পদার্থ আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং আধুনিক সভ্যতা যুগের ভিত্তি-স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহাদের কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা—**পাথুরে কয়লা, খনিজ তৈল, তাম্র-পিণ্ড, লৌহ-পিণ্ড, অন্যান্য ধাতু-পিণ্ড**। মণি, মাণিক্য, হীরক প্রভৃতি বহু মূল্য দ্রব্যাদি এই ভূত্বকের মধ্যেই স্থানবিশেষে পাওয়া যায়।
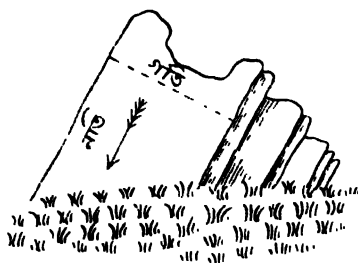
নত পললশিলা স্তর

পললশিলার সহিত প্রস্তরী-ভূত উদ্ভিদ ও জান্তব দেহ পাওয়া যায়। তাহাকে **জীবাশ্ম** (fossil) বলা হয়। ইহাদের সাহায্যে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের ক্রম-বিকাশ ও পললশিলার ইতিবৃত্ত বুঝিতে পারা যায়। হিমালয়, আল্পস প্রভৃতি পর্বতশ্রেণীর প্রস্তরের মধ্যে সামুদ্রিক জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে। ঐ প্রস্তরগুলি পললশিলা বলিয়া ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণ নিশ্চিত-রূপে ধারণা করিয়াছেন যে, হিমালয় প্রভৃতি পর্বত এক কালে সমুদ্র-গর্ভেই ছিল। পরে ভূত্বকের সঙ্কোচন জনিত পরিবর্ত্তন হেতু এরূপ চাপের সৃষ্টি হয় যে, সেই চাপে সমুদ্রগর্ভ হইতে পললশিলাগুলি উত্থাপিত হইয়া পর্বতশ্রেণীর আকার ধারণ করিয়াছে।
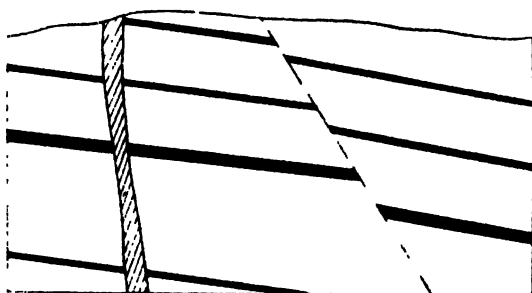
ডাইক স্তরচ্যুতি

এই চিত্রের বামদিকে দেখান হইয়াছে ভূত্বকের ফাটের মধ্যে আগ্নেয়শিলার প্রবেশহেতু একটি প্রাচীরের ন্যায় "ডাইক" এবং ডানদিকে এইরূপ ফাটের জন্য "স্তরচ্যুতি"।

এইরূপ অত্যধিক চাপ দ্বারা উত্থাপিত হইলে, ভূত্বকের শিলাগুলি বাঁকিয়া **নত** (tilted) অথবা **ভাঁজ** (folded) হইয়া যায়, আবার কোথাও ফাটিয়া একাংশ নামিয়া বা উঠিয়া **স্তরচ্যুতি** (fault) হইতে পারে। চিত্রে দেখ ভূত্বকের শিলায় কিরূপ স্তরচ্যুতি ও ভাঁজ হইয়াছে; হিমালয়ে এরূপ বহু **আলোড়ন** (disturbance) পরিলক্ষিত হয়।

প্রচুর বারি ও বরফপাতে এবং ভূকম্প প্রভৃতি কারণে, পাহাড়ের গাত্র হইতে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড আলগা হইয়া হঠাৎ নীচে আসিয়া পড়ে। ইহাকে পাহাড়-নামা বা **ল্যাণ্ডস্লাইড** (landslide) বলে।
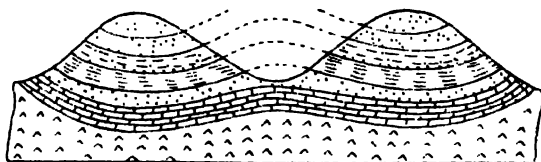
পললশিলার স্তরভাঁজ

হিমালয় খাসি প্রভৃতি পাহাড় অঞ্চলে ইহার নমুনা পাওয়া যায়। এই রকম বরফ ও তুষার নামিয়া আসিলে তাহাকে **বরফ-নামা** (avalanche) বলে।

প্রশ্নমালা

(১) স্তরের নতি, ভাঁজ ও স্তরচ্যুতি কাহাকে বলে বল ও চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও।

(২) ডাইকের উৎপত্তি কিরূপে হয় বল এবং চিত্র আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও।

(৩) ল্যাণ্ডস্লাইড কাহাকে বলে ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৃত্তিকার উৎপত্তি ও প্রকৃতি

ভূত্বকের উপরিভাগের শিলাসমূহ প্রতিনিয়ত জলবায়ু, রৌদ্র, তাপ ও তুষারপাতের ফলে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও রূপান্তরিত হইয়া অবশেষে **মৃত্তিকাতে** পরিণত হইতেছে। শিলার উপাদানভেদে মৃত্তিকার প্রকৃতিভেদ হয়। মৃত্তিকার প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন শস্যের চাষ হয়।

পৃথিবীর অনেক স্থানে কিছু খনন করিলে দেখা যায় যে, মৃত্তিকার উপরের স্তরের নীচেই পচা পাথরের স্তর রহিয়াছে। জল, বায়ু, শৈত্য
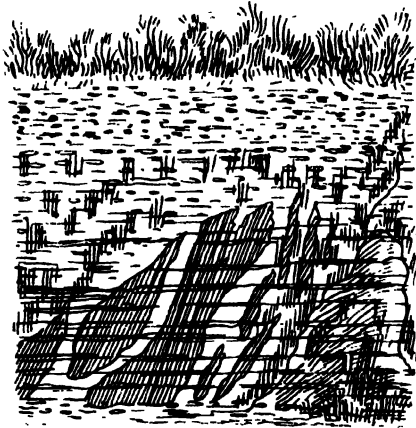
ও উত্তাপের প্রভাবে শক্ত পাথর ক্রমশ নরম হয় এবং সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। বৃক্ষাদির শিকড় উহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে উহাকে ফাটাইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করে। এইরূপে পচা পাথরের স্তর উৎপন্ন হয়। পচা পাথরের স্তরের নীচে বেশ শক্ত পাথর পাওয়া যায়। এই

শক্ত পাথর হইতে যে ক্রমশ উপরের মৃত্তিকাস্তর সকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এই সকল মৃত্তিকার নাম **স্থিতিশীল মৃত্তিকা** (indigenous or sedimentary soil)।

জলবায়ুর সাহায্যে পার্বত্য প্রদেশের মৃত্তিকা বহুদূরে স্থানান্তরিত হইয়া নানা স্থানে নানা রকমের স্তরের সৃষ্টি করে। ইহাকে **গতিশীল মৃত্তিকা** (transported soil) বলা হয়। বর্ষাকালে বন্যার পর জল-স্রোত কমিয়া আসিলে, ক্ষেতের উপর ও নদী-কিনারায় যে পলিমাটি পড়িয়া থাকে, তাহা জলস্রোতে উঁচু যায়গা হইতে আইসে। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেলে, গতিশীল মৃত্তিকার স্তর ক্রমশ পুরু হইয়া থাকে। তাহার উদাহরণ আমরা বাংলা দেশের নানা স্থানে দেখিতে পাই, কারণ এই দেশের মৃত্তিকা স্তরের নীচে সাধারণত পচা বা শক্ত পাথর পাওয়া যায় না।

মৃত্তিকার প্রকার ভেদ—সাধারণত মৃত্তিকাতে বালি, এঁটেল চূণ, অন্যান্য খনিজ ও জৈবিক পদার্থ পাওয়া যায়। ঐগুলির পরিমাণ হিসাবে মৃত্তিকার প্রকার ভেদ ও শস্য উৎপাদনের শক্তি বিভিন্ন হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকাতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ জন্মায় এবং তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পশুপক্ষী তাহাদের নিজ নিজ প্রয়োজনীয় আহার সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে, অথবা তদভাবে যথোপযুক্ত পুষ্টিলাভ না করিয়া রোগাক্রান্ত হয়। বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার বিভিন্ন প্রচলিত নাম ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হইল। বালি, এঁটেল, চূণ, ও গলিত উদ্ভিদ-পদার্থ, এই চারি প্রকার উপকরণের মধ্যে বালি ও এঁটেলের পরিমাণই মাটিতে সর্বাপেক্ষা বেশি। সেজন্য বালি ও এঁটেলের পরিমাণ অবলম্বন করিয়া মৃত্তিকা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; যথা **বেলেমাটি, দোঁয়াশ মাটি** ও **এঁটেল মাটি**। এঁটেলের পরিমাণ শতকরা ১০ ভাগের কম হইলে তাহা বেলেমাটি; ৪০ হইতে

৭০ ভাগ হইলে, তাহা দোয়াশমাটি এবং ৮০ হইতে ৯৫ ভাগ হইলে, তাহা এঁটেল-মাটি। এই তিন শ্রেণীর পুনরায় উপবিভাগ আছে, যথা বেলে-দোয়াশ, এঁটেল দোয়াশ, বাদা-এঁটেল ইত্যাদি। ইহা ছাড়া চূণে-পাথরের পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগের বেশি হইলে, তাহা **চূণময় মাটি** নামে অভিহিত হয়।

বালি—শোণ, মহানদী, দামোদর প্রভৃতি নদীর গর্ভে ও সমুদ্রের ধারে খাঁটি বালি দেখিতে পাওয়া যায়। বেলে-পাথর চূর্ণ হইলে, বালির উৎপত্তি হয়; বালিকণা সকল উক্ত পাথরের এক এক খণ্ড মাত্র। খাঁটি বালির আটা নাই; সেজন্য জল দিয়া তাল পাকান যায় না। বালিতে আটা নাই বলিয়া, উদ্ভিদের মূল অবলম্বন বা আশ্রয় পায় না। কোন তলা-ফুটা পাত্রে বালি রাখিয়া তাহাতে জল ঢাল, দেখিবে জল সহজে বালির মধ্যে প্রবেশ পূর্বক তলার ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইতেছে। যেমন চালুনীর উপর জল ঢালিলে সমস্ত জল ছিদ্র দিয়া নীচে পতিত হয়, উহার মধ্যে এক বিন্দুও থাকে না, বালিতেও সেইরূপ। সুতরাং বুঝা গেল, খাঁটি বালির জল-ধারণাশক্তি একেবারেই নাই ও তাহা সেইজন্য উদ্ভিদ-উৎপাদনের অনুপযুক্ত।

এঁটেল—এঁটেলের প্রকৃতি বালির সম্পূর্ণ বিপরীত। এঁটেলে জল দিলে, অনায়াসে তাল পাকান যায়, এবং জল শুকাইলেও সে তাল ভাঙ্গে না, অর্থাৎ এঁটেলে আটা আছে। এজন্য কুম্ভকারেরা হাঁড়ি সরা প্রভৃতি বাসন প্রস্তুত করিবার জন্য এঁটেল ব্যবহার করে। এঁটেলের মধ্যে যে জল প্রবেশ করে, তাহা সহজে বহির্গত হয় না, উহার মধ্যে আকৃষ্ট বা সংলগ্ন থাকে, অর্থাৎ এঁটেল জল আটকাইয়া বা ধরিয়া রাখিতে পারে। এঁটেলের কণা সকল সূক্ষ্ম, বালুকণা তত সূক্ষ্ম নহে। খাঁটি বালির ন্যায় খাঁটি এঁটেলে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী কোনও পদার্থ নাই, কিন্তু এঁটেলে সততই অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে,

এবং সেই সকল পদার্থ উদ্ভিদ-পোষণক্ষম। খাঁটি এঁটেল অতিশয় আটাল, ঘনসন্নিবিষ্ট, শীতল ও জল-দাঁড়ান দোষে দূষিত, এজন্য অনুর্বরা। কিন্তু অন্যান্য উপকরণের সহিত, ইহা মৃত্তিকার এক বিশেষ হিতকর অংশ। ইহা জলধারণপূর্বক মৃত্তিকাকে অনাবৃষ্টির হস্ত হইতে রক্ষা করে, মৃত্তিকাকে অতি উত্তপ্ত হইতে দেয় না, বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে, গোবর ও অন্যান্য সার যোগ করিলে তদন্তর্গত ক্ষার চূণ প্রভৃতি পোষণক্ষম পদার্থ আবদ্ধ করিয়া রাখে ও জলে গলিয়া জমির তল প্রদেশে নামিতে দেয় না এবং সময় উপস্থিত হইলে, আপন দেহের অন্তর্গত ক্ষার ইত্যাদি পদার্থ বিযুক্ত করিয়া উদ্ভিদ-পোষণ করে।

চূণ—সর্বপ্রকার মৃত্তিকাতেই চূণের পাথর আছে, কিন্তু ইহার পরিমাণ প্রায়ই অল্প। চূণ ও চূণে-পাথর উভয়ের প্রভেদ অবগত হওয়া আবশ্যক। যে চা-খড়ি ও ঘুটিঙ সচরাচর দেখিতে পাও, তাহা চূণে-পাথর। চা-খড়ি ও ঘুটিঙ দগ্ধ করিলে বাষ্পবিশেষ (কাবনিক অ্যাসিড) বিযুক্ত হইয়া উড়িয়া যায় এবং যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে তাহা চূণ। চূণে-পাথর হইতে চূণ জন্মে। মৃত্তিকায় যদিও চূণের পরিমাণ অল্প, কিন্তু ইহার উপকারিতা অনেক। ইহা স্বয়ং উদ্ভিদের পোষণোপযোগী, বালি ও এঁটেলের ন্যায় পোষণাক্ষম নহে, ইহার সাহায্যে মৃত্তিকার অন্তর্গত গলিত উদ্ভিদদেহ পরিবর্তিত হইয়া উদ্ভিদ-পোষণোপযোগী হয় এবং সোরা ও সোরার ন্যায় বিশেষ সারবান পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহা এঁটেলের অতি আটাল ও বালির অতি শিথিল প্রকৃতি দূর করিয়া উভয় প্রকৃতির সামঞ্জস্য সংস্থাপন করে।

গলিত উদ্ভিদ-দেহ—গলিত উদ্ভিদ-দেহ মৃত্তিকার বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ। যে মৃত্তিকায় ইহা নাই, তাহা সম্পূর্ণ অনুর্বরা। ইহা সহজ অবস্থায় পোষণক্ষম নহে, কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তনে ইহা হইতে পোষণোপযোগী পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইহার আর এক বিশেষ গুণ,

ইহা সহজে জলশোষণ করিয়া আপন দেহাভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখে। বালির গুণ—সহজে জলশোষণ করা, দোষ—জল আবদ্ধ রাখিতে পারে না; এঁটেলের গুণ—জল আবদ্ধ রাখা, দোষ—সহজে জলশোষণ করিতে পারে না। গলিত উদ্ভিদ সহজে জল শোষণ করে ও আপন দেহে আবদ্ধ রাখে। মৃত্তিকার অন্তর্গত অন্য কোন পদার্থ এরূপ জল আবদ্ধ রাখিতে পারে না। এজন্য গলিত উদ্ভিদ-পদার্থ-বহুল মৃত্তিকা অপরাপর মৃত্তিকা অপেক্ষা অনাবৃষ্টি কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম। গলিত-উদ্ভিদ-পদার্থে বালি ও এঁটেলের দোষ নাই, কিন্তু উভয়ের গুণ আছে। গলিত উদ্ভিদ-পদার্থ বেলে মাটির জল-ধারণাশক্তির বৃদ্ধি করিয়া ও এঁটেলের অতি ঘন সন্নিবেশরূপ দোষ দূর করিয়া, উহাদিগকে জলশোষণশক্তি প্রদান করে।

যে সকল ফসলে বেশি জল দরকার যেমন ধান্য যব ইত্যাদি, এঁটেল মাটি সেই সকল ফসলের উপযোগী। দোয়াশ মাটি ধান ও যব ভিন্ন অন্য প্রায় সবপ্রকার ফসলের উপযোগী। বেলে মাটিতে শশা, কুমড়া, তরমুজ প্রভৃতি ফসল ভাল জন্মে। চূণময় মাটিতে সব রকম ফসল জন্মে, তবে ইহা মটর, সিম প্রভৃতি মটর জাতীয় উদ্ভিদের সবিশেষ উপযোগী। উদ্ভিজ্জ বহুল মৃত্তিকা, অন্যান্য মৃত্তিকার দোষ সকল দূর করিয়া সর্বপ্রকার মৃত্তিকারই শস্য উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি করে।

প্রশ্নমালা

(১) স্থিতিশীল ও গতিশীল মৃত্তিকা কাহাকে বলে, বুঝাইয়া দাও।

(২) যে সকল ক্ষেতে চাষীরা ফসল দেয়, তাহাদের মাটি কয় শ্রেণীতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক শ্রেণীর মাটিতে কি কি উপাদান কত পরিমাণে থাকে?

(৩) কি কি ফসল কোন্ কোন্ ক্ষেতের উপযুক্ত?

(৪) স্থিতিশীল মৃত্তিকার ভিন্ন ভিন্ন স্তরগুলি কি?

সপ্তম অধ্যায়

পাথুরে কয়লা ও খনিজ তৈল

আধুনিক সভ্যতার যুগে জগতে কোটি কোটি টন (ton) পাথুরে কয়লার ব্যবহার হইতেছে। ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় দুই কোটি টন পাথুরে কয়লার খরচ হইতেছে। এই কয়লা ভূগর্ভ হইতে খুঁড়িয়া তোলা হয়। পাথরের সঙ্গে পাথরের মত অবস্থায় ইহা পাওয়া যায় বলিয়া, ইহার নাম **পাথুরে কয়লা**। আর কাঠ পোড়াইয়া যে কয়লা পাই, তাহার নাম **কাঠ-কয়লা**। সাধারণত ভূত্বকের পাথর সবই
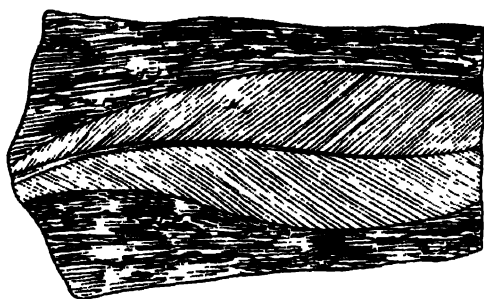
উদ্ভিজ্জ জীবাশ্ম—ফার্ন

অদাহ্য, অথচ তন্মধ্যস্থিত এই পাথুরে কয়লা কিরূপে জ্বলনশীল হইল, তাহা বড়ই কৌতূহলের বিষয়। কয়লার উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, ইহার তথ্য উপলব্ধি করা যায়।

পাথুরে কয়লা ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য পাথরের স্তরগুলি ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই স্তরগুলি পলল-শিলার শ্রেণীভুক্ত, অর্থাৎ জলের নীচে পলিরূপে সঞ্চিত হইয়াছে। এই স্তর-গুলির মধ্যে প্রভূত উদ্ভিজ্জ ও জান্তব জীবাশ্ম দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণত সর্বত্রই প্রায় ফার্ন জাতীয় গাছের জীবাশ্ম পাওয়া যায়। কয়লার স্তরগুলি হাজার হাজার ফুট পুরু এবং লক্ষ লক্ষ বৎসরের ফল। কাঠ-কয়লা এবং পাথুরে কয়লার প্রকৃতির মধ্যে খুবই সাদৃশ্য আছে। পাথুরে কয়লার ঘনত্ব (density) কিছু বেশি।

জান্তব জীবাশ্ম—শামুক
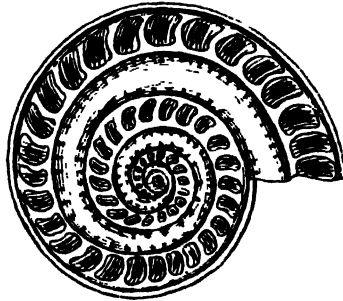
পাথুরে কয়লার উৎপত্তি—এই সব দেখিয়া শুনিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে কোন কোন যুগে পৃথিবীর নানাস্থানে ফার্নজাতীয় গাছের খুব আবির্ভাব হয় এবং পৃথিবীর আলোড়নে ঐ সকল গাছ কালক্রমে স্তরে স্তরে জলের নীচে অন্যান্য পলল-শিলার ন্যায় সঞ্চিত হয়। বায়ুর অভাবে এবং বহুযুগ উপরিস্থিত শিলাস্তরের চাপে ও নীচের তাপে থাকায়, পুরাকালের বৃক্ষাদি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া অধুনা পাথুরে কয়লার অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। যে যুগে ভূত্বকে নানাস্থানে খুব বেশি কয়লার গোড়াপত্তন হইয়াছিল, তাহার নাম **অঙ্গার যুগ** (carboniferous period)। পৃথিবীর এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসে অঙ্গারযুগ একটা খুব বড় ব্যাপার। এই সময়ে বর্তমান যুগের সভ্যতার প্রধান উপাদান পাথুরে কয়লা সঞ্চিত হয়। এই যুগে পৃথিবীর সর্বত্র হ্রদ, বিল ও জলাভূমি ছিল। তখনও হিমালয়,

ইউরাল, এণ্ডিজ প্রভৃতি পর্বতশ্রেণী সমুদ্রগর্ভ হইতে উঠে নাই। এই অতীব প্রাচীনকালে সূর্যরশ্মির সাহায্যে যে সব ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গাছপালা জন্মিয়াছিল, সেই গাছপালার পরিবর্তনের ফলে ভূ-গর্ভে এখন প্রভূত পাথুরে কয়লা পাওয়া যাইতেছে। সেই নিমিত্ত পাথুরে কয়লা পলল-শিলা শ্রেণীভুক্ত হইয়াও অতিশয় জ্বলনশীল এবং সঞ্চিত শক্তির আধার।

খনিজ তৈলের উৎপত্তি—বর্তমান যুগে কয়লার পরিবর্তে অনেক স্থলে **খনিজ তৈল** বা **"মেটে তেল"** (mineral oil) ব্যবহৃত হইতেছে। জাহাজ, মোটর গাড়ী, এয়ারোপ্লেন প্রভৃতি এই তৈলের সাহায্যে দ্রুতবেগে চালিত হইতেছে। ঘরে ঘরে যে আলো বাতি জ্বলে,

পললশিলাস্তরে ভাঁজে ভাঁজে তৈলময় পদার্থ

তাহার অধিকাংশই এই খনিজ তৈল হইতে প্রস্তুত হয়। এই সব কারণে খনিজ তৈল আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য বস্তুর মধ্যে পরিগণিত। সেইজন্য ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে সকলেরই কিছু কিছু জানা উচিত।

পলল-শিলাস্তরের মধ্যে কোন কোন স্থানে এইরূপ তৈলের খনি পাওয়া যায়। যেমন মাটি খনন করিয়া পাথুরে কয়লা বাহির করা হয়, সেইরূপ মাটি খনন করিয়া খনিজ তৈল বাহির করা হয়। মাটি খুঁড়িয়া বাহির করা হয় বলিয়া এই তৈলের নাম **খনিজ**। সছিদ্র বেলে-পাথরের

মধ্যে যেমন জল থাকে এবং কূপ খনন করিলে তন্মধ্যে যেমন জল নিঃসৃত হয়, সেইরূপ সছিদ্র বেলে-পাথরের মধ্যে তৈলময় পদার্থ ও তৈল-বাষ্প থাকে এবং নলকূপ দ্বারা নিষ্কাশিত হয়।

ব্রহ্মদেশে, আসামে, পাঞ্জাবে এবং জগতের অন্যান্য দেশে খনিজ তৈল পাওয়া যায়। সর্বত্রই দেখা যায় যে, সছিদ্র বেলে-পাথরের ভাঁজের উপরিভাগে তৈল-বাষ্প ও তৈলময় পদার্থ থাকে এবং ভাঁজের নীচে জল থাকে। জল ও তৈল-বাষ্পের চাপে অনেক সময় তৈলময় পদার্থ নলকূপ হইতে আপনা আপনি সবেগে উৎসৃত হয়।

যে পাথর সমূহের সহিত তৈলময় পদার্থ সাধারণত পাওয়া যায়, তাহা পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, ঐ সকল শিলা অগভীর সমুদ্রগর্ভে অথবা সমুদ্রোপকূলে প্রাচীনযুগে সঞ্চিত হইয়াছিল। মৎস্যাদি বহুবিধ ছোট-বড় প্রাণী ঐসব শিলার সহিত ছিল এবং ক্রমশ উপরের শিলা-স্তরের চাপে ও নীচের তাপে পরিবর্তিত হইয়া, অধুনা তৈলময় পদার্থের অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এই তৈলকে বিভিন্ন মাত্রায় উত্তপ্ত করিয়া পরিস্রুত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়, যথা **পেট্রোল** (potrol), **কেরোসিন** (kerosone), **কলের তৈল** (engine oil) প্রভৃতি।

প্রশ্নমালা

(১) পাথুরে কয়লার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কি বলেন, বর্ণনা কর।

(২) কয়লা জ্বলে কেন, বলিতে পার?

(৩) খনিজ তৈল কোথা হইতে পাওয়া যায়?

(৪) খনিজ তৈলকে পরিস্রুত করিলে কি কি ভিন্ন প্রকার অংশ পাওয়া যায়?

পরিভাষা

উদ্ভিদ-বিদ্যা — Botany

অঙ্কুরোদ্গম—germination
অজৈব—inorganic
অনুফলক—leaflet
অন্তর্ফলত্বক—endocarp
অন্তঃসার (বীজ)—exalbuminous
অবীজ—cryptogam
অস্থানিক—adventitious
আকর্ষ—tendril
আগা—apex
আত্মকরণ—assimilation
আবর্ত—whorl
আবৃত বীজ—angiosperm
আরোহী—climbing
উপপত্র—stipules
উপবৃতি—epicalyx
উভলিঙ্গ—hermaphrodite
একদল বীজ—monocotyledon
একলিঙ্গ—unisexual
করতল শিরা—palmate venation
গর্ভকেশর—carpel
ঐ চক্র—gynaecium or pistil
গর্ভকোষ—ovary
গুচ্ছফল—compound fruit
গুচ্ছমূল—fibrous root
চক্রাকৃতি—rotund
ছত্রা—fungus
জালশিরা—reticulate venation
জৈব—organic
ডিম্বক বা স্ত্রীজনন কোষ—ovum
ডিম্বক রন্ধ্র—micropyle
ডিম্বকোষ—ovule
ডিম্বাকৃতি—ovate
দল—corolla
দণ্ড—style
দ্বিদলবীজ—dicotyledon

দীর্ঘশীষ—acuminate
ধার—margin
ধনুঃশিরা—curved venation
নগ্নবীজ—gymnosperm
পর্ব—internode
পর্বসন্ধি—node
পরাগ বা রেণু—pollen
পরাগকোষ—anther
পরাগযোগ—pollination
পাপড়ি—petal
পুষ্পাধার—thalamus
পুংকেশর—stamen
পুংকেশর চক্র—andrœcium
পুং বীজ—generative nucleus
প্রধান মূল—tap-root
প্রবীজ নাভি—hilum
প্রস্বেদন—transpiration
ফলক—blade
ফলাত্মক—pericarp
বল্লমাকৃতি—lanceolate
বহির্ফলাত্মক—epicarp
বহিঃসার (বীজ)—albuminous
বর্শাকৃতি—hastate
বাণাকৃতি—sagittate
বৃক্কাকৃতি—reniform
বৃতি—calyx
বৃত্যংশ—sepal
বৃন্ত—petiole
বৃক্ষরুহা—epiphyte
বৃক্ষাদনী বা পরভোজী—parasite
বেষ্টনী—sheath
ভাবী মূল বা ভ্রূণ মূল—radicle
ভাবী কাণ্ড—plumule
ভ্রূণ—embryo
মধ্যফলাত্মক—mesocarp
মধ্যশিরা—mid-rib
মুণ্ড—stigma
মূলত্রাণ—root-cap
মূলরোম—root-hair
মূলাকৃতি—fusiform
মৌলিক বা এক ফলক—simple
যৌগিক বা বহুফলক—compound
রন্ধ্র বা সূক্ষ্মরন্ধ্র—stomata
লম্বাকৃতি—linear
শালগমাকৃতি—napiform
শিরা—vein
শিরাবিন্যাস—venation
শৈবাল—algæ
সবীজ—phanerogam
সবুজ কণা—chlorophyll

সূচাকৃতি—acicular
সূচ্যগ্র—mucronate
সূত্র—filament
সূক্ষ্মাগ্র—acute
হৃদয়াকৃতি—cordate
হংসপদাকৃতি—crisped

প্রাণি-বিদ্যা—Zoology

অগ্ন্যাশয়—pancreas
অধিত্বক—dermis
অমেরুদণ্ডী—invertebrate
অন্ত্র—intestine
অনুভব যন্ত্র—feeler
অলিন্দ—auricle

উদর, পেট—abodomen
উপত্বক—epidermis
উভচর—amphibious
কশেরুকা—vertebra
কানকো—operculum
কৃমি—worm
গুটি—cocoon
খণ্ড—segment
জালক—capillaries
জীবনেতিহাস—lifehistory
দেহপ্রাকার—body wall
ধমনী—artery
নিলয়—ventricle
পতঙ্গ—insect
পটকা—air bladder
পায়ু—anus
পিত্তথলী—gall bladder
পুঞ্জাক্ষি—compound eye
পৌষ্টিক নালি—alimentary c
পৃষ্ঠছিদ্র—dorsal pore
প্রাণী—animal
ফুলকা—gill
ফুলকা রন্ধ্র—gill slits
বক্ষ, বুক—thorax
বায়ু নল—air tube
বৃক্ক—kidney
মলনালি—rectum
মুখবিবর—buccal cavity
মেরুদণ্ড—vertebrate
রক্তসংবহন তন্ত্র—circulatory system

রূপান্তর—metamorphosis
রেচন-তন্ত্র—excretory system
শিরদাঁড়া--vertebral column
শিরা—vein
শুঙ্গ—antenna
শূক—larva
শোষণ—absorption
শ্বাস কার্য—respiration
শ্বাস রন্ধ্র—stigmata ; spiracle
ষটপদী—hexapod

শারীর-বিদ্যা—Physiology

অগ্ন্যাশয়—pancreas
অঙ্গুলাস্থি—phalanges
অধিজিহ্বা—epiglottis
অনায়ত্ত—involuntary
অন্তর্বাহী—afferent
অন্ননালি—œsophagus
অন্ত্র--intestine
অর্ধচন্দ্র কপাটিকা—semilunar valve
আগম দ্বার (আমাশয়ের)—cardiac end
আমাশয়---stomach
আমাশয় স্কন্ধ--fundus
আমাশয় রস—gastric juice
আলজিব—uvula
আয়ত্ত— voluntary
আচ্ছাদক তন্তু—epithelial tissue
আন্ত্রিক রস—succus entericus
উত্তেজনা—impulse
উদর গহ্বর—abdominal cavity
উপচর্ম—epidermis
উরঃ ফলক—sternum
ঊরু—thigh
ঊর্ধ্ব মহাশিরা—vena cava superior
কণ্ঠাস্থি—clavicle
কপাটিকা —valve
করভাস্থি—metacarpals
কশেরুকা—vertebra
কৈশিক—capillary
খাদ্যপ্রাণ—vitamin
খুলি (মস্তকের)—skull
গলনালি—gullet
চরণ-সন্ধ্যস্থি—tarsal

চর্ম (ভিতরের অংশ)—dermis
চালক (নার্ভ)—motor
জঙ্ঘা—shank
জননেন্দ্রিয়—reproductive organ
জারক—enzyme
তন্তু—tissue
তরুণাস্থি—cartilage
তালু—hard palate
তালু (নরম)—soft palate
দ্বিপাল্লা কপাটিকা—bicuspid valve
ধমনী—artery
নখ—nails
নল—duct
নাসাপথ—nares
নির্গমদ্বার (আমাশয়ের)—pyloric end
নিম্ন মহাশিরা—vena cava inferior
পদতলাস্থি—metatarsal
পঞ্জরাস্থি—rib
পায়ু—anus
পেশীতন্তু—muscular tissue
প্রকোষ্ঠ—lower arm
প্রগণ্ড—upper arm

প্রতিক্ষিপ্ত ক্রিয়া—reflex action
প্লীহা—spleen
ফুসফুসীয়—pulmonary
বন্ধনী—tendon
বস্তি প্রদেশ—pelvic region
বহির্বাহী—efferent
বক্ষোগহ্বর—thoracic cavity
বার্তাবহ তন্তু—nervous tissue
মগজ—brain
মণিবন্ধ—carpals
মধ্যচ্ছদা—diaphragm
মহাধমনী—aorta
মুখমণ্ডল—face
মুখগহ্বর—buccal cavity
মূত্রাশয়—urinary bladder
মেরুদণ্ড—vertebral column
মেরুমজ্জা—spinal cord
যকৃৎ—liver
রক্তবহা নাড়ী—blood vessels
রক্তমণ্ড—serum
রক্তরস—plasma
লোহিত কণিকা—red blood-corpuscles
শ্বাসনালি—trachea
শ্বেত কণিকা—white blood-corpuscles

সংজ্ঞাবাহী—sensory
সংযোজক তন্তু—connective tissue
হস্ত—hand
ক্ষুদ্রান্ত্র—duodenum
ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষকযন্ত্র—villus

পদার্থ-বিদ্যা – Physics

অতি-বেগনি—ultra-violet
অন্তরক—insulator
অপরিবাহী—non-conductor
অবলোহিত—infra-red
অভেদ্যতা—impenetrability
অস্বচ্ছ—opaque
আপেক্ষিক গুরুত্ব—specific gravity
আলো—light
ইথার—ether
ঈষৎ স্বচ্ছ—translucent
উষ্ণতা—temperature
ওজন—weight
কাল—period
কুপী—flask
কৈশিক আকর্ষণ—capillary attraction
কৈশিক নল—capillary tube
কোমল লৌহ—soft iron
গতিশক্তি—kinetic energy
গাঢ়নীল—indigo
ঘর্ষণ—friction
ঘর্ষ-তড়িৎ—frictional electricity
চল তড়িৎ—current electricity
চাপমান যন্ত্র বা ব্যারমিটার—barometer
চাপ—pressure
চুম্বক—magnet
জড়তা—inertia
ঢাকন—valve
তড়িৎ—electricity
তড়িৎসেল—electric cell
তড়িৎ প্রবাহ—electric current
তড়িৎ চুম্বক—electro magnet
তাপ—heat
থার্মমিটার—thermometer
দিগ্‌দর্শী—compass

দোলক—pendulum

দোলক পিণ্ড—bob

নারঙ্গ—orange

নিষ্ক্রিয়তা—inertia

নীল—blue

পদার্থ—matter

পাম্প—pump

পরিচলন—convection

পরিপূরক—complimentary

পরিবহন—conduction

পরিবাহী—conductor

পীত—yellow

প্রতিফলন—reflection

প্রতিবিহিত দোলক—compensation pendulum

প্রতিসরণ—refraction

প্রিজম—prism

প্লাবিতা—buoyancy

বাল্‌ব—bulb

বিকীরণ—radiation

বিভব—potential

বিভব প্রভেদ—potential difference

বিভাজ্যতা—divisibility

বিশোষণ—absorption

বিস্তার—amplitude

বিস্তৃতি—extension

বেগনি—violet

মরীচিকা—mirage

মাধ্যাকর্ষণ—gravitation

মেরু—pole

রশ্মি—ray

রোধ—resistance

লাল—red

হাইড্রোমিটার—hydrometer

শক্তি—energy

সছিদ্রতা—porosity

সাইফন—siphon

হলদে—yellow

স্ফুলিঙ্গ—spark

স্তম্ভক—cylinder

স্বচ্ছ—transparent

সংনম্যত্ব—compressibility

সংযোগবিন্দু—terminals

সংসক্তি—cohesion

স্থিতিস্থাপকতা—elasticity

স্থৈতিক শক্তি—potential energy

রসায়ন-বিদ্যা—Chemistry

অনিয়তাকার—amorphous
অপৃক্ত—unsaturated
অস্থায়ী—temporary
উদ্বেয়—volatile
উপকরণ, উপাদান—ingredients
ঊর্ধ্বপাতন—sublimation
কনডেনসার—condenser
কাঠিন্য—hardness
কঠিন জল—hard water
কেলাসিত—crystalline
কোমল জল—soft water
চুয়ান—distillation
ছাঁকন—filtration
ঝামা—pumice
দস্তা—zinc
দহন—combustion
দ্রবণ—solution
দ্রাব্য—solute
দ্রাবক—solvent
দীপ—burner
পরিশ্রাবণ—filtration
পরীক্ষা নল—test tube
পাতন বা চুয়ান—distillation
পৃক্ত—saturated
প্রাকৃতিক জল—natural water
বাতান্বিত জল—aerated water
মিশ্রণ—mixture
মৌলিক—element
যৌগিক—compound
লবণাম্ল—hydrochloric acid
বায়বীয়—gaseous
স্থায়ী—permanent

জ্যোতির্বিদ্যা—Astronomy

অক্ষ—axis
অগস্ত্য—Canopus
আলোকমণ্ডল—photosphere
আকুইলা—Aquila
আর্দ্রা—Betelgeux
উত্তর-ফাল্গুনী—Denebola
উত্তর ভাদ্রপদ—Alpheratiz
উল্কা—meteor
ঋতু—season
কক্ষ—orbit

কন্যারাশি—Virgo
কর্কট ক্রান্তি—Summer Solstice
কর্কট রাশি—Cancer
কার্ত্তিকেয়—Bellatrix
কালপুরুষ—Orion
কুম্ভরাশি—Aquarius
কুকুরমণ্ডল (বৃহৎ)—Canis Major
কুকুরমণ্ডল (ক্ষুদ্র)—Canis Minor
কৃত্তিকা—Pleiades
ক্যাষ্টর—Castor
ক্রান্তিবৃত্ত—ecliptic
গোপদ—Algenib
গ্রহ—planet
গ্রহণ—eclipse
গ্রহকণিকা—asteroids
গ্রহাণুপুঞ্জ—asteroids
চান্দ্র বৎসর—lunar year
চান্দ্র মাস—lunar month
চিত্রা—Spica
ছটামণ্ডল—corona
ছায়াপথ—milky way
জ্যেষ্ঠা—Antares
তারামণ্ডল—constellation
তুলারাশি—Libra
দূরবিন, দূরবীক্ষণ—telescope
ধনুরাশি—Sagittarius
ধ্রুব নক্ষত্র—Pole star
ধূমকেতু—comet
নক্ষত্র—star
নাভি—focus
নীহারিকা—nebulae
নীহারিকাপুঞ্জ—clusters of nabulae
পুনর্বসু—Pollux
পূর্বভাদ্রপদ—Markab
প্রজাপতি মণ্ডল—Auriga
বৎসর—year
বর্ণমণ্ডল—chromosphere
বর্ণালীবীক্ষণ—spectroscope
বাণরাজা—Rigel
বিষুব রেখা—equator
বুধ—Mercury
বুটিস—Bootes
বৃশ্চিক রাশি—Scorpio
বৃষরাশি—Taurus
বৃহস্পতি—Jupiter
ব্রহ্মহৃদয়—Capella
মকর ক্রান্তি—Winter Solstice

মকর রাশি—Capricornus
মঘা—Regulus
মঙ্গল—Mars
মিথুন রাশি—Gemini
মীন রাশি—Pisces
মেষ রাশি—Aries
রোহিণী—Hyades
লঘু সপ্তর্ষি—Little Bear
লাইরা—Lyra
লুব্ধক—Sirius
হাইড্রা—Hydra
হারকিউলিস—Hercules
শঙ্কু—cone
শনি—Saturn
শুক্র—Venus
শ্রবণা—Altair
সপ্তর্ষিমণ্ডল—Great Bear
সরমা—Procyon
সিংহরাশি—Leo
সৌর কলঙ্ক—Sunspot
সৌর বৎসর—Solar year
সৌরমাস—Solar month
স্বাতী—Arcturus

ভূ-বিদ্যা—Geology

আগ্নেয়—igneous
আগ্নেয়গিরি—volcano
কর্দম শিলা—shale
চুনাপাথর—limestone
চুনা—calcareous
ছিদ্র—boring
জীবাশ্ম—fossil
জৈব—organically derived
পরিবর্তিত—metamorphic
পলল—sedimentary
ফাটল—fissure
বেলে পাথর—sandstone
শিলা—rock
স্তরচ্যুতি—fault
ভূত্বক—earth's crust
ভাঁজ—folds
সমান্তরাল—horizontal
কাত—tilted
খাড়া—vertical
আন্দোলন—movement

SYLLABUS

1. Observation and identification of the principal constellations, major stars and planets throughout the year at night. The Sun—its dimension and distance from the Earth. Planetary system—relative positions. Solar year and seasons. The Moon and its phases - lunar year. Eclipses of Sun and Moon. Comets and meteors.

2. The Earth—condensation from a hot gaseous state its crust—igneous and sedimentary rocks. Probable condition of the interior of the Earth. Earth movements (earthquake)—folding, landslide, volcano. Varieties of soil and their bearing on plant-life and agricultural operations. The story of the formation of coal and mineral oil.

3. Structure of any common flowering plant. Functions of root, stem, leaf, flower and fruit.

4. Special characteristic of the living locomotion, respiration, nutrition, growth, response to stimulus, propagation and death ; adaptation to environments. Examples from plants like rice and pea and animals like earth-worm and fish. Life-history of *(a)* rice and pea and *(b)* ant, bee, spider, mosquito, butterfly and frog. Interdependence of plants and animals.

5. Simple consideration of the Human Body, and its principal systems, viz., circulatory, respiratory and digestive systems. Foods—their relative values and their essential ingredients. Functions of the skin and nerves.

6. The three states of matter. Physical properties of air and water. Buoyancy and Archimedes' principle. Pressure of atmosphere. Effect of heat on water. Effect of heat on air. Ventilation. Effect of heat on solid bodies. Pendulum Clock and Thermometer. Transference of heat. Simple ideas regarding energy and its transformation with examples. Rectilineal propagation of light. Phenomena of reflection and refraction of light, colour and rainbow. Lodestone, magnetisation, terrestrial magnetism and compass. Simple Electric Cell. Conductors and insulators. Effects of current : (*a*) heating and lighting, (*b*) chemical, (*c*) magnetic. Electro-magnet and Electric Bell. Telegraphy.

7. Separation of Mixtures—solution, filtration, crystallisation, distillation, sublimation. Rusting of iron and burning of candle, magnesium and sulphur in a closed volume of air over water. Air, its composition. Properties of Oxygen, Nitrogen and Carbon dioxide. Water, its composition. Properties of Hydrogen. Natural and aerated waters. Properties of hard and soft water. Characteristics of chemical compounds.

Candidates will be expected to have had a training in observation and in accurate and clear description, with reference to their practical applications and phenomena as observed in daily life. No detailed technical knowledge will be required.

Questions should be distributed over different portions of the syllabus and should be sufficiently varied and numerous to allow considerable option.